উন্নত শিক্ষাতত্ত্ব

শ্রীগৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Prasen
Pkun

শিক্ষা সম্প্রসারণ কে...
শি. সূ ৯০(৭)
বাগীপুর
পো: বৈগাছি, ২৪ পরগণা

উন্নত শিক্ষাতত্ত্ব

(প্রথম পত্র)

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

শ্রীগৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), বি. টি.

অধ্যাপক, শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

প্রাক্তন অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (মেইন), কলিকাতা।

শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র
বাণীপুর
পো: বৈগাছি, ২৪ পরগণা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

29.3.94
8058
370.1
BAN

প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর : ১৯৬৩

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

॥ উৎসর্গ ॥

পরম পূজনীয় দাদামহাশয় ৺নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরম স্নেহময়ী স্বর্গতা দিদিমার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

শিক্ষাতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান ও দর্শনভিত্তিক বিদ্যা। সুতরাং শিক্ষাতত্ত্বের পুস্তকে বৈজ্ঞানিকতথ্য, যাথার্থ ও যুক্তির সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি ও প্রসারতার প্রয়োজন। সহজেই অনুমেয় এই বিদ্যার রচনারীতিও উপযোগী হওয়া উচিত। শিক্ষাতত্ত্বের পুস্তকের এই সু-উচ্চ আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই পুস্তকটি লিখিত হয়েছে। অবশ্য পাঠক-সম্প্রদায়ই বিচার করবেন এই আদর্শ কতটা সফল হয়েছে।

পুস্তকটি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., বি. টি. ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত। আশা করি, পাশ করার ইচ্ছার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষালাভের ইচ্ছা থাকলে তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তবে শিক্ষা-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সমস্ত ব্যক্তিই পুস্তকটি পাঠে উপকৃত হবেন। কেননা, এতে আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ত্বের যেরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা হয়েছে সেইরূপ চিত্র কোন বিদেশী পুস্তকেও নাই। যে সব ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ পাঠক বিদ্যাটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভে উৎসুক তাঁরা বিশদ আলোচনার অংশগুলিকে বাদ দিয়ে পড়লেও যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

এই প্রকার পুস্তক রচনায় স্বভাবতঃই বিদেশস্থ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং লেখকও বিদেশের (বিশেষ করে ইংলণ্ড ও আমেরিকার) বহু শিক্ষাবিদের কাছ থেকে প্রভূত ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রতি তিনি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। তবে লেখক যে শুধু একটি সঙ্কলন-জাতীয় পুস্তক রচনা করেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। পূর্বসূরীদের দান সর্বত্র সৃজনমূলকভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্ববিষয়ের আলোচনাতেই লেখক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সাহায্য নিয়েছেন। তবে মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক বিধায় চিন্তার ও কল্পনার দুঃসাহসিকতাকে অপরিহার্যভাবেই বর্জন করা হয়েছে। শেষে, লেখক তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর নিত্য উৎসাহদান ও নানা ত্যাগ স্বীকারের জন্য।

একটি কথা। রুশো ও অন্যান্য শিক্ষানায়কদের অবদানের আলোচনা এখানে অতি সংক্ষেপেই করা হল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক লেখকের পূর্বপ্রকাশিত

'মহান্ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব' নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হবেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ ও লেখকের নিজস্ব রচনায় ত্রুটি নিশ্চয়ই অনেক রইল। সুধীজনের সহায়তায় আশা করা যায় পরবর্তী প্রকাশনে সেই ত্রুটিসমূহ স্খালিত হবে।

কল্যাণী
১৫-১১-৬৩

লেখক

সূচীপত্র

উন্নত শিক্ষাতত্ত্ব

শিক্ষার প্রকৃতি

শিক্ষাক্রিয়ার জটিলতা

শিক্ষা একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। তাই তার প্রকৃতির পরিচয় সহজে মেলে না। তার প্রকৃতির সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শেষে লব্ধ বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে বিন্যস্ত ও সংহত করারও প্রয়োজন আছে, কেননা তবেই শিক্ষার আসল প্রকৃতির একটি সুবলয়িত রূপ ফুটে উঠবে। নিম্নে উপরোক্তভাবেই আমরা শিক্ষার স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হব।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা

(ক) শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ শিক্ষার ইংরাজী প্রতিশব্দটির (education শব্দটির) ব্যুৎপত্তির আলোচনা কারুর কারুর মতে শিক্ষাক্রিয়ার উপর কিছুটা আলোকপাত করে। ইংরাজী education শব্দটি Latin ভাষার দুটি শব্দের যে-কোন একটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে পণ্ডিতেরা এমনি মনে করেন। এই দুটি শব্দের একটি হল educere এবং অন্যটি হল educare। প্রথম শব্দটি (educere শব্দটি) কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতির উপর যথাযোগ্য আলোকপাত করে না। এই শব্দটির দুটি অংশ আছে—'e' এবং 'duco'। 'e' শব্দটির অর্থ 'মধ্য হতে' এবং 'duco'-র অর্থ 'আমি বাহিরে আনি'। দুটি অংশের অর্থ যোগ করলে educere শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আমি ভিতর থেকে বাহিরে আনি'। সুতরাং educere শব্দটি থেকে উদ্ভূত হলে education শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও মানসিক শক্তিনিচয়কে বাহিরে আনা। কিন্তু শিক্ষা ত' শুধু ভিতরের বস্তুকে বাহিরে আনা নয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক কিছুই (যেমন, তথ্য) মানবমনে অনুপ্রবিষ্ট করানর প্রয়োজন আছে এবং তার অনেক কিছুর (যেমন, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ইত্যাদির) পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং বৌদ্ধিক ও নৈতিক দিক থেকে দেখলে শিক্ষার এই ধারণাটি বিশেষ

ক্রটিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু Latin অন্য শব্দটির অর্থ (educare শব্দটির অর্থ) শিক্ষার আসল প্রকৃতির উপর অনেকটা আলোকপাত করে। এই শব্দটির অর্থ হল 'মানুষ করে তোলা'—to bring up, to rear। সহজেই বোধ্য যে, এই মানুষ-করে-তোলা ধারণাটি ভিতর-থেকে-বাহিরে-আনা ধারণাটি অপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা শিক্ষাক্রিয়ার সৃজনমূলক দিকের প্রতি এই ধারণাটি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং education শব্দটি educare শব্দটি থেকে উদ্ভূত বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং তার অর্থ দাঁড়ায় 'মানুষ-করে-তোলা'। এখানে বলা প্রয়োজন Oxford Dictionary-র মতে education শব্দটি Latin—educare শব্দটি থেকেই উদ্ভূত।

(খ) শিক্ষা শব্দের প্রচলিত অর্থ ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ প্রচলিত ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দটি নিম্নলিখিত চার প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ

(১) প্রথম অর্থ—'education' বা 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় যে-কোন বস্তু বা ব্যক্তির মাধ্যমে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। এইটিই শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ।

(২) দ্বিতীয় অর্থ—'education' বা 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় মানুষের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন।

(৩) তৃতীয় অর্থ—'education' বা 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় মানুষের দ্বারা জ্ঞাতসারে এবং পরিকল্পনামত মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন।

(৪) চতুর্থ অর্থ—education বা শিক্ষা বলতে বোঝায় বিদ্যালয়ে সংঘটিত মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইটিই শিক্ষার সংকীর্ণতম অর্থ। Education বা শিক্ষা শব্দটির প্রচলিত ভাষায় উপরোক্ত চার প্রকারের অর্থ থাকলেও তৃতীয় অর্থটিই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করে। এই তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে শিক্ষা বলতে বোঝায় সেই সব সজ্ঞান ও পরিকল্পনাপূর্ণ প্রক্রিয়াকে যার সাহায্যে মানুষ সামাজিক সংস্কৃতিকে (culture) আত্মস্থ করে এবং তার মধ্যে যোগ্যতার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন সমাজের সামগ্রিক জীবনবিধিকে—যে-জীবনবিধিকে সেই সমাজের লোক সৃষ্টি করেছে, যাকে তারা শেখে বা আত্মস্থ করে, পরিবর্তিত করে এবং শেষে উত্তরাধিকারীদের হাতে সযত্নে তুলে দিয়ে যায়।

(গ) যৌক্তিক বিশ্লেষণ (logical analysis) ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ শিক্ষাকে বুদ্ধির (reason) দ্বারা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়েঃ

(১) শিক্ষার দুটি দিক আছে। একদিক থেকে শিক্ষা হল একপ্রকার পরিণতি (product), অন্যদিক থেকে হল একটি বিশেষ প্রকারের প্রক্রিয়া (process)। শিক্ষাকে যখন পরিণতি হিসাবে দেখা যায় তখন সে হল শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফল। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে ঐ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে কিছু সঞ্চিত হয়। সেই ফলকে শিক্ষা বলা হয়। প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্যাস, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি সমাজের সভ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং চলমান জগতের সঙ্গে যোগ্য অভিযোজনের জন্য পরিবর্ধিত হয়।

(২) শিক্ষাপ্রক্রিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকার্য (teaching) অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। শিক্ষাদানক্রিয়ার প্রধান কাজ হল যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ বৌদ্ধিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল শিক্ষার্থীর সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন করা অর্থাৎ তাকে জ্ঞানদান করা, তাকে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাকে সৎ আদর্শ দান করা, তার সৎ মনোভাব তৈরী করা এবং তার সংকল্পের (will) পুনর্গঠন করা ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষাদান ক্রিয়া হল শিক্ষাক্রিয়ার একটি অংশ—যদিও মূল্যবান অংশ। শিক্ষাক্রিয়ার অন্য অংশটির নাম চরিত্র-গঠন করা (training)।

(৩) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ জন অ্যাডামস্ (Sir John Adams) বলতেন যে, শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল একটি দুই-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া এবং তার সেই মেরু দুটি হল—শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। তাঁর মতে শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর উপর আপন চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক তার আচরণিক পরিবর্তন সাধন করেন। অবশ্য এই পরিবর্তনসাধন ব্যাপারে উপায় হিসাবে শিক্ষক জ্ঞানের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার করেন। শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামসন্ (Adamson) অ্যাডামসের মতের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষা হল একটি তিন-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া এবং সেই তিনটি মেরু হল—শিক্ষার্থী, পরিবেশ ও শিক্ষক। তাঁর মতে শিক্ষার মূল কথা হল শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে

আনা এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক হল শিক্ষার মৌলিক সম্পর্ক। তাঁর মতে শিক্ষক শিক্ষাক্রিয়ার বাইরে থাকেন—দর্শক হিসাবে এবং চালক ('manipulator') হিসাবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, অ্যাডামসনের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়োগবাদীরাও (pragmatists) একমত। আমাদের মতে শেষোক্ত মতের মধ্যেই সত্য প্রধানতঃ নিহিত রয়েছে।

(৪) শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ধারণার মধ্যে চারটি মৌল উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে তিনটি হল প্রধান। উপাদান তিনটি এইরূপ ঃ

(অ) শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন।

(আ) সজ্ঞান উদ্দেশ্য।

(ই) পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে উপায় হিসাবে ব্যবহার।

(ঈ) চতুর্থ উপাদানটি হল সময়।

এই উপাদানগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে শিক্ষাক্রিয়া এমন একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হয় যার কাজ হল পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে একটি বিশেষ সময়-পরিধির মধ্যে যোগ্যভাবে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করা।

(৫) যেহেতু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করা, সেইহেতু এই প্রক্রিয়ার কাজ বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যেই শুধু নিবদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এর কাজ চলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হল—পরিবার, ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, বিভিন্ন প্রকারের সভাসমিতি ইত্যাদি।

(৬) মানুষের জন্ম থেকে যতদিন না পর্যন্ত তার আচরণিক পরিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনা দূর হয়, শিক্ষাপ্রক্রিয়া ততদিন পর্যন্তই চলতে থাকে, কেননা সমাজ নানাদিক থেকে তার সভ্যদের আচরণ পরিবর্তিত করতে অবিরতই চেষ্টা করে।

(৭) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রিয়াকে একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করা যায় ঃ

(অ) শিক্ষাক্রিয়ার ভিত্তি

১। জৈবিক ভিত্তি (Biological foundation)

শিক্ষাক্রিয়া এক বিশেষ প্রকারের প্রাণীর (মানুষের) আচরণ পরিবর্ত্তনে প্রয়াসী। সুতরাং তাকে সেই প্রাণীর অর্থাৎ মানুষের জৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। বলা বাহুল্য, মানুষের জৈবপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জীববিদ্যা (biology) থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং জীববিদ্যাগত এই জ্ঞান হল শিক্ষাক্রিয়ার একপ্রকারের ভিত্তি।

২। মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychological foundation)

শিক্ষাক্রিয়ার কাজ প্রধানতঃ মানুষের মনের উপর বলে এই ক্রিয়ায় মানবমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। মনস্তত্ত্ব এই জ্ঞান দান করে। সুতরাং মনস্তত্ত্বগত এই জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক-প্রকারের ভিত্তি।

৩। সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological foundation)

শিক্ষাক্রিয়া নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রধানতঃ চলে না, শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ-ভাবে নিয়েই এর কাজ সাধারণতঃ চলে। তার উপর মানুষের ব্যক্তিসত্তা মুখ্যতঃ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয় বলে শিক্ষাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের সামাজিক দিক সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমাজতত্ত্ব থেকেই পাওয়া যায়। এই জ্ঞানও তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একপ্রকারের ভিত্তি।

৪। ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical foundation)

শিক্ষাক্রিয়া কোন একটি নূতন প্রক্রিয়া নয়, বহুদিন ধরেই এই ক্রিয়া চলে আসছে। বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে এই ক্রিয়া বিভিন্ন রূপও ধারণ করেছে। বর্তমানের শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক পরিচালনার জন্য শিক্ষার ঐতিহাসিক রূপাবলীর সঙ্গে পরিচয়লাভ বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিক্ষাক্রিয়ার অতীতের রূপ সম্বন্ধে এই জ্ঞান শিক্ষার ইতিহাস থেকে লাভ করা যায়। সুতরাং এই ঐতিহাসিক জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক বিশিষ্ট ভিত্তি।

৫। দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)

মানুষের সর্বপ্রকার কাজেরই একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকে। তার কারণ,

প্রত্যেক কাজেরই পিছনে (বহু পিছনে হলেও) বিশ্বের আসল প্রকৃতি, মানুষের আসল প্রকৃতি এবং বিশ্ব ও মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা (অস্পষ্ট-ভাবে হলেও) বর্তমান থাকে। যেহেতু শিক্ষাক্রিয়া একটি সজ্ঞান প্রক্রিয়া এবং যেহেতু এই প্রক্রিয়া মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকেই (সমগ্র পরিবেশের মধ্যে) পরিবর্তিত করতে চায়, সেই হেতু শিক্ষাক্রিয়ায় দার্শনিক ধারণাগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না। এই ধারণাগুলিকে দর্শনশাস্ত্র থেকে সুসংহত ও সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, তাই দার্শনিক জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক প্রকারের ভিত্তি।

(আ) শিক্ষাক্রিয়ার প্রকৃতি

১। শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education)

শিক্ষাক্রিয়া একটি সজ্ঞান ও পরিকল্পিত প্রক্রিয়া তাই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই লক্ষ্য শিক্ষাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

২। শিক্ষার বিষয়বস্তু (Curriculum)

লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিক্ষাক্রিয়ার উপায় হিসাবে যোগ্য বিষয়বস্তুর প্রয়োজন হয়, কেননা বিষয়বস্তুর সাহায্য ব্যতীত অভিষ্ট আচরণিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব নয়।

৩। শিক্ষার পদ্ধতি (Method of education)

শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতির, যে পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর সার্থক যোগস্থাপন সম্ভব হয় এবং শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির পথও হয় সুগম।

৪। শিক্ষার সংগঠন (Organisation of education)

শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক পরিণতির জন্য যোগ্য গৃহ, আসবাব, সাজসরঞ্জাম, সময়সূচী ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং এই সমস্ত সাংগঠনিক উপাদানের সুসংহত প্রয়োগও প্রয়োজন হয়।

৫। পরীক্ষা (Examination)

শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণের জন্য ব্যাপক অর্থে পরীক্ষার প্রয়োজনও রয়েছে। শিক্ষাক্রিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এবং অভীষ্ট ফললাভ করছে কিনা এইসব জানবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে এবং তারই জন্য প্রয়োজন

হয় পরীক্ষার। এই পরীক্ষা অবশ্য নানাপ্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষা-ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

৬। পরিচালনা (Guidance)

আধুনিককালের জটিল ও পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে শিক্ষা-ক্রিয়াকে সার্থকভাবে চলতে হলে শিক্ষার্থীকে যোগ্য বিষয়বস্তু মনোনয়নে, নিজ দোষগুণ অনুধাবনে ও পথনির্বাচনে সাহায্য করার প্রয়োজন বিশেষভাবে রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াই হল একটি ছেদহীন পরিচালনা-প্রক্রিয়া।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ে পরিচালিত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়াতেও দেখা যায়। তবে শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়ায় ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে ফুটে উঠে সে ভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান-চালিত শিক্ষার মধ্যে ফুটে উঠে না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষাক্রিয়ায় উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। তবে ঐগুলি হল প্রধান।

৭। শিক্ষাক্রিয়ায় নূতন অভিজ্ঞতাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। তবে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সৎশিক্ষামূলক (educative) নয়। সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করাকেই সাধারণতঃ শিক্ষা-দান করা বলা হয়। সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতানির্বাচন ব্যাপারে দুটি তত্ত্বের মাপকাঠি ব্যবহার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই তত্ত্ব দুটি হল—(ক) প্রবহমানতার তত্ত্ব (principle of continuity) ও (খ) পারস্পরিক ক্রিয়ার তত্ত্ব (principle of interaction)। প্রবহমানতার তত্ত্বের মাপ-কাঠি ব্যবহার করে দেখা হয় কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতার পথ সুগম করে তুলছে কিনা। পারস্পরিক ক্রিয়াতত্ত্বের মাপকাঠি ব্যবহার করে দেখতে হয়, শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ যোগ্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাঁধনে বদ্ধ হচ্ছে কিনা।

(ঘ) জীববিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ জীববিজ্ঞান প্রাণীর আচরণ ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করে। সুতরাং

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। জীব-বিজ্ঞানের মতে জীবন ও তার উচ্চতর পর্যায়ে উদ্‌বর্তন সম্ভব হয় জীবের ভিতরের সম্পর্কিত অবস্থাগুলির ('internal relations') সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্কিত অবস্থাগুলির ('external relations') সার্থক সঙ্গতি-বিধানের ফলে। শিক্ষা এই সঙ্গতিবিধান সার্থক করে তোলে বলে জীব-বিজ্ঞানের মতে তা হল জীবনধারণের ও উচ্চতর পর্যায়ে উদ্‌বর্তনের প্রধান হাতিয়ার স্বরূপ।

(ঙ) মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ জীববিজ্ঞান প্রাণীর দেহগত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব করে প্রাণীর মানসিক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা। সুতরাং মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতেও শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির আচরণিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া। এই পরিবর্তনসাধনের ফলে ব্যক্তির জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয়। তাই মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল আবার ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ।

(চ) সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানেরও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং দলগতভাবে মানুষের আচরণ (ও তার পরিবর্তন) সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষার রূপ নিম্ন মত :

১। শিক্ষা সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া

'জীবনের ধর্ম হল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা এবং নিজেকে পুনঃপুনঃ নবায়িত করে জীবন সেই চেষ্টাকে সার্থক করে তোলে। কিন্তু জীবন শুধু জৈবস্তরেই যাপিত হয় না, সামাজিক স্তরেও এর কাজ চলে। তাই আত্মনবায়নের কাজ জৈব ও সামাজিক এই দুই স্তরেই সংঘটিত হয়। সামাজিক দিক থেকে আত্মনবায়নের প্রধান উপায় হল শিক্ষা। সঞ্চিত

সংস্কৃতিকে নবজাতকদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের এই আত্মনবায়ন প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলে' ('মহান শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব'—লেখক)।

২। শিক্ষাদান করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সমাজের একটি প্রধান কর্ম

'সমাজ-জীবন যখন সরল ছিল, তখন সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই শিক্ষার কাজ চলত। কিন্তু সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ঠিকভাবে মানুষ করে তোলবার জন্য এক বিশেষ প্রকারের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হল। বিদ্যালয় হল সেই বিশেষ প্রকারের ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে সমাজ তার শিশুদের মানুষ করে তোলে। সুতরাং বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনা হল সমাজের একটি বিশেষ কর্ম।' ('মহান্ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব'—লেখক)।

৩। শিক্ষা হল সামাজিক পরিচালনার (Social direction) একটি বিশেষ অস্ত্র

'জৈব মানুষের সঙ্গে সামাজিক মানুষের একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। জৈব মানুষকে সামাজিক মানুষে পরিণত করার জন্য তাকে সমাজের দিক থেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার প্রয়োজন আছে। মানুষকে পরিচালিত করার সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হল ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন সংঘটিত করা। ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন আনয়নের কাজে খুব বেশী সাহায্য করে বলে শিক্ষা ব্যক্তিমন চালিত করার কাজে সমাজের হাতে একটি মহামূল্য অস্ত্র'। ('মহান্ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব'—লেখক)।

৪। শিক্ষার উপর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল প্রভাব

রাষ্ট্রশক্তির রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণতঃ গঠিত হয় এবং শিক্ষাক্রিয়াও পরিচালিত হয়। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষাক্রিয়া বিভিন্ন রূপ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা কখনও একপ্রকারের হয় না।

৫। শিক্ষার উপর অর্থনৈতিক সংগঠনের বিপুল প্রভাব

রাষ্ট্রীয় সংগঠন আসলে অর্থনৈতিক সংগঠনেরই প্রতিফলন। বিশেষ

প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কায়েম করবার এবং চালু রাখবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। তার উপরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরাসরিও শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করে। প্রথমতঃ সমাজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিক্ষাক্রিয়ার বিশেষ বিকাশ ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির উপস্থিতিও শিক্ষাক্রিয়ার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির রূপ ও প্রকৃতির উপরও শিক্ষার প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। যথা, শোষিত শ্রেণীর শিক্ষা শোষক শ্রেণীর শিক্ষার সমগোত্রীয় হতে পারে না।

৬। সমাজের প্রগতিসাধনের প্রধান আয়ুধ হল শিক্ষা

সমাজের দোষ-ত্রুটি দূর করে এবং নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন সংঘটিত করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধন করে।

(ছ) দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষার প্রকৃতিঃ পূর্বেই বলা হয়েছে দর্শনশাস্ত্র বিশ্ব ও মানবের আসল প্রকৃতি এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং যেহেতু শিক্ষা মানুষের প্রকৃতির সামগ্রিক পরিবর্তনসাধনে প্রয়াসী এবং মানুষ ও বিশ্ব অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ, সেইহেতু শিক্ষাকে দর্শনশাস্ত্রের ধারণাগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকে দর্শনের ব্যবহারিক বা সক্রিয় ('practical' বা 'dynamic') দিক বলে অভিহিত করেন। এখন যেহেতু দার্শনিক ধারণাগুলি (দার্শনিকগণের মধ্যে মতবিরোধের জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ে, সেইহেতু এই শ্রেণীগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষারও বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক মতাবলীর আলোকে শিক্ষার যে যে রূপ প্রকাশ পায় নিম্নে তার আলোচনা করা হল।

১। ভাববাদ ও শিক্ষা

প্রয়োগবাদ (pragmatism) বা স্বজ্ঞাবাদের (intuitionism) মত ভাববাদ প্রধানতঃ বিশ্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র নয়। এটি আসলে হল একটি অধিবিদ্যাগত মতবাদ (metaphysics) যার মূল কাজ হল বিশ্বের মৌলসত্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা। ভাববাদ প্রকৃতির স্বয়ং-

সম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না। এর মতে প্রকৃতির ভিত্তি হল মন, আত্মা বা ভাব (idea)। ভাববাদ মানবজাতির অতিপ্রাচীন কতকগুলি আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার (intuition) উপর নির্ভরশীল। আসলে এর মধ্য দিয়ে মানবজাতির আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাগুলি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়। যেহেতু এই আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাগুলি প্রথমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেইহেতু দার্শনিক ভাববাদ প্রায়ই বিশেষ বিশেষ ধর্মের পরিণতি হিসাবে প্রকাশ লাভ করেছে। আধুনিককালে ভাববাদ ধর্মীয় চেতনা থেকে সরে গিয়ে এক নূতন স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করে নূতন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই নূতন স্বজ্ঞা এসেছে দেকার্তে, লাইবনিজ, বার্কলে ও তাঁদের সমর্থক ও অনুসরণ-কারীদের কাছ থেকে।

সংক্ষেপে ভাববাদ বলে যে, বিশ্বের মূল উপাদানগুলিকে খুঁজতে গেলে জড়পদার্থ, গতি ও পদার্থগত শক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের পাওয়া যাবে অভিজ্ঞতা (experience), চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মানুষের পরম কাম্যবস্তুগুলি (values) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শগুলির মধ্যে। ভাব-বাদের মতে জীবন, মন, আত্মা ইত্যাদিই হল পরম সত্য এবং জড়পদার্থের সত্যতা হল নিতান্ত স্থূল ও বাহ্যিক।

ভাববাদী দর্শন যেমন বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে নানা রূপ ধারণ করে, তেমনি শিক্ষার ভাববাদসম্মত ধারণাও নানা রূপে প্রকাশ পায়। আমরা এখানে ভাববাদের মতে শিক্ষা সাধারণভাবে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে তারই আলোচনায় অগ্রসর হব।

যেহেতু ভাববাদের মতে বিশ্বের আসল বস্তুগুলি হল প্রাণ, মন, আত্মা, বুদ্ধি, চেতনা, আদর্শ ও পরম কাম্যবস্তুগুলি ইত্যাদি, সেইহেতু এই মতানুযায়ী শিক্ষা হল ঐ বস্তুগুলির পূর্ণ বিকাশের উপায়স্বরূপ। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ তার মৌল প্রকৃতির বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। স্বভাবতঃই দৈহিক এবং অর্থনৈতিক শিক্ষার স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। দেহ ও দেহসম্পর্কিত সবকিছুই মন, আত্মা ইত্যাদির পাদপীঠরূপে কাজ করে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতের বেশীর ভাগ খ্যাতনামা দার্শনিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক ভাববাদের সমর্থক ছিলেন।

২। জড়বাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি

ভাববাদের মত জড়বাদও একটি অতি প্রাচীন মতবাদ যা আধুনিক কালেও চলে আসছে। জড়বাদ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীস ইত্যাদি দেশে উদ্ভূত হয়েছিল। জড়বাদীদের মতে জড়পদার্থই হল বিশ্বের মৌল সত্তা। তাঁরা বিশ্বের সবকিছুরই ব্যাখ্যা জড়পদার্থ ও তার গতির সাহায্যে করেন। আধুনিক জড়বাদের কোন কোন প্রকাশে যন্ত্রের ধারণার খুব প্রাবল্য রয়েছে। এই মতবাদীরা বিশ্বকে, মানুষকে এবং অন্যান্য প্রাণীকে অতি জটিল যন্ত্র বলে মনে করেন। জড়বাদীরা ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদি মানেন না। সব জড়বাদী একমত না হলেও তাঁরা সকলেই ঐহিক সুখভোগকে জীবনের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু বলে মনে করেন এবং তাঁদের মতে শিক্ষা হল সুখী জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতির উপায়স্বরূপ। এই সুখী জীবন ব্যক্তিরও হতে পারে, সমাজেরও হতে পারে, আবার ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই হতে পারে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে জগতের সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই জড়বাদী চিন্তাধারা বিশেষ প্রবল আকার ধারণ করেছে। তবে কম্যুনিষ্টশাসিত দেশসমূহে জড়বাদী চিন্তার একটি বিশেষ রূপ (মার্ক্সবাদ) সমগ্র সমাজের জীবনবিধিরূপে গৃহীত হওয়ায় এই মতবাদ সেই সব দেশে যেমন সর্বজয়ী হয়েছে অন্যত্র তেমন হয়নি।

৩। প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি

প্রকৃতিবাদের আলোচনা করাতে গিয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, দর্শনের ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতিবাদ' শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে—জড়বাদ, শক্তিবাদ (dynamism) ও প্রত্যক্ষবাদ (positivism)। বস্তুজগতকে অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিকে যখন জড়পদার্থ ও গতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তখন প্রকৃতিবাদ জড়বাদেরই নামান্তর মাত্র। যখন জড়জগৎকে শক্তি (energy) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তখন প্রকৃতিবাদ শক্তিবাদরূপে প্রকাশ লাভ করে। আর যখন বিশ্বপ্রকৃতির মৌল সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কিছু না বলে শুধুমাত্র বলা হয় যে, বিশ্বের সব কিছু বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ

এবং তাই তারা কোন-না-কোন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তখন প্রকৃতিবাদ প্রত্যক্ষবাদরূপে প্রতিভাত হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রকৃতিবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম রূপে প্রকৃতিবাদ জড়বাদই। দ্বিতীয় রূপে প্রকৃতিবাদ হল 'জৈব প্রকৃতিবাদ' (biological materalism) এবং তৃতীয় রূপে প্রকৃতিবাদ হল কল্পনাময় প্রকৃতিবাদ (romantic naturalism)।

জড়বাদের আলোচনা পূর্বেই হওয়ায় জড়বাদরূপী প্রকৃতিবাদের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে এইটুকু বোধ হয় বলে রাখা দরকার যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়বাদী প্রকৃতিবাদ যান্ত্রিকতাবাদী 'আচরণবাদ'রূপে (behaviourism) কিছুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং কিছুটা গুরুত্ব অর্জনও করেছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব, মানুষ, প্রাণী সবকিছুই যন্ত্রবিশেষ এবং এর মতে শিক্ষার কাজ হল মানুষরূপ যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে যতদূর সম্ভব দক্ষ করে তোলা। এই দক্ষতা অবশ্য যোগ্য' অনুবর্তিত প্রতিবর্তী' (conditioned reflex) সৃজনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে জৈব প্রকৃতিবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণ লামার্কপন্থী (Lamarckians), ডারউইনপন্থী (Darwinians) ও ম্যাক্‌ডুগ্যালপন্থীদের (followers of McDougall) উৎসাহে সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্‌ডুগ্যালপন্থীরা বলেন যে, আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে যাদের লক্ষ্য হল কতকগুলি স্বাভাবিক উদ্দেশ্য সাধন করা। সুখ এবং কষ্ট কর্মের উপজাত ফল হিসাবে মাত্র উদ্ভূত হয়। যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন সুখের সৃষ্টি হয় এবং যখন তা হয় না তখন কষ্টের উদ্ভব হয়। এই মতবাদীদের সিদ্ধান্তে শিক্ষার কাজ হল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির সুপরিচালনা, পরিমার্জন ও উদ্গতি সাধন (sublimation)। ডারুইনুপন্থীদের মতে শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি বা জাতি জীবনযুদ্ধের জন্য যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। কেননা, এঁদের মতে জীবন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা যোগ্য (fittest) জীবেরাই জয়ী হয়। সর্বাপেক্ষা যোগ্য জীব অবশ্য হল তারাই যারা পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ হয়। এঁদের মতে যে সব জীব প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে অসমর্থ

হয় প্রকৃতি তাদের জীবনমঞ্চ হতে অপসারিত করে যোগ্যদের পথ সুগম করে দেয়। প্রকৃতির এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) বলে অভিহিত করা হয়। লামার্কপন্থীদের মতে জীবের জীবন ও উচ্চতর পর্যায়ে অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতিবিধানের উপর নির্ভর করে। এঁদের মতে শিক্ষা হল পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতি-সাধনের সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। জৈবিক প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ (যেমন, বার্নার্ড শ') শিক্ষাকে অভিব্যক্তির (*evolution*) গতি বৃদ্ধিকারী মানবজাতির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। সহজেই বোধ্য যে, এই মত লামার্কপন্থীদের মতেরই প্রতিধ্বনি। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ম্যাক্ডুগ্যালপন্থীরা ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকারের জৈব প্রকৃতিবাদীরা অভিব্যক্তিতত্ত্বের (theory of evolution) উপর নির্ভর করে তাঁদের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন সৃষ্টি করেছেন।

কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিবাদীরা রুশো'র নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। রুশো'র মত তাঁদেরও আদিম মানব-প্রকৃতির প্রতি রয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, মানব-প্রকৃতির বিকাশ অপরিবর্তনীয় নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হয়। সুতরাং শিক্ষার কাজ হল এই নিয়মগুলিকে জানা এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশু-প্রকৃতির বিকাশ সাধন করা।

৪। বস্তুবাদ ও শিক্ষা

বস্তুবাদের মতে জ্ঞানের বস্তু জ্ঞাতার (knower) বাইরে বর্তমান। জ্ঞানকে এই মতানুযায়ী সৃষ্টি অপেক্ষা আবিষ্কার বলেই মনে করা হয়। অধিবিদ্যার দিক থেকে বস্তুবাদীদের ধারণা সাধারণ ব্যক্তিদের মত। বস্তুবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের মনের বাইরে একটি বিরাট বস্তুজগৎ আছে এবং মানুষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তার আসল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। এই জ্ঞানলাভের সময় মানুষ বস্তুকে পরিবর্তিত করে না, কেননা তাহলে তার আসল প্রকৃতিকে জানা সম্ভব হয় না। বস্তুবাদীরা (প্রচলিত ধারণা মত) সব সময়ে জড়বাদ অনুসরণকারী অদ্বৈতবাদী (monist) নাও হতে পারেন। তাঁরা দ্বৈতবাদী (জড়পদার্থ ও মনের যৌন অস্তিত্ব স্বীকার করে) বা বহুবাদীও (pluralist) হতে পারেন। বস্তুবাদীদের কাছে শিক্ষার আসল সম্পর্ক

হল বর্তমান জগতের সঙ্গে। এঁদের মতে শিক্ষার প্রধান কাজ হল বর্তমান জগতের (প্রাকৃতিক ও সামাজিক) সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করান। শিক্ষাজগতে বস্তুবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই তিনটি রূপ হল— সামাজিক বস্তুবাদ (social realism), ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদ (sense realism), ও মানবতাবাদী বস্তুবাদ। সামাজিক বস্তুবাদীরা সমাজের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদীরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের জ্ঞানলাভের উপর বিশেষ জোর দেন। এঁরা শিক্ষার ভাষামূলক বিষয়গুলির প্রাধান্য খর্ব করে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর স্থান বিশেষভাবে করে দিতে চান। মানবতাবাদী বস্তুবাদীরা বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য পাঠের উপর বিশেষ জোর দিতেন। মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষায় বস্তুবাদ হল একটি প্রতিবাদমূলক ভাবধারা। শিক্ষার বিবর্তনধারায় যখনই বিষয়বস্তু জীবনবিচ্ছিন্ন, জটিল ও অতিসূক্ষ্ম হয়ে উঠে, তখনই বস্তুবাদের আবির্ভাব ঘটে এবং ধ্বনি উঠে 'শিক্ষাকে বস্তুনির্ভর কর'।

৫। মানবতাবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি

শিক্ষাজগতে মানবতাবাদ দুটি রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। প্রথম রূপ হল যুক্তিবাদী মানবতাবাদ (rational humanism) এবং দ্বিতীয় রূপ হল নবজাগরণের মানবতাবাদ (Renaissance humanism)। যুক্তিবাদী মানবতাবাদ হল এ্যারিষ্টটলের দর্শনের এক নাম। এই দর্শনের মূল বক্তব্য হল এই যে, মানুষের মৌলিক সত্তা হল তার বুদ্ধি। অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের চরম পার্থক্য হল তার বুদ্ধিতে। উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে এবং জীব-জন্তুর মত সে সংবেদনশীল (sentient) ও অনুভূতিবিশিষ্ট, কিন্তু যুক্তি ও বিচারের ব্যাপারে সে একক। স্বভাবতঃ এই দর্শনের মতে শিক্ষার কাজ হল মুখ্যতঃ বুদ্ধির চর্চার ব্যবস্থা করা এবং তার বিকাশে সহায়তা করা।

নবজাগরণের মানবতাবাদ মধ্যযুগীয় দ্বৈতবাদী (কিন্তু আসলে ভাববাদী) দর্শনের (যা দেহ ও আত্মার দ্বৈততা ঘোষণা করিয়াছিল) এবং মধ্যযুগের যাজকদের গোঁড়া ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই মানবতাবাদ চেয়েছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির কবল থেকে

বুদ্ধির মুক্তি এবং প্রকৃতি ও মানুষকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে জানতে। এই স্তরের মানবতাবাদের মতে শিক্ষা হল যুক্তিকে মুক্তিদানের এবং সাধারণভাবে মানবপ্রকৃতির বিকাশের উপায়স্বরূপ। ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যে যুক্তির বিকাশ সম্যক্ হয়েছিল বলে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যপাঠ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মানবতাবাদের ঘটেছিল বিকৃতি এবং বুদ্ধির বিকাশ ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য নয়, নিছক ভাষাশিক্ষার জন্যই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা-শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যস্থলে বসান হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, মানবতাবাদের এই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃতিবাদীরা ও বস্তুবাদীরা প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের নিজেদের মতবাদকে শিক্ষাজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষা

বর্তমান জগতের শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব বিপুল হওয়ায় নিম্নে তার একটু বিশদ আলোচনা করা হল।

প্রয়োগবাদের জন্ম হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। C. S. Peirce, William James ও John Dewey-র নামের সঙ্গে এই মতবাদটি বিশেষ-ভাবে জড়িত। এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে, কিন্তু James-এর প্রভাবে এই মতবাদের মধ্যে ভাববাদের অনেক লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। বস্তুতঃ James এই মতবাদের মাধ্যমে ভাববাদ ও জড়বাদের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু Dewey পুনরায় এই মতবাদকে ভাববাদের বিরোধী মতবাদরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ভাব ও সূত্রের অর্থনির্ণয়ের জন্য Peirce প্রয়োগবাদকে যুক্তিবিদ্যাগত একটি পদ্ধতি (logical method) হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি গণিত ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানগুলি নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন।

Jamesএর হাতে প্রয়োগবাদ অকল্পিত পথে অগ্রসর হয় এবং প্রচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে কিছুটা আপোশের ভাব থাকায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

করতে সমর্থ হয়। James প্রয়োগবাদকে দু'রকমভাবে দেখেছিলেন। একদিক থেকে এটি হল আধিবিদ্যক মতবিরোধ নিবারণের একটি পদ্ধতি এবং অন্যদিক থেকে হল সত্য নির্ণয় সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব। পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগবাদ চায় ব্যবহারগত ফলের দ্বারা প্রত্যেকটি ভাবকে ব্যাখ্যা করতে। কিন্তু James মতে এর সত্য নির্ণয়ের দিকই হল প্রধান।

আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী ভাবধারার বিপুল প্রভাব John Dewey-র চিন্তার মাধ্যমেই কিন্তু সঞ্চারিত হয়েছে। Dewey প্রয়োগবাদকে যুক্তিতত্ত্ব (logic) ও জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) ছাড়াও নীতিশাস্ত্র (ethics) ও কান্তিবিদ্যা (aesthetics) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে Dewey-র প্রধান চিন্তারাজিকে অতি সংক্ষেপে নিম্নরূপে উপস্থাপিত করা যায়ঃ

১। 'এই বিশ্বের গঠনকার্য এখনও শেষ হয়নি।'

২। 'এই বিশ্বের মৌলিক বস্তু হল পদার্থমূলক ও রাসায়নিক শক্তিনিচয়। জীবন ও মন তাদের বিবর্তন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে'।

৩। 'এই জগতের সমস্ত বস্তু পরস্পরের সঙ্গে অংগাংগিভাবে জড়িত।'

৪। 'পদার্থের সঙ্গে মনের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের ও দেহের সঙ্গে মনের কোন দ্বৈতভাব নেই'।

৫। 'বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল পরিবর্তন'।

৬। 'মানুষ বিশ্বের নিয়মকে জেনে মুক্ত হতে পারে'।

৭। 'মানুষের পক্ষে সত্য জানা সম্ভব'।

৮। 'পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই সত্যজ্ঞান লাভের একমাত্র পথ'।

৯। 'চিন্তার উদ্ভব হয় সমস্যামূলক অবস্থা থেকে। সমস্যাজাত চিন্তার একমাত্র কাজ হল সমস্যা সমাধান করা'।

১০। 'জ্ঞান, বস্তুনিচয়কে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে'।

১১। 'মানুষের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা অসীম'।

১২। 'পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ নিজেই সত্য, শিব ও সুন্দরের মত পরম কাম্যবস্তুগুলি (values) সৃষ্টি করছে'।

১৩। 'মানুষের কাম্যবস্তুগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের কারুর চিরন্তন মূল্যও নেই। বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের কাম্যবস্তু বিভিন্ন'।

১৪। 'শিল্প মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম রূপ'।

১৫। 'শিল্পের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া দেখা যায় সেগুলি প্রকৃতি ও মানবের অন্যান্য কর্মের মধ্যেও আছে'।

১৬। শিল্পকর্মের সংগে অন্যান্য কর্মের পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শিল্পকর্মে ব্যয়িত শক্তি এমন সব বস্তুর মধ্যে সুবলয়িত রূপলাভ করে যেগুলি প্রত্যক্ষ-ভাবে আনন্দপ্রদ।

১৭। 'আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা বহুপ্রকার দ্বন্দ্ব দ্বারা খণ্ডিত ও খর্বীকৃত, যেমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের দ্বন্দ্ব, পদার্থের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে তার গঠনের দ্বন্দ্ব, বক্তব্য বস্তুর সঙ্গে ভাবভঙ্গির দ্বন্দ্ব, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দ্বন্দ্ব এবং যা দেখেছি তার সঙ্গে নিহিত অর্থের দ্বন্দ্ব। শিল্পকর্মে কিন্তু এই সব দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নেই। এখানে সবকিছুর মধ্যে এক পরম সঙ্গতি বর্তমান'।

Dewey-র শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা ও মানুষের বিপুল সৃজনক্ষমতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার উদ্ভব হয় মানবের অভিজ্ঞতার ভিতর, যার কাজ চলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং যার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন। সংক্ষেপে Dewey শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'এটি হল অভিজ্ঞতার সেই পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস যা অভিজ্ঞতার অর্থ (meaning) বৃদ্ধি করে, এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।'

(জ) ইতিহাস ও শিক্ষা: মানবেতিহাসের নিত্য পরিবর্তন-শীল ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। এখন আমরা শিক্ষার সেই ঐতিহাসিক রূপাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াস করব।

১। আদিম মানব-সমাজের শিক্ষা

আদিম মানব-সমাজে জীবন ছিল সহজ ও সরল। সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ তখনও সৃষ্ট হয় নি এবং লেখা-পড়ারও উদ্ভব হয় নি। এই সমাজে

শ্রেণীভেদ ছিল না, এমন কি পরিস্ফুটভাবে শ্রমভেদও ছিল না। এটি মূলতঃ ছিল সাম্যবাদী সমাজ। এই সমাজে শিশুরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জীবনে অংশ গ্রহণ করে ও বড়দের অনুসরণ করে এবং তত্ত্বগত শিক্ষালাভ করত নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের (ceremonies) মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের অন্তর্ভুক্তির ক্রিয়াকলাপ (initiation ceremony) ছিল সর্বপ্রধান। সাধারণভাবে আদিম সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিকে সামাজিক সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশরূপে গড়ে তোলা। অর্থাৎ এই সমাজের শিক্ষা ছিল মূলতঃ সংরক্ষণশীল, প্রচলিত সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করাই ছিল এর লক্ষ্য।

২। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে, ইহুদীদের দেশে, ইজিপ্টে ও চীন দেশেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে অতীতের জীবনের পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে অতীতের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মের অভ্যাস সৃষ্টি করে এই সব দেশে অতীতের জীবনকে ব্যক্তির জীবনে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হত। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের জন্য গঠিত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা সৃষ্টির কোন চেষ্টাই এই শিক্ষায় প্রায় করা হত না। তবে আদিম সমাজের সঙ্গে এই সব দেশের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, এদের মধ্যে সভ্যতার জন্ম ও প্রসার হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের আবির্ভাবও ঘটেছিল। সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে অন্ততঃ শিক্ষা এই সব দেশে মাত্র জীবনযাপনের উপজাত (by-product) ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি।

৩। গ্রীস দেশের শিক্ষা

অতীতের গ্রীস দেশের শিক্ষার প্রতিভূ হিসাবে আমরা স্পার্টা ও এথেন্সের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি।

(ক) স্পার্টার শিক্ষা

স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধনির্ভর রাষ্ট্রের জন্য যোগ্য যোদ্ধা নাগরিক তৈরী করা। সরকারী ব্যারাক্-বাড়ীতে ৭ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেদের রাষ্ট্রশক্তিকে ও বড়দের শ্রদ্ধা করবার এবং সাধারণভাবে আজ্ঞা পালন করবার অভ্যাস তৈরী করান হত। অতি কঠিন শাসনের মাধ্যমে

১৩। 'মানুষের কাম্যবস্তুগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের কারুর চিরন্তন মূল্যও নেই। বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের কাম্যবস্তু বিভিন্ন'।

১৪। 'শিল্প মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম রূপ'।

১৫। 'শিল্পের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া দেখা যায় সেগুলি প্রকৃতি ও মানবের অন্যান্য কর্মের মধ্যেও আছে'।

১৬। শিল্পকর্মের সংগে অন্যান্য কর্মের পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শিল্পকর্মে ব্যয়িত শক্তি এমন সব বস্তুর মধ্যে সুবলয়িত রূপলাভ করে যেগুলি প্রত্যক্ষ-ভাবে আনন্দপ্রদ।

১৭। 'আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা বহুপ্রকার দ্বন্দ্ব দ্বারা খণ্ডিত ও খর্বীকৃত, যেমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের দ্বন্দ্ব, পদার্থের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে তার গঠনের দ্বন্দ্ব, বক্তব্য বস্তুর সঙ্গে ভাবভঙ্গির দ্বন্দ্ব, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দ্বন্দ্ব এবং যা দেখেছি তার সঙ্গে নিহিত অর্থের দ্বন্দ্ব। শিল্পকর্মে কিন্তু এই সব দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নেই। এখানে সবকিছুর মধ্যে এক পরম সঙ্গতি বর্তমান'।

Dewey-র শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা ও মানুষের বিপুল সৃজনক্ষমতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার উদ্ভব হয় মানবের অভিজ্ঞতার ভিতর, যার কাজ চলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং যার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন। সংক্ষেপে Dewey শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'এটি হল অভিজ্ঞতার সেই পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস যা অভিজ্ঞতার অর্থ (meaning) বৃদ্ধি করে, এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।'

(জ) ইতিহাস ও শিক্ষা: মানবেতিহাসের নিত্য পরিবর্তন-শীল ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। এখন আমরা শিক্ষার সেই ঐতিহাসিক রূপাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াস করব।

১। আদিম মানব-সমাজের শিক্ষা

আদিম মানব-সমাজে জীবন ছিল সহজ ও সরল। সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ তখনও সৃষ্ট হয় নি এবং লেখা-পড়ারও উদ্ভব হয় নি। এই সমাজে

শ্রেণীভেদ ছিল না, এমন কি পরিস্ফুটভাবে শ্রমভেদও ছিল না। এটি মূলতঃ ছিল সাম্যবাদী সমাজ। এই সমাজে শিশুরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জীবনে অংশ গ্রহণ করে ও বড়দের অনুসরণ করে এবং তত্ত্বগত শিক্ষালাভ করত নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের (ceremonies) মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের অন্তর্ভুক্তির ক্রিয়াকলাপ (initiation ceremony) ছিল সর্বপ্রধান। সাধারণভাবে আদিম সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিকে সামাজিক সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশরূপে গড়ে তোলা। অর্থাৎ এই সমাজের শিক্ষা ছিল মূলতঃ সংরক্ষণশীল, প্রচলিত সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করাই ছিল এর লক্ষ্য।

২। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে, ইহুদীদের দেশে, ইজিপ্টে ও চীন দেশেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে অতীতের জীবনের পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে অতীতের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মের অভ্যাস সৃষ্টি করে এই সব দেশে অতীতের জীবনকে ব্যক্তির জীবনে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হত। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের জন্য গঠিত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা সৃষ্টির কোন চেষ্টাই এই শিক্ষায় প্রায় করা হত না। তবে আদিম সমাজের সঙ্গে এই সব দেশের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, এদের মধ্যে সভ্যতার জন্ম ও প্রসার হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের আবির্ভাবও ঘটেছিল। সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে অন্ততঃ শিক্ষা এই সব দেশে মাত্র জীবনযাপনের উপজাত (by-product) ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি।

৩। গ্রীস দেশের শিক্ষা

অতীতের গ্রীস দেশের শিক্ষার প্রতিভূ হিসাবে আমরা স্পার্টা ও এথেন্সের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি।

(ক) স্পার্টার শিক্ষা

স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধনির্ভর রাষ্ট্রের জন্য যোগ্য যোদ্ধা নাগরিক তৈরী করা। সরকারী ব্যারাক্-বাড়ীতে ৭ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেদের রাষ্ট্রশক্তিকে ও বড়দের শ্রদ্ধা করবার এবং সাধারণভাবে আজ্ঞা পালন করবার অভ্যাস তৈরী করান হত। অতি কঠিন শাসনের মাধ্যমে

তাদের দৈহিক শক্তি ও সহন ক্ষমতা বাড়ান হত এবং আনুগত্য, সাহস, ধূর্ততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হত। এ সবেরই উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা। স্পষ্টতঃ এই শিক্ষায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হত।

(খ) এথেন্সের শিক্ষা

এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এখানের শিক্ষায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুটা আভাস মেলে। এথেন্সেরও শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুনাগরিক সৃষ্টি করা, কিন্তু যেহেতু সেখানের রাষ্ট্র ছিল আংশিক-ভাবে গণতান্ত্রিক এবং যেহেতু সেই রাষ্ট্র যুদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি এবং চালিতও হত না, সেই হেতু এথেন্সের নাগরিকতার ধারণা ছিল অনেক ব্যাপক। এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক, মানসিক, সৌন্দর্যগত ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত দিকসমূহে যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে সুনাগরিকতার ভিত্তি রচনা করা। এই শিক্ষায় এই চারিটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব অর্পণ করা হত এবং উদ্দেশ্য ছিল সুষম চরিত্র সৃষ্টি করা। তবে দাসনির্ভর রাষ্ট্র বলে এথেন্সের শিক্ষায় পেশাগত শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। এই দিক থেকে এই শিক্ষা পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার বেশ কিছুটা পিছনে পড়ে থাকে। তার উপরে এই শিক্ষা নির্দিষ্ট ছিল কেবল মাত্র স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের জন্য। বৃহৎ দাস-শ্রেণী, নারীসমাজ ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা গ্রীক শিক্ষার আলোক থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। তবুও স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা অন্যান্য প্রাচীন দেশের শিক্ষার মত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের রথচক্রতলে নিষ্পিষ্ট করতে চায় নি। ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের মাধ্যমেই এখানে সমাজের মঙ্গল সাধন করবার চেষ্টা করা হত। এথেনীয় শিক্ষার এইখানেই অভিনবত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সুগভীর তাৎপর্য।

৪। রোমের শিক্ষা

রোমকদের সৃজনীশক্তির পূর্ণবিকাশ যুদ্ধ, আইন, দেশশাসন, স্থাপত্য ও বিশেষ করে রোমীয় শান্তি (Pax Romana) ও সাম্রাজ্যের ধারণার মধ্যে ঘটেছিল। শিক্ষার মধ্যে সেই সৃজনীশক্তির স্ফুরণ বিশেষ হয় নি। গ্রীক শিক্ষাদর্শের অনুপ্রবেশের পূর্বে রোমকদের শিক্ষা ছিল মূলতঃ নৈতিক। গৃহ

ছিল তাদের প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনুকরণ ও জীবনে অংশ গ্রহণ ছিল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ এবং মহান ব্যক্তিদের জীবনী ছিল শিক্ষার প্রধান উপায় (means)। পরবর্তী কালে গ্রীক্ আদর্শে রোমীয় শিক্ষায় (বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায়) প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল। তথাপি তখনও শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তখনও শিক্ষা ছিল সমাজ-জীবনে সার্থকভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু রোমীয় জীবনের অবনতির ফলে শেষ পর্যায়ে শিক্ষা জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং খৃষ্টান যাজকদের দ্বারা পরিবেশিত নূতন এক প্রকারের শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত অপসারিত হয়েছিল।

এথেন্সের মত প্রাচীন রোমক সভ্যতার শিক্ষা নাগরিকতার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এবং পরিচালিতও হত। সুনাগরিকতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করে রোমকরা তাদের শিশুদের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস, দেবভক্তি, আত্মসংযম, গাম্ভীর্য, সাংসারিক বিচক্ষণতা এবং সুবিচার ইত্যাদি গুণাবলী ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করত। কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে তুলনায় তাদের উদ্দেশ্যের পার্থক্য ছিল। গ্রীকরা শিক্ষার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সুষমতা (harmony) স্থাপনে বিশেষ প্রয়াসী ছিল, কিন্তু রোমকরা জাগতিক প্রয়োজনের অর্থাৎ রাষ্ট্রশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে সুনাগরিকতার গুণাবলীর নির্দেশ দিয়েছিল। আরম্ভ হতে প্রায় শেষ পর্যন্ত রোমক শিক্ষায় ব্যবহারিক জীবনের প্রভাব প্রবল ছিল। গ্রীক্‌দের মত রোমকরা বিমূর্ত তত্ত্বালোচনার প্রতি আস্থাশীল ছিল না।

৫। মধ্যযুগীয় শিক্ষা

প্রায় হাজার বছর হল মধ্যযুগের সময়-পরিধি। শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন এই বিস্তৃত কালসীমার মধ্যে ঘটেছিল। তবুও মধ্য-যুগীয় শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত মূলতঃ প্রায় এক প্রকারই ছিল। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ও পরলৌকিক।

২। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেহের ও মনের শাসনভিত্তিক চর্চার ব্যবস্থা ছিল।

অবশ্য যোদ্ধাদের (knight-দের) শিক্ষায় বেলায় শিক্ষার পারলৌকিক

29.3.75
8058

উদ্দেশ্য কিছুটা খর্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু গির্জাপরিচালিত শিক্ষা যেহেতু মধ্যযুগীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছিল, সেইহেতু সেই শিক্ষাকেই মধ্যযুগীয় শিক্ষার প্রতিভূ হিসাবে উপরে গ্রহণ করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ মধ্যযুগীয় শিক্ষা ছিল অতীতাভিমুখী। খৃষ্টধর্মের আদর্শকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাই ছিল এই শিক্ষার মূল প্রেরণা।

৬। নবজাগরণের শিক্ষা

নবজাগরণ ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিসত্তার অধিকার স্থাপনের যুগ। জীবনের প্রায় সর্বদিকেই কর্তৃত্বকে (authority) তার আসন থেকে হটাবার চেষ্টা এই যুগে চলেছিল এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিকে সৃজনী-শক্তির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল। স্বভাবতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নূতন ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাচীন গ্রীক স্বাধীনতার শিক্ষার (liberal education) আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করাও হয়েছিল। নানা উপায়ের মাধ্যমে এই যুগের শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল। তবে ধর্মীয় আদর্শ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নি, যদিও শিক্ষার প্রকৃতিতে ও লক্ষ্যে ইহজগতের প্রভাব অনেকটা বেশী পড়েছিল। অর্থাৎ নবজাগরণের মানুষ বিচার-বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্ত্বাকে অনেকটা মুক্তি দিলেও পূর্ণ মুক্তি দেয় নি। খৃষ্টধর্মের আদর্শ মানুষের বুদ্ধির ক্রিয়ার সীমারেখা (বহুদূরে হলেও) টেনে দিয়েছিল।

কিন্তু নবজাগরণের শিক্ষার এই ব্যাপক আদর্শ শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়েছিল নূতন আদর্শের প্রেরণায়। এই নূতন আদর্শ ছিল অতীব সংকীর্ণ। বিজ্ঞান এবং জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থানও এর মধ্যে ছিল না। এই শিক্ষার আদর্শ ছিল গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা। ইয়োরোপের কোন কোন দেশে এই আদর্শের আরও অবনতি ঘটেছিল। ফলে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা, বিশেষ করে বিখ্যাত ল্যাটিন লেখক Cicero-র রচনা ভঙ্গির (style) অনুকরণই, কিছুকাল ধরে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৭। ধর্মসংস্কারের যুগের শিক্ষা

ধর্মসংস্কারের যুগ হল নবজাগরণের যুগেরই পরিণতি। আসলে ইয়োরোপের উত্তরের দেশসমূহে নবজাগরণের আন্দোলন ধর্মসংস্কারের আন্দো-

লনের মধ্যেই রূপলাভ করেছিল। ধর্মসংস্কারের যুগের প্রধান লক্ষণ ছিল সমাজে ও ধর্মে সংস্কার দাবী করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দুটি দান ছিল প্রধান। একটি হল জাতীয় শিক্ষার ধারণা, অন্যটি হল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা। তবে এই যুগের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল নিম্ন শ্রেণীসমূহের বিদ্যালয় এবং তাই তাঁদের বিষয়বস্তুও ছিল অত্যন্ত সীমিত।

৮। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা

এই দুই শতাব্দীতে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার বাস্তব রূপ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের যুগের ধারণাবলীর দ্বারা মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নবজাগরণের যুগের শিক্ষার বিকৃত ধারণাই খুব বেশী প্রভাবশীল ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ মোটামুটি ধর্মসংস্কারের যুগের বিদ্যালয়গুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিল। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নবজাগরণের বিকৃত শিক্ষার অনুকরণের সমর্থনে এক নূতন তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল। এই তত্ত্বকে বলা যায় 'শাসনের ধারণা' (disciplinary conception)। শিক্ষায় এই ধারণার প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্য যে, প্রচলিত শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে জাতীয় জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে শিক্ষার মূল্য বিষয়বস্তুতে নিহিত ছিল না, ছিল বিষয়বস্তুকে আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়ার মধ্যে। এঁদের মতে নির্ভুল শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করলে এমন এক মানসিক শক্তির উদ্ভব হয় যা সর্বপ্রকারের বিষয়বস্তুকে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে এবং মানুষের মন হল কতকগুলি শক্তির (faculties) সমষ্টি যেগুলির মধ্যে স্মৃতি ও বুদ্ধিকে বিশেষভাবে অনুশীলন করা দরকার।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষার অনড় অর্থহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিভিন্ন দিক থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। এই সব প্রতিবাদকারীদের সাধারণতঃ বস্তুবাদী রূপে অভিহিত করা হয়। এই বস্তুবাদীদের মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ মানবতাবাদী বস্তুবাদী (humanistic realist), সামাজিক বস্তুবাদী (social realist) ও ইন্দ্রিয়নির্ভর

বস্তুবাদী (sense realist)। এঁদের মধ্যে বাস্তব জগতের শিক্ষা শেষোক্ত শ্রেণীর দ্বারাই প্রধানতঃ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এর কারণ এঁদের ধারণা সমাজের নূতন প্রভাবশীল শক্তির—বুর্জোয়াশ্রেণীর—স্বার্থানুকূল ছিল। মানবতাবাদী বস্তুবাদীরা চাইতেন প্রাচীন সাহিত্যসমূহ পড়তে সেগুলির বিষয়-গত মূল্যের জন্য। সামাজিক বস্তুবাদীরা চাইতেন ভ্রমণ ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবন্ত শিক্ষা—পুস্তকের মাধ্যমে ও বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে অতি সীমিত প্রাণহীন শিক্ষা নয়। ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদীরা চাইতেন প্রকৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাঁরা খুব মূল্য দিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে কয়েকটি নূতন চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল রুশো ও তাঁর শিষ্যদের চিন্তাধারা, স্পেন্সর ও হাক্সলির বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাধারা, এবং সমাজমুখী (sociological) চিন্তাধারা।

রুশো ও তাঁর শিষ্যদের প্রভাবের ফলে শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি শিশুদের দিকে কিছুটা নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের, শুধু বৌদ্ধিক নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপরও কিছুটা জোর পড়েছিল। মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে শিশুর মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল করার প্রয়াসও সুরু হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই কয়টি ধারা আদৌ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেনি, কেননা অনেক সময়ে একই ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে একাধিক ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমপ্রকাশমান নূতন সমাজব্যবস্থার (ধনতান্ত্রিক) সঙ্গে এই সব চিন্তাধারার গভীর যোগ ছিল। শিক্ষাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর আর দুটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি হল জাতীয় শিক্ষার রূপায়ণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। স্পষ্টতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম জগৎ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে সুরু করেছিল। তবে বিংশ শতাব্দীই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার সুবর্ণযুগ। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা এই শতাব্দীতে এক সর্বব্যাপক জীবনবিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত প্রগতিশীল

চিন্তা ও কর্মের ধারাকে বাছাই করে নিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের জন্য দেশে দেশে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা প্রয়াসী হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা

অগ্রসর দেশসমূহে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারণার দ্বারা প্রধানতঃ চালিত হচ্ছে ঃ

১। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন।

২। উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুকে দেওয়া উচিত এবং তার জন্য সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পূর্ণ বিকাশ।

৪। শিক্ষা শিক্ষার্থীর শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে প্রয়াসী হবে।

৫। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে শিক্ষাকে অগ্রসর হতে হবে।

৬। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের ঐহিক সুখবিধান।

৭। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জাতীয় সমাজের উন্নতি সাধন নয়, সমগ্র মানব-সমাজের উন্নতিসাধন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও উপরি-উক্ত ধারণাগুলির দ্বারা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা চালিত হচ্ছে, তথাপি গন্তব্য স্থান এখনও বহুদূরে যেহেতু কোন দেশেরই সমাজব্যবস্থা এখনও পূর্ণভাবে গণতন্ত্রসম্মত হয়ে উঠে নি। তবে নিশ্চিতভাবেই সমস্ত দুনিয়ার সমাজ ও শিক্ষা গণতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র হল একটি সীমাহীন আদর্শ, সুতরাং কোন সমাজই কোন অবস্থাতে গণতন্ত্রের শেষ সীমায় পৌছোতে পারবে না। যুগে যুগে গণতন্ত্রের ধারণা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হবে এবং সমাজ ও শিক্ষার সামনে তাই নূতন নূতন পূর্বাচলের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে এবং নূতন নূতন আলোকের সন্ধান মিলবে।

(ঝ) শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে মহান শিক্ষানায়ক-দের ধারণাবলী ঃ

১। প্লেটো (Plato)

যদিও Republic এবং Laws এই দুটি গ্রন্থেই প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বের

পরিচয় মেলে, তথাপি অধিকতর বিখ্যাত ও প্রভাবশীল Republic গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই আমরা প্লেটোর শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণার রূপাঙ্কন করছি।

শিক্ষাকে প্লেটো দর্শন ও রাজনীতির অচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখেছিলেন। প্লেটো মনে করতেন যে, শিক্ষা হল দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় ও অচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে তিনি শুধু আদর্শ সমাজের জন্য ব্যক্তির চরিত্রগঠনের কাজ দেন নি। শিক্ষার সাহায্যে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিদের নির্বাচনও করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কর্তব্য হল প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কাজের জন্য যোগ্য তা নির্ণয় করা এবং তারপর সেই কাজের জন্য তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে উপযুক্তভাবে তৈরী করা। অবশ্য যে বিপুল জনসাধারণ বিশ্বের সমস্ত দৈনন্দিন কাজ করে তাদের শিক্ষা নিয়ে প্লেটো মাথা ঘামাননি। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে তিনি শুধু রাষ্ট্রশাসক ও যোদ্ধাদের শিক্ষাকে স্থান দিয়েছেন। প্লেটোর মতে শিক্ষা হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু এবং অতি শৈশব থেকেই তা সুরু হওয়া উচিত। তাঁর মতে উচ্চতম স্তরে শিক্ষার কাজ হল ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে দৃশ্যমান জগতের চিন্তা থেকে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আসল প্রকৃতির চিন্তার দিকে পারচালিত করা। তিনি শিক্ষার পেশাগত দিক ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সর্ব দিকেই নজর দিয়েছিলেন।

২। অ্যারিষ্টটল (Aristotle)

অ্যারিষ্টটলও প্লেটোর মত শিক্ষাকে রাজনীতি ও দর্শনের অংশ বলে ভাবতেন এবং শিক্ষাদানকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি, অভ্যাস এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে এবং ধনী ও দরিদ্র সকলের শিক্ষাই এক প্রকারের হওয়া উচিত। তিনিও প্লেটোর মত ব্যবহারিক জীবন ও পেশার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সংগঠনকে তিনি শিশুদের বুদ্ধির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রাকৃতিক ও জৈব বিজ্ঞানকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে উচ্চতম স্তরের শিক্ষার কাজ হল তত্ত্বীয় বুদ্ধির (theoretical reason) চর্চা করা

এবং প্লেটোর মত তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ও পেশাগত দিক ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সর্ব দিকেই নজর দিয়েছিলেন।

৩। কুইনটিলিয়ান্ (Quintilian)

কুইনটিলিয়ান্ বাড়ীর শিক্ষার চেয়ে সামাজিক পরিবেশে দলবদ্ধভাবে পরিচালিত শিক্ষাকে অনেক বেশী পছন্দ করতেন এবং প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত রাষ্ট্রের নাগরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তৈরীর ভার শিক্ষাকে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে আদর্শ মানবের ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ হওয়া উচিত এবং প্লেটোর মত তিনিও সাধারণ মানুষের শিক্ষার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তিনি ব্যক্তিগত বৈষম্যানুযায়ী শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য বিষয়বস্তুর নির্বাচনে স্বাধীনতার কথারও উল্লেখ করেছিলেন।

৪। সেণ্ট অগাষ্টিন (St. Augustine)

অগাষ্টিন্ মনে করতেন যে, শিক্ষাদানের (teaching) কাজ হল শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে উদ্দীপিত করা (stimulate)। সত্য শিক্ষার্থীর অন্তরেই নিহিত থাকে, তাই শিক্ষকের কাজ হল সেই সত্যকে আবিষ্কার করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা।

৫। সেণ্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas)

অ্যারিষ্টটলের মত সেণ্ট টমাসও মনে করতেন যে, মানুষের আত্মা হল একটি সক্রিয় সত্তা। সুতরাং শিক্ষা সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তার জন্যই। ডাক্তার যেমন দেহকে সাহায্য করেন অসুখের হাত থেকে মুক্তি পেতে, শিক্ষকও তেমনি শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষালাভ করার শক্তিকে ব্যবহার করতে সাহায্য করেন। শিক্ষা শিক্ষার্থীর উপর চাপান কোন বাইরের বস্তু নয় এবং এর মূল কথা হল অপরিণত শক্তিকে (potentiality) প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। একুইনাসের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সেবা করা, তাঁকে ভালবাসা এবং মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে অনন্ত সুখভোগ করা।

৬। ইরাসমাস (Erasmus)

ইরাসমাস মনে করতেন শিক্ষার কাজ হল চারটি : (১) ধর্মভাব

জাগরণ করা, (২) প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করা, (৩) জীবনের বিভিন্ন কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করা এবং (৪) প্রথম হতেই সদাচরণের অভ্যাস সৃষ্টি করা। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই দায়িত্ব এবং খুব অল্প বয়স থেকেই সুরু হওয়া উচিত। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তির উন্নতির মূলে তিনটি জিনিস থাকা প্রয়োজন : (১) আদিম প্রকৃতি (nature), (২) শিক্ষা (training) ও (৩) ব্যবহার (practice)। তাঁর মতে এই তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল শিক্ষা। প্রকৃতির প্রভাব আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার যুক্ত হলে ফল হয় সুদূরপ্রসারী।

৭। কমিনিয়াস (Comenius)

কমিনিয়াসের মতে শিক্ষা হল সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার এবং নিজেকে ও বিশ্বকে জানার এবং নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে ইহলোকের ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিই হল শিক্ষা। তাঁর মতে অতি শৈশব থেকেই শিক্ষা সুরু করা উচিত এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৮। জন লক্ (John Locke)

লকের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক বেশী এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে একটি পৃথক সত্তা ভাবে দেখলেই শিক্ষা হয় সার্থক। শিক্ষার তিনটি দিক হল—দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক এবং তার লক্ষ্যবস্তুগুলি হল—দেহের শক্তি. নৈতিক চরিত্র, জাগতিক জ্ঞান, সুব্যবস্থার ও বৌদ্ধিক শিক্ষা। লক্ মনে করতেন, দেহ, মন, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তিসমূহের সংযত চর্চার (discipline) মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সিদ্ধ হয়।

৯। কন্‌ডরসেট্ (Condorcet)

অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষারও কাজ হল দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শক্তিগুলির চর্চার মাধ্যমে মানবজাতির ক্রমিক (gradual) এবং সাধারণ উন্নতি সংসাধন।

১০। রুশো (Rousseau)

শিক্ষা হল একটি ছেদহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এর উৎস হল মানুষের

অন্তরে। শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল মূলতঃ শিখন (learning) পরিচালনা এবং দূরের কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এটি প্রস্তুতি নয়। তাঁর মতে শিশুর স্থান হল শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে।

১১। পেস্তালৎসী (Pestalozzi)

শিক্ষার প্রধান কাজ হল ব্যক্তির শক্তিসমূহের সর্বাংগীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশের ধারাকে পেস্তালৎসী জৈবিক (organic) বিকাশ বলে দেখেছেন এবং তাঁর মতে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মাবলীর মাধ্যমে এই বিকাশ সংঘটিত হয়।

১২। ফ্রোয়েবেল (Froebel)

শিক্ষা হল কর্মের মাধ্যমে বৃদ্ধির ও বিকাশের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং সৃজনমূলক কর্মের মধ্য দিয়েই এই বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর সৃজনমূলক কর্ম ঈশ্বরের সৃজনমূলক কর্মের সমগোত্রীয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে এবং নিজ বৃদ্ধি ও বিকাশও সংসাধিত করে।

১৩। হার্বার্ট (Herbart)

শিক্ষা এমন একটি শিল্পকর্ম, দর্শন যার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং মনস্তত্ত্ব করে উপায় নিরূপণ। শিক্ষার তিনটি দিক আছে : (১) শৃঙ্খলারক্ষা (government), (২) শিক্ষণ (instruction) ও (৩) নৈতিক শিক্ষা (training)। এই তিনটি দিকের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল শিক্ষণ, কেননা তাঁর মতে এর সাহায্যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য (নৈতিক উৎকর্ষ) সবচেয়ে বেশী সাধিত হয়।

১৪। হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer)

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের (complete living) জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তোলা। এই প্রস্তুতির প্রথম কথা হল ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য যোগ্য জ্ঞানার্জন এবং এর দ্বিতীয় কথা হল এই জ্ঞানকে ব্যবহার করার মত ক্ষমতা অর্জন। স্পেন্সর সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ ও সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানসমূহকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন তিনি নবজাগরণের ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

১৫। মন্তেসরী (Montessori)

শিশুর শিক্ষণকার্য পরিচালনাই হল শিক্ষা। শিশুর পরিবেশকে যোগ্যভাবে চালিত করে শিক্ষাদান করবেন শিক্ষক এবং শিক্ষার মূলকথা হল স্বাধীনতা ও আত্মসক্রিয়তা। মন্তেসরীর মতে শিক্ষাক্রিয়া শিশুপ্রকৃতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত।

১৬। জন ডিউই (John Dewey)

শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ নিজেকে মানসিক দিক থেকে নবায়িত করে চিরন্তন করে রাখে। শিক্ষা ব্যক্তিমন চালিত করার কাজে সমাজের হাতে একটি মহামূল্য আয়ুধ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা হল সমাজেরই একটি বিশেষ কর্ম। শিক্ষা সমাজের প্রগতিসাধনের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষা, বৃদ্ধি বা বিকাশ ও জীবন সমার্থক এবং যেহেতু মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশ সংঘটিত হয় অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে, সেইহেতু শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার নিত্যপুনর্গঠনপ্রক্রিয়া বলেও অভিহিত করা যায়। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ও আচরণের পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজের অভিজ্ঞতা ও আচরণের পুনর্গঠন হয়, সেইজন্য শিক্ষার ব্যক্তি ও সামাজিক দিকের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রকৃত শিক্ষা গণতন্ত্রেই সম্ভব এবং প্রকৃত গণতন্ত্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখতে বাধ্য। সুতরাং গণতন্ত্র ও শিক্ষা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ।

১৭। বিবেকানন্দ (Vivekananda)

আভ্যন্তরীণ পরমোৎকর্ষের বহিঃপ্রকাশই হল শিক্ষা। মানুষের শিক্ষণ হল আসলে আবিষ্কার। অনন্ত জ্ঞানের খনি মানবাত্মার আবরণ উন্মোচনই হল শিক্ষার কাজ।

১৮। মোহনদাস গান্ধী (Mohandas Gandhi)

শিশু ও পরিণত বয়স্কের দেহ, মন ও আত্মার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে আনাই হল শিক্ষা।

১৯। অরবিন্দ ঘোষ (Aurobindo Ghosh)

প্রকৃত শিক্ষার প্রথম তত্ত্ব হল এই যে, কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষাদান করা নয়, সাহায্যকারী ও পরিচালনাকারীর কাজ করা।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)

শিক্ষা হল একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিনিয়তই স্বাধীনতার প্রয়োজন। শিক্ষা পরিপাকক্রিয়ার মত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার প্রধান উপকরণ হল আনন্দ। শিক্ষা সমাজের বেঁচে থাকার একটি প্রধান উপকরণ এবং তার শ্রেষ্ঠ বাহন হল মাতৃভাষা। সার্বিক অনন্তসত্তার সংগে সংগতি রেখে ব্যক্তির সর্বাংগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনই হল শিক্ষার কাজ।

শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত উক্তির আলোচনা

নিম্নে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বহুপ্রচলিত উক্তির আলোচনা করা হল। উদ্দেশ্য এই আলোচনা শিক্ষার প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করবে।

১। পরিবর্তনই হল শিক্ষার মূল কথা

শিক্ষা বলতে নিশ্চয়ই পরিবর্তন বুঝায়, কেননা শিক্ষা মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনে। তথাপি যে কোন পরিবর্তনই শিক্ষার উপজীব্য নয়। শিক্ষা শুধু মানবাচরণের সেই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলির সাহায্যে বক্তির ও সমাজের দিক থেকে মানব-জীবন আরও সুখী ও মহৎ হয়ে উঠে।

২। শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও জীবন-প্রক্রিয়া একই

জীবন-প্রক্রিয়া হল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে জীবনের আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের নিয়মানুগ বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের ধারা জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। শিক্ষা হল জীবন-প্রক্রিয়ার সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া যার সহায়তায় স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশ সার্থকতর হয়। তাই শিক্ষা ও জীবনের সম্পর্ক যদিও নিবিড়, তবুও তারা

একই বস্তু নয়। আবার শিক্ষা যদিও স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের নিয়মানুগ বিকাশে সাহায্য করে, তবুও সে হল একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া এবং তাই জীবনের মত শুধুই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানব-জীবনও (বিশেষতঃ বর্তমানকালে) একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। প্রধানতঃ শিক্ষাক্রিয়ার মাধ্যমেই মানব-জীবনে কৃত্রিমতা এসেছে এবং আসছে।

৩। শিক্ষাই সঙ্গতিবিধান

জীবন-প্রক্রিয়া ও সঙ্গতিসাধন-প্রক্রিয়া মূলতঃ সমার্থক, কেননা জীবন চলতে হলে পরিবেশের সঙ্গে জীবকে অবিরত সঙ্গতিসাধন করতে হয়। তবে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সঙ্গতিসাধন-প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীরা পরিবেশকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখে নিজেদের আচরণকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে (adapt করে) নেয়। মানুষ কিন্তু অবিরত চেষ্টা করে তার পরিবেশকে নিজ প্রয়োজন মত পরিবর্তিত করতে। তাই মানুষের সঙ্গতিবিধান-প্রক্রিয়াকে অনেক শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই উন্নততর সঙ্গতিবিধান (superior adjustment) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কোন প্রকারের সঙ্গতিবিধানই শিক্ষার সমার্থক নয়, তার কারণ শিক্ষার কাজ হল স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াকে সুপরিচালিত করে আরও সার্থক করে তোলা। অর্থাৎ সঙ্গতিসাধন-প্রক্রিয়ার সহিত গভীর ও ব্যাপকভাবে যুক্ত হলেও শিক্ষা সঙ্গতিবিধান-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্মীভূত নয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাদার্শনিকগণ মানুষের পরিবেশকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। যেমন এ্যাডামসন্ (Adamson) বলেছেন যে, মানুষের পরিবেশ প্রাকৃতিক জগৎ, সামাজিক জগৎ ও নৈতিক জগৎ এই তিনটি জগৎ নিয়ে গঠিত এবং রাস্ক (Rusx) বলেছেন যে, মানুষের পরিবেশের দুটি অংশ আছে, যে দুটির নাম হল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিক পরিবেশ।

৪। শিক্ষা ও বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া একই

শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই এই উক্তির প্রবর্তক। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া শুধু বৃদ্ধির (অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের) সঙ্গে

সম্পর্কিত নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার (developmental process) সঙ্গেও তার সম্পর্ক নিবিড়, কেননা শেষোক্ত প্রক্রিয়া গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। তারপর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে পরিষ্কারভাবে বোঝান প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল এই যে, শিক্ষা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। শিক্ষা এই দুই প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট আদর্শের পথে পরিচালিত করতে চায়। সুতরাং শিক্ষা-প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া দুটির সহিত এক ও অভিন্ন নয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, জন ডিউই বৃদ্ধি শব্দটির দ্বারা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন দুইকেই বুঝাতে চেয়েছেন এবং এই উক্তির মধ্যে না হলেও অন্যস্থানে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়েরই বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ডিউই বৃদ্ধির জন্য আরও বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য লক্ষ্যকে নির্দেশ না করে শিক্ষার লক্ষ্যকে কিছুটা অনির্দিষ্ট করে তুলেছেন।

৫। শিক্ষার অর্থ ব্যক্তিতার (individuality) বিকাশ

প্রত্যেকটি মানুষের একটি বিশেষ ব্যক্তিতা আছে। এই ব্যক্তিতার দিক থেকে সে অন্যান্য সব মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। এই পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিতা সমাজ-জীবনে নূতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভবে বিশেষ সহায়ক এবং এর বিকাশে মানুষ গভীর আনন্দলাভ করে। শিক্ষা-প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য হল মানুষের সমস্ত শক্তির সার্থক ও সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন করা, এই ব্যক্তিতার বিকাশ নিশ্চয়ই বিশেষ করে চাইবে।

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা সামাজিক দিকও আছে যেখানে তার সঙ্গে অন্য সমস্ত ব্যক্তির মিল আছে। সমাজ-জীবনের সংহতির জন্য এই দিকের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বিশেষভাবে কাম্য। সুতরাং একদিক থেকে শিক্ষা যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে, অন্যদিক থেকে তেমনি তার সামাজিক দিকেরও বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ব্যক্তিতা হল সমাজ-জীবনের সৃষ্টি। সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়েই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে এবং তার ব্যক্তিতার বিকাশও ঘটে—এই হল আধুনিক মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বের রায়।

৬। শিক্ষার অর্থ ভিতরের বস্তুকে বাইরে আনা (Education is unfoldment)

ভাববাদী শিক্ষাবিদ্‌দের দ্বারাই এই ধারণাটি প্রচলিত ও সমর্থিত হয়ে আসছে। তবে ইয়োরোপে এই তত্ত্বটি ফ্রোয়েবেলের নামের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে, কেননা তিনিই এই মতের খুব নামকরা ও জোরালো সমর্থক ছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত ভাববাদী শিক্ষাবিদ্ ও এই মতের সমর্থক ছিলেন ও আছেন। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও গান্ধীজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধারণা বা তত্ত্বটির অর্থ হল এই যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষকে নূতন কিছু দেওয়া যায় না, তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে যা আছে তাকেই কেবল বাইরে আনা যায়। উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য। এর মধ্যে সত্যতা রয়েছে প্রথমতঃ, এই ধারণার মধ্যে যে, যা আদৌ নেই তা থেকে কিছুই তৈরী করা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, আরেকটি ধারণার মধ্যে যেটি হল এই যে, মানুষের বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মাবলীকে শিক্ষাক্রিয়ায় অগ্রাহ্য করা যায় না। এই ধারণাটি বিশেষ ত্রুটিযুক্ত বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে। বৌদ্ধিক শিক্ষার দিক থেকে এই উক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে, পূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বাইরে থেকে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করা প্রয়োজন এবং নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে এই কারণে ত্রুটিযুক্ত যে, নৈতিক রস (moral sentiment) ও আদর্শ ইত্যাদি শুধু বহিরাকর্ষণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করা যায় না। শেষোক্ত-গুলির ক্ষেত্রে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা এই মতটির মধ্যে স্বীকার করা হয় নি। স্পষ্টতঃ এর মধ্যে একটি স্থাণু পরমোৎকর্ষের (perfection) ধারণা নিহিত রয়েছে, যে উৎকর্ষ সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য।

৭। শিক্ষার অর্থ অতীতের পুনরাবৃত্তি (Education as recapitulation)

পুনরাবৃত্তি তত্ত্বকে জার্মানীতে শিক্ষাবিদ্ হার্বার্টের শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে পরিস্ফুটভাবে প্রচারিত হতে দেখা গিয়াছিল এবং এক সময়ে এই তত্ত্বটি

শিক্ষাজগতে বেশ প্রভাবও বিস্তার করেছিল। এই তত্ত্বটি একটি তুলনার (analogy) উপর নির্ভরশীল। জীববিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) একটি জৈব নিয়মের কথা বলেছিলেন যার মূলকথা হল এই যে, প্রত্যেকটি মানুষ দৈহিক দিক থেকে সমগ্র মানবজাতির অতীতের পুনরাবৃত্তি করে। পুনরাবৃত্তি তত্ত্বে বলা হয় যে, দৈহিক দিকের মত মানসিক দিকের বেলাতেও প্রত্যেক মানুষের জীবনে জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং শিক্ষার কাজ হল দেখা যে, পুনরাবৃত্তির কাজটি যেন ভালভাবে চলে। অর্থাৎ এই তত্ত্বের সমর্থকদের কাছে শিক্ষা হল একটি অতীতাভিমুখী প্রক্রিয়া।

এই তত্ত্বটির জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত ভিত্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। ভ্রূণাবস্থায় মানবশিশুর দেহে নিম্নতর জীবনপর্যায়গুলির কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেলেও ঠিক যে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটে এ কথা সত্য নয়। সংক্ষিপ্ত পথানুসরণ ও পূর্বের ক্রমিক ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তির ধারায় নূতনের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

এই তত্ত্বটি বংশধারা (heredity) ও পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধেও ভুল ধারণার উপর নির্ভরশীল। এই তত্ত্বটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বংশধারা ও পরিবেশ হল দুটি পরস্পর-বিরোধী বস্তু, জাতির অতীতের জীবন ব্যক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু এই ধারণাগুলির কোনটাই সত্য নয়। বংশধারা ও পরিবেশ পরস্পর-বিরোধী শক্তি নয়। পরিবেশের মাধ্যমেই বংশধারার বিকাশ সম্ভব হয়। অতীতের জীবন বর্তমানের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না। অতীত থেকে লাভ করা বস্তুসমূহ বর্তমানের পরিবেশে নূতন চাহিদার অনুরূপ রূপ লাভ করে। বস্তুত পরিবেশের প্রভাব মোটেই নগণ্য নয়। বংশধারা মৌলিক ক্ষমতাটিকে দান করে কিন্তু পরিবেশ তার প্রকাশের পথ ও রূপ নির্ধারিত করে।

এই তত্ত্বটির মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা এই। মানবশিশু এখনও অতীতের মানবের মত প্রথমে কতকগুলি অন্ধ প্রবৃত্তি ও অপুষ্ট শক্তি নিয়ে জন্মায় এবং অতীতের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়কে অগ্রাহ্য করে শিক্ষাকার্য চলতে পারে না।

৮। শিক্ষার অর্থ বাহির থেকে গঠন (Education is formation from without)

শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃতি উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তাঁর ধারণায় পুরাতন ভাবগুলির (ideas, presentations) প্রভাব হল অসীম, কেননা তারা নূতন বিষয়বস্তুর ও ভাবের আয়ত্তীকরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি মনে করতেন যে, সর্বপ্রকার বিষয়বস্তুতে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য, কেননা মানব মনে জ্ঞানের বিকাশ কয়েকটি নির্ধারিত স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে। এই মতবাদটির দোষ এই হল যে, এতে শিক্ষার্থীর প্রকৃতির প্রচেষ্টামূলক (conational) দিককে ও সামাজিক পরিবেশকে প্রায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মনের এক অতি মৌলিক অংশ হল কতকগুলি প্রচেষ্টামূলক প্রবৃত্তি (tendency) যারা বিভিন্ন মানসিক শক্তির সাহায্যে পরিবেশের সম্পর্কে এসে তার সমগ্র অভিজ্ঞতার ধারাকে সৃষ্টি করে। সুতরাং এই প্রবৃত্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। তার উপর মানুষ শুধু বৌদ্ধিক পরিবেশ (intellectual environment) থেকে শিক্ষালাভ করে না, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাধারার উপর অসীম। সুতরাং এই সামাজিক পরিবেশ ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাদানকারীরা কোন প্রকারেই অগ্রাহ্য করতে পারে না। এই মতের মধ্য দিয়ে পুরাতন ধারণাগুলির প্রভাবকে একটু বেশী করে দেখান হয়েছে এবং অদৃষ্টপূর্ব নূতনের জন্য কোন বিশেষ স্থান রাখা হয় নি।

৯। শিক্ষার অর্থ মানসিক শক্তিগুলির শিক্ষাদান (Education as traning of faculties)

মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্ব (theory of formal discipline) ও এই তত্ত্বটি একই। বহুপ্রাচীনকাল থেকে এই তত্ত্বটি চলে আসছে। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মতে মানুষের মন হল কতকগুলি পৃথক শক্তির সমষ্টি এবং শিক্ষা যোগ্য বিষয়বস্তুতে প্রয়োগ করে তাদের সুগঠিত করে তোলে। মনের এই শক্তিগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষণ (perception), অনুভূতি, কল্পনা শক্তি, চিন্তন, স্মরণ, সংকল্প (will) ইত্যাদি হল প্রধান। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে ত্রুটিযুক্ত :

১। আধুনিক মনস্তত্ত্ব স্বীকার করে না যে, মন হল কয়েকটি পৃথক শক্তির সমষ্টি।

২। এক বিষয়ে অভ্যাস করা হলে মনের সাধারণ উন্নতি হবে এ কথাও আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস করে না। শিখনের সঞ্চালনে আধুনিক মনস্তত্ত্বও বিশ্বাসী, কিন্তু বিষয়বস্তুকে যে কোনভাবে উপস্থাপিত করলে, মনের যে কোন ভাব (attitude) থাকলে বা যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিখন সঞ্চালিত হয় না। শিখন সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ মনস্তত্ত্ব সম্মত পদ্ধতি ও ইতিবাচক মনোভাব। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক-ভাবে উপস্থাপিত করলে, সজ্ঞান ইতিবাচক মনোভাব থাকলে ও অভিজ্ঞতায় সামান্যী করণের জন্য বিশেষভাবে প্রয়াসী হলে সার্থকভাবে শিখন সঞ্চালন সম্ভব হয়।

এই তত্ত্বটির গুণ হল এই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখান হয়েছে। অর্থাৎ এতে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সার্থক হতে হলে বাইরের সামাজিক জীবনেও তাকে কার্যকরী হতে হবে।

১০। শিক্ষার অর্থ জীবনের জন্য প্রস্তুতি (Education is preparation for life)

এই উক্তিটিও আংশিকভাবে সত্য। উক্তিটি এই কারণে কিছুটা সত্য যে, বাস্তবিক যে শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকারে প্রস্তুত করে না সে শিক্ষা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তবে যে শিক্ষা শুধু ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই চলে সে শিক্ষা বর্তমান জীবনকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলতে পারে এবং তাই সমস্ত প্রকৃত শিক্ষাকেও অসম্ভব করে তুলতে পারে। সার্থক শিক্ষা বর্তমানের জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করে যাতে শিক্ষার্থীর জীবন বর্তমানে ও ভবিষ্যতে দুয়েতেই সার্থক হয়ে উঠে। সুতরাং শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষার্থীর বর্তমানের সুখ-দুঃখকেও মনে রাখতে হবে, আবার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখকেও মনে রাখতে হবে। এই কথাগুলি মনে রাখলে সহজেই বোধ্য হবে, কেন আলোচ্য উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

১১। শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ

জীবনের ধর্ম হল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। যেহেতু ব্যক্তির জীবন নশ্বর, সেইহেতু খাদ্যগ্রহণ ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করার মধ্য দিয়ে সে চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। ব্যক্তির দিক থেকে এই আত্মনবায়নের চেষ্টা যেমন নিরন্তর চলেছে, তেমনি সমাজের দিক থেকেও একই ধরণের প্রচেষ্টা চলেছে। তবে মানসিক দিক থেকে সমাজ নিজেকে নবায়িত করে প্রধানতঃ তার চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতিগুলিকে নবাগতদের মধ্যে সঞ্চালিত করে। এই সঞ্চালন ক্রিয়াই হল শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল সমাজ-সংরক্ষণের একটি প্রধান উপায়। সমাজের সভ্যদের ঠিক পথে চালিত করাও সমাজের একটি কাজ এবং তার দ্বারাও সমাজ সংরক্ষিত হয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই কাজটিও খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, কেননা চিন্তা, ভাব ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে মানুষকে যে ভাবে আয়ত্তে আনা যায়, অন্য কোন প্রকারে তা সম্ভব নয়। তবে সমাজ-সংরক্ষণ যদিও শিক্ষার অন্যতম প্রধান কর্তব্য তথাপি তা শিক্ষার একমাত্র কাজ হতে পারে না, কারণ সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও শিক্ষার কাজ এবং সেই কাজ শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রধানতঃ নমনীয় মনোভাব ও অভ্যাস গঠন এবং বুদ্ধির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, চলমান বিশ্বে অগ্রগতি ভিন্ন সংরক্ষণও সম্ভব নয়। সুতরাং এক অর্থে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের মধ্য দিয়ে তার সংরক্ষণই ভাল করে সাধিত করে।

১২। শিক্ষার অর্থ সমাজীকরণ ঃ

মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে দেহের দিক থেকেও যেমন থাকে উলঙ্গ, মনের দিক থেকেও তেমনি থাকে উলঙ্গ। সমাজই তাকে দৈহিক ও মানসিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে (অবশ্য এই উপমার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা রয়েছে) মানুষ করে তোলে। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজীকরণ অর্থাৎ সমাজের ভাব-ভাবনা, চিন্তা ও কর্মের সঞ্চালন। কিন্তু শুধু সমাজীকরণ সমাজ-সংরক্ষণ ও সমাজ-সংহতি সাধিত করে কিন্তু সমাজের প্রগতি সাধন করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ। এই ব্যক্তিতার

বিকাশের মধ্য দিয়েই সমাজে ঘটে নূতনের আবির্ভাব। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হল দুইই পূর্ণ—সামাজীকরণ ও ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশসাধন।

১৩। শিক্ষার অর্থ অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠন

শিক্ষার প্রচলিত স্থাণু ধারণাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ডিউই শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন। অবশ্য তাঁর দেওয়া শিক্ষার এই সংজ্ঞাটি শুধু অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের কথাই বলে না। তিনি এই পুনর্গঠনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার অর্থ বৃদ্ধির কথাও বলেছেন এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলেছেন। সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, অভিজ্ঞতার এই পুনর্গঠন বলতে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পুনর্গঠনকে তিনি বুঝিয়েছেন।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ডিউই প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত এই উক্তিটির অর্থ কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বলতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠনকে বোঝায়, কেননা তা নাহলে অভিজ্ঞতাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, অভিজ্ঞতা সব সময়েই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির অভিজ্ঞতা। তারপর 'অর্থ' (meaning) কথাটির অর্থও সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। অভিজ্ঞতার অর্থ বলতে ডিউই বুঝিয়েছেন, অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত সম্পর্কাবলীকে (connections) ও পরিণতিগুলিকে (consequences)। অর্থাৎ কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার অর্থ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন তার উপাদানগুলির মধ্যকার সম্পর্কগুলিকে ও পরিণতিগুলিকে আরও ভাল করে উপলব্ধি করা যায়। সংজ্ঞাটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বস্তু হল এর পরিবর্তনশীলতার দিকে ঝোঁক। অতি-উৎসাহীর হাতে এর অর্থ বিকৃতরূপ না পেলে এটিকে শিক্ষার একটি প্রগতিশীল সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করা যায়।

১৪। শিক্ষা ও গণতন্ত্র অচ্ছেদ্য

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য। প্রকৃত গণতন্ত্র সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ চায় এবং এই বিকাশ একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজ ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার এমন পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস যার দ্বারা মানুষের জীবন প্রগতির পথে

প্রতিনিয়ত অগ্রসর হতে পারে। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব, কেননা সেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল বা শ্রেণীর স্বার্থ শিক্ষা-ক্রিয়ার প্রসার ও বিকাশের পথে অন্তরায় হতে পারে না।

সিদ্ধান্ত

এ পর্যন্ত আমরা শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণালাভ করলাম তা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করছি।

১। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে শিক্ষা মানব-জাতির জীবন ধারাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করে।

২। শিক্ষা সমাজের সংরক্ষণের ও প্রগতিসাধনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হাতিয়ার।

৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমেই শিক্ষা তার সর্বদিকের কার্য সম্পন্ন করে।

৫। মানবেতিহাসের বিবর্তনধারায় শিক্ষার নানা রূপান্তর ঘটেছে এবং ঘটবেও।

৫। শিক্ষা দর্শনের সক্রিয় রূপ।

৬। শিক্ষা একটি তিন-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া। এর মধ্যে সক্রিয় মেরু দুটি হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারী।

৭। শিক্ষা-ক্রিয়ার পরিচালনায় জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত জ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে।

৮। শিক্ষাক্রিয়ায় উপাদান হিসাবে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন, পরিচালনা ও পরীক্ষা ইত্যাদি বর্তমান থাকে।

৯। শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পূর্ণ বিকাশ সাধনে প্রয়াসী।

১০। গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অন্যান্য সর্বপ্রকার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়ে অনেক নিবিড়। প্রকৃত গণতন্ত্র অব্যাহত শিক্ষাধারা ভিন্ন বাঁচতে পারে না এবং প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব।

১১। শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত হয় না। বিদ্যালয় ভিন্ন

যে সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের নাম হল পরিবার, ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও বিভিন্ন সঙ্ঘ-সমিতি ইত্যাদি।

১২। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃতি ও রূপ অংঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রূপ যেমন হয় শিক্ষার প্রকৃতি ও রূপও তেমনি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষারও রূপান্তর ঘটে। শিক্ষা সমাজেরই একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, সমাজবহির্ভূত কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া নয়।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রকৃতি

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজেই শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব। সুতরাং এখন আমাদের দেখা উচিত গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি সার্থক রূপ ফুটে উঠে। আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা সংসদের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাকারী কমিশন (Educational Policies Commission of National Education Association) গণতান্ত্রিক শিক্ষায় যে রূপরেখা দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে আমরা কমিশনের ব্যক্তব্যের মূল অংশ লিপিবদ্ধ করলাম।

১। গণতান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির মঙ্গলসাধন করা।

২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করতে চায়, বুদ্ধি, জাতি, ধর্ম, সামাজিক অবস্থা (social status), অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশাগত পরিকল্পনা (vocational plans) নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিতে চায়।

৩। গণতান্ত্রিক শিক্ষা সমাজে প্রচলিত নাগরিক স্বাধীনতাসমূহকে (civic liberties) শ্রদ্ধা করে এবং পাঠের মাধ্যমে তাদের অর্থ সুপরিস্ফুট করে তোলে।

(৪) স্বাধীনতা উপভোগের জন্য যে সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং

সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন গণতান্ত্রিক শিক্ষা তাদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

(৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাসমূহের নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করার অধিকার সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা দান করে।

(৬) গণতান্ত্রিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে এবং ছাত্রদের বিভিন্ন কর্মে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে।

(৭) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তির সদ্ব্যবহার করে এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্ম-দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের শিক্ষাদান করে।

(৮) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শিক্ষা এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেকটি সামাজিক সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্তব্য, প্রত্যেকটি কর্তৃত্বের সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে আসে দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বের সঙ্গে আসে যে দল সামাজিক সুবিধা বা কর্তৃত্ব দান করে তার কাছে কৈফিয়ত দান।

(৯) গণতান্ত্রিক সমাজ সকলের বুদ্ধিকে মুক্তিদান করে ও ব্যবহার করে।

(১০) গণতান্ত্রিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উপকরণের দ্বারা নাগরিকদের সজ্জিত করে তোলে।

(১১) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভাল করে বোঝা এবং উপভোগ করার উপর গুরুত্ব অর্পণ করে এবং মহৎ কর্মে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান করে গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করে।

উপরে গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া গেল সেটিতে ঐ শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলির উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ঐ মৌলিক তত্ত্বগুলিকে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করলে শিক্ষার কি রূপ ফুটে উঠে সেটিও দেখা কর্তব্য। নিম্নে আমরা সেই প্রচেষ্টা করছি।

১। বিদ্যালয়ের সাধারণ রূপ

গণতান্ত্রিক তত্ত্বগুলি প্রয়োগ করলে বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের একটি গবেষণাগারে পরিণত হয়। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের চেষ্টা করে এবং নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সেই চেষ্টা ও পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাইরের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জীবনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

২। বিদ্যালয়-জীবনের লক্ষ্য

গণতান্ত্রিক জীবনের যা লক্ষ্য, গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়েরও সেই লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন। সুতরাং ব্যক্তির ও সমাজের পূর্ণ বিকাশের জন্য যা-যা প্রয়োজন সেই সবই হল গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। পরের পরিচ্ছেদে আমরা গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

৩। শিক্ষার বিষয়বস্তু

এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিষয়বস্তুসমূহের স্থান থাকবে, কিন্তু সেগুলি গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনের সাহায্যকারী উপায় হিসাবেই থাকবে। সুতরাং এখানে ভাব ও জ্ঞান হবে জীবন্ত, অনড় ('inert') নয়। এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত বিষয়বস্তু হল শিক্ষার্থীদের সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য উপযোগী সর্বপ্রকারের অভিজ্ঞতা। এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে সমবেতভাবে সুন্দরতম অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হবে এবং প্রচলিত বিষয়বস্তুগুলি—যেগুলি হল মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল—তাদের সেই প্রয়াসে সাহায্য করবে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি বহুপ্রকারেরই হতে পারে। কেবল সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই লক্ষণ হবে দুটি: (১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার বিকাশের জন্য উপযোগিতা ও (২) সামাজিকতার বিকাশের জন্য উপযোগিতা। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, গঠনমূলক পদ্ধতি (project method), নাটকনির্ভর পদ্ধতি (method of dramatic expression), আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতি (method of self-activity), সমবেত আলোচনা পদ্ধতি (discussion method), পুস্তকপাঠের পদ্ধতি (method of book-study), পুনঃ পুনঃ চর্চামূলক পদ্ধতি (drill method), এই সমস্তই গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযোগী। তবে এগুলির মধ্যে পূর্বোল্লিখিত লক্ষণ দুটির যথাসম্ভব সুষ্ঠু প্রকাশ হওয়া চাই। গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে 'কি চিন্তা করা যায়?' ও 'কেমন করে চিন্তা করা যায়?' এই দুটি প্রশ্নেরই সমাধানের চেষ্টা করা হবে, কিন্তু বেশী জোর দেওয়া হবে

দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধানের উপর। সুতরাং এখনকার পদ্ধতিগুলি হবে প্রধানতঃ চিন্তার উদ্দীপক।

বিদ্যালয় পরিচালনা ও নিয়মানুবর্তিতা

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে জীবন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হবে। সুতরাং এই জীবনের পরিচালনাকার্যের অনেকটা শিক্ষার্থীদের হাতে থাকবে। তুলনায় বেশী অভিজ্ঞতা থাকার জন্য স্বভাবতঃই নেতৃত্ব থাকবে শিক্ষকদের হাতে। এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ছাত্রনেতারা পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে অপর সকলের আন্তরিক সহযোগিতা চাইবেন ও সহযোগিতার মাধ্যমেই সমস্ত কার্য পরিচালনা করবেন।

এখানে নিয়মানুবর্তিতা প্রধানতঃ সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই গঠিত হবে, ব্যক্তির নির্দেশে গঠিত হবে না। অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা-শিক্ষা গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের বহু বিচিত্র কর্মধারার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হবে। শুধু নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা নয়, নীতিশিক্ষাও প্রধানতঃ সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (social interaction) মাধ্যমে সংঘটিত হবে। সরাসরি নীতি শিক্ষাদানের (direct moral instruction) ভূমিকা থাকবে, কিন্তু সে হবে গৌণ।

সর্বশেষে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষা কেবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই চলতে পারে। অন্য রাষ্ট্রে এই শিক্ষা অচল। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরের গণতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ মুখ্যতঃ প্রয়োগ-বাদের আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে। স্বভাবতঃ অন্য দার্শনিক মতবাদের নির্দেশে নির্ধারিত গণতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ অন্য প্রকার হত। এই উক্তি থেকে বোঝা যাবে যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে রচনা করা সম্ভব। তবে লেখকের দৃঢ় অভিমত এই যে, একমাত্র ভাববাদবিরোধী ও প্রকৃতভাবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক দার্শনিক মতবাদই পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি রূপে কাজ করতে পারে।

———

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষাক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে সবসময়েই দেখা যায় যে, তার একটি বা একের বেশী লক্ষ্য আছে। এবং তা হতে বাধ্য, কেননা শিক্ষা একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া এবং কোন পরিকল্পিত প্রক্রিয়া কখনও লক্ষ্যহীন হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, এই লক্ষ্যের আসল প্রকৃতি কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই লক্ষ্যের (বস্তুতঃ সমস্ত লক্ষ্যেরই) দুটি দিক আছে—একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক ও অন্যটি ভাল-লাগা না-লাগার দিক (value aspect)। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে লক্ষ্য হল কর্মের পূর্বদৃষ্ট পরিণতি (foreseen end of action) এবং ভাল-লাগা ও ভাল না-লাগার দিক থেকে লক্ষ্য হল একটি কাম্য বস্তু। কাম্য বস্তু হিসাবে লক্ষ্য শক্তি জোগায়, কেননা যে বস্তুকে ভাল লাগে তাকে পাবার জন্য স্বতঃই শক্তি উৎসারিত হয়। আবার পূর্বদৃষ্ট পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য উৎসারিত শক্তিকে ঠিকপথে পরিচালিত করে। এই পরিচালনা সাধারণতঃ তিন প্রকার কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—(১) সাহায্যকারী উপায় ও বিঘ্নগুলিকে ভালভাবে লক্ষ্য করা, (২) উপায়গুলিকে যোগ্যভাবে সাজান ও (৩) বিভিন্ন উপায়ের মধ্য থেকে যোগ্য পথ বেছে নেওয়া। এখানে বলা প্রয়োজন যে, লক্ষ্য যখন পূর্বদৃষ্ট পরিণতি তখন তা হল মনস্তত্ত্বের বিষয়বস্তু এবংযখন সে কাম্য বস্তু তখন তা নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটি হল শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু শিক্ষা-প্রক্রিয়ার বাইরের কিম্বা ভিতরের বস্তু এই নিয়ে। ডিউই ও তাঁর শিষ্যরা বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্যবস্তুকে শিক্ষাক্রিয়ার ভিতরেই খুঁজতে হবে, কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষাদার্শনিক মনে করেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল (অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যের মত) শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বাইরের বস্তু। অন্য অনেক বিষয়ের মত এখানেও সত্য আছে মধ্যস্থানে। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যকে শিক্ষাক্রিয়ার মধ্যে ও বাইরে দুয়েতেই খুঁজিতে হবে। অলব্ধ কাম্যবস্তু হিসাবে লক্ষ্য বাইরের বস্তু। কিন্তু শিক্ষা-ক্রিয়ার মধ্য থেকেই তার উদ্ভব হয় বলে লক্ষ্য হল শিক্ষাক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ বস্তু। উপরে আমরা দেখেছি যে, কাম্য বস্তু হিসাবে লক্ষ্য হল দর্শনের একটি শাখার (নীতিশাস্ত্রের) বিষয়বস্তু। এখন যেহেতু দর্শন ব্যক্তি, দল, শ্রেণী ও দেশ ভেদে ভিন্ন হয়, সেইহেতু শিক্ষার লক্ষ্যও

ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার উপর চলমান জীবনের তাড়নায়, নূতন অবস্থার উদ্ভবের জন্য, জীবনদর্শন প্রায়ই পরিবর্তিত হয় এবং তাই লক্ষ্যবস্তুও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, লক্ষ্যের প্রকার হয় বহু এবং তা পরিবর্তনশীল।

শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যনিচয়

সাধারণভাবে শিক্ষার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য (desirable) লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস নিম্নে দেওয়া হল :

(১) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে হতে হবে সুসমঞ্জস ও সুপরিব্যাপ্ত (comprehensive)। ব্যক্তির দিক থেকে তার শক্তিগুলির উপযুক্ত বিকাশের কথা ভাবতে হবে এবং সমাজের দিক থেকে ব্যক্তির বিকাশ এমনভাবে সাধন করবার চেষ্টা করতে হবে যাতে তার গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণ করবার শক্তি ও ইচ্ছা জন্মায়।

(২) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে হতে হবে যথেষ্ট নমনীয় (flexible), কেননা তবেই নূতন অবস্থায় সেগুলির যোগ্য পরিবর্তনসাধন সম্ভব হবে।

(৩) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।

(৪) শিক্ষার লক্ষ্যকে সমাজের সমর্থনলাভ করতে হবে। সমাজ-সমর্থিত না হলে লক্ষ্য বাস্তব জগতে রূপায়িত হতে পারে না।

(৫) বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্যবস্তুকে এমন হতে হবে যে, তাকে যেন বিদ্যালয়ে লাভ করা সম্ভব হয়।

(৬) নির্ণীত লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সাধ্যের মধ্যে হওয়া চাই। যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া শিক্ষার্থীদের সাধ্যাতীত সেই লক্ষ্য অর্থহীন।

(৭) যদি কোন লক্ষ্য বিদ্যালয়ের বাইরের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিদ্যালয়ের চেয়ে ভাল করে সিদ্ধ হয়, তাহলে বিদ্যালয় সেই লক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে না।

(৮) শিক্ষার নির্ণীত লক্ষ্য যেন শিক্ষার্থীর সহযোগিতা লাভ করে। শিক্ষার যে লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারে না ও তাদের সহযোগিতা পায় না, সেই লক্ষ্য অর্থহীন, এমন কি ক্ষতিকর।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করেন কারা ?

পূর্বে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষাবিদেরা বা দার্শনিকেরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হতেন এবং সমাজের প্রচলিত শিক্ষার লক্ষ্য তাঁদের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হত। বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু এই ধারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্রতী হন সরকার বা কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদল। এই লক্ষ্যগুলি যে সব সময়ে পূর্ণভাবে গৃহীত হয় তা নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই লক্ষ্যনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

এখনই বলা হল যে, পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদেরা ব্যক্তিগতভাবে করতেন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য নির্ণয়ের পদ্ধতিও ছিল এখনকার পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। তাঁরা বিশ্ব, সমাজ বা ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য নির্ণয় করতেন না, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণতঃ ছিল সংশ্লেষণমূলক (synthetic)। সমগ্র মানব-সমাজের অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টিপথে রেখে সামগ্রিক-ভাবে তাঁদের যে লক্ষ্যকে ভাল বলে মনে হত, সেই লক্ষ্যকে তাঁরা নির্বাচন করতেন। হার্বার্ট স্পেন্সারই প্রথম এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করে লক্ষ্য নির্ণয়ে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে সেই বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা অনেক শিক্ষাবিদ্ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার বিভিন্ন ধারা ও পরিণতি লক্ষ্যণীয়। প্রধানতঃ নিম্নপ্রকার কয়টি দিকেই সেই প্রচেষ্টা চলেছিল :

(১) একদল চেষ্টা করেছিলেন বিশেষজ্ঞদের মতের ঐক্য (consensus) সন্ধান করতে।

(২) আর একদল চেষ্টা করেছিলেন জীবনে যে সব বিষয় (item) বেশী পরিলক্ষিত হয় তাদের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে দাঁড় করাতে।

(৩) আরও একদিকের প্রচেষ্টা ছিল প্রচলিত জীবনের কর্মাবলীকে বিশ্লেষণ করে তাদের উপাদানগুলিকে (component parts) লক্ষ্য হিসাবে দাঁড়

করানর। এই দিককার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতৃদ্বয় হলেন ফ্রাঙ্কলিন ববিট্ (Franklin Bobbit) ও ওয়েরেট চার্টার্স (Werrett Charters)।

উপরের সব প্রচেষ্টাই ছিল সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। অনেক শিক্ষাবিদ্ আবার মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে নীচেরগুলি হল সবচেয়ে বিখ্যাত :

১। প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইক (Thorndike) বলেছিলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্যের প্রথম কাজ হল মানুষকে সমস্ত উপযুক্ত বস্তু ('right things') চাইতে শেখান এবং তারপর তাদের সেই চাহিদা মেটানর ক্ষমতা সৃষ্টি করা। তাঁর মতে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হলে প্রয়োজন এই সব উপযুক্ত বস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ। এই বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার জন্যই থর্নডাইক হাজার হাজার শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন।

(২) অন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা সহজাত জৈব ও মনস্তাত্ত্বিক তাড়না (drive) ও প্রবৃত্তি সমূহকে (disposition) শিক্ষার লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন, কারণ তাঁরা শিশুদের 'চাহিদার' উপর সবচেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন।

(৩) আর একদল মনস্তাত্ত্বিক মানুষের চাহিদাকে জীব ও পরিবেশ দুয়েরই সঞ্জাত ফল হিসাবে মনে করতেন। তাঁরা জীববিজ্ঞান থেকে শব্দ আহরণ করে শিক্ষার লক্ষ্যকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন বা সঙ্গতি-বিধান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপরের প্রয়াসগুলিও হল বিজ্ঞানভিত্তিক। কিন্তু লক্ষ্য নির্ণয় আসলে বিজ্ঞানের কাজ নয়। বিজ্ঞান নির্ণয় করতে পারে মানুষ কি কামনা করে, কিন্তু মানুষের কি কামনা করা উচিত এ প্রশ্নের সমাধান বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। যে কোন লক্ষ্যই শুধু কামনার বস্তু নয়, কাম্য-বস্তুও। এই কাম্যবস্তুর স্বরূপ নির্ণয়, নির্বাচন ও সংখ্যা নির্ণয় হল দর্শনের একটি বিশেষ বিভাগের (নীতিশাস্ত্রের) কাজ। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দার্শনিকেরা অবশ্যই কাজে লাগান, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকার ভেদ

শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে দুটি শ্রেণীতে সাধারণতঃ ভাগ করা হয়ে থাকে। এই

দুটি শ্রেণীর লক্ষ্যের নাম হল আশু লক্ষ্য (proximate aim) ও চরম লক্ষ্য (ultimate aim)। চরম লক্ষ্যের প্রধান কাজ হল শিক্ষাদানকারীকে উৎসাহিত করা, ব্যাপক দৃষ্টিদান করা এবং সাধারণভাবে দিকনির্দেশ করে পরিচালিত করা। চরম লক্ষ্য (তার নামানুযায়ীই) শিক্ষার হল সেই লক্ষ্য যা শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দূরতম পরিণতিরূপে কল্পিত হয়। স্বভাবতঃ চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে অলব্ধই রয়ে যায়, কেননা এ কথা কখনই ভাবা যায় না যে, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে লাভ করা হয়েছে। চরম লক্ষ্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে নিয়ে না ব্যস্ত হয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষার আশু লক্ষ্যগুলি নিয়েই মাথা ঘামান উচিত। এই মতটি কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কেননা শিক্ষার চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে পূর্ণভাবে লভ্য না হলেও তাদের অনেক কিছু করার রয়েছে। তাদের সাহায্যে ব্যাপক দৃষ্টিতে সব-কিছুকে দেখা যায়, আশু লক্ষ্যগুলিকে ঠিকভাবে এবং সহজে নির্বাচন করা যায় এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানও সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তবে চরম লক্ষ্যকে কার্যকরী হতে হলে তার নিরিখে যোগ্য সংখ্যক ও সুনির্দিষ্ট আশু লক্ষ্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই আশুলক্ষ্যগুলি সহজলভ্য এবং প্রাত্যহিক কাজের পরিচালকরূপে কাজ করে। এই আশুলক্ষ্যগুলিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) জ্ঞান, তথ্য, তত্ত্ব ও নিয়মাদি।

(২) অভ্যাস, নৈপুণ্য এবং কৌশলাদি (techniques)।

(৩) মনোভাব, ভালমন্দবোধ, ঝোঁক (interest) এবং আদর্শাদি।

শিক্ষার চরম লক্ষ্যের কয়েকটি উদাহরণ হলঃ সুনাগরিকতা, আত্মবিকাশ, আত্মোপলব্ধি ইত্যাদি। শিক্ষার আশু লক্ষ্যের উদাহরণ হলঃ লেখা, পড়া, অঙ্ক শেখা, সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার চরম লক্ষ্য সম্বন্ধেও যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি আশু লক্ষ্য নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তবে চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদের গভীরতা যত বেশী, আশু লক্ষ্যের বেলায় তত নয়। আশু লক্ষ্যের বিষয়ে একই দেশে ও কালে অনেকটা ঐক্যসাধন সম্ভব। তবে পূর্ণ ঐক্যসাধন মোটেই সম্ভব নয়, কেননা তাহলে চরম লক্ষ্য

সম্বন্ধেও পূর্ণ ঐক্যসাধনের প্রয়োজন হত। কিন্তু আমরা জানি যে, চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐক্যসাধন দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের জন্য সম্ভবপর নয়।

দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষার লক্ষ্য

আমরা দেখেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধেও দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে একই প্রকারের বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। নিম্নে এই বৈচিত্র্যের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হল :

ভাববাদ—ভাববাদের সাধারণ ধারার মধ্যেও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে। তথাপি ভাববাদী মতবাদগুলির সম্মতির ক্ষেত্রের (area of agreement) উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে বলা যায় যে বুদ্ধি, আত্মা, ব্যক্তিত্ব ও মানুষের পরম কাম্যবস্তুগুলির (ultimate values) বিকাশ সাধনই হল ভাববাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য।

জড়বাদ—জড়বাদের মতে ইহজগতে সুখী জীবনযাপনই হল শিক্ষার কাম্যবস্তু। জড়বাদীদের মধ্যে কার সুখীজীবন কাম্য এই নিয়ে বিশেষ দ্বন্দ্ব আছে। কারুর মতে এই সুখী জীবন হল ব্যক্তির। কারুর মতে সুখী জীবন হল সমাজের এবং অন্যদের মতে সুখী জীবন হল ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই।

প্রয়োগবাদ—শিক্ষায় প্রয়োগবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি জন ডিউইর মতে (খুব সংক্ষেপে) শিক্ষার লক্ষ্য হল বৃদ্ধি—অবিরত এবং সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি। অভিজ্ঞতার অবিরত প্রসার ও সমৃদ্ধিসাধনই হল তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য।

বস্তুবাদী—বস্তুবাদও নানা শ্রেণীর আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বস্তুবাদ বাইরের বস্তুজগতের ও সমাজ জগতের সঙ্গে সার্থক অভি-যোজনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করে।

প্রকৃতিবাদ—জৈব প্রকৃতিবাদী ম্যাকডুগ্যালপন্থীদের মতে সহজাত জৈব প্রবৃত্তিগুলির সুপরিচালনা, পরিমার্জন ও উদ্গতিসাধনই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

জৈব প্রকৃতিবাদী ডারুইনপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি বা জাতিকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা।

জৈব প্রকৃতিবাদী লামার্কপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক

পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে মানবজাতিকে অভিব্যক্তির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা।

রুশোর শিষ্যস্থানীয় কল্পনাময় প্রকৃতিবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল, যে শিশুপ্রকৃতি আদিম অবস্থায় সর্বমালিন্যবর্জিত এবং যার বিকাশ অপরিবর্তনীয় নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হয় তাকে ভাল করে জেনে, তার অলঙ্ঘ্য নিয়মগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলা।

যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য

(ক) আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য—আদিম সমাজে মানুষ নিশ্চয়ই শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তা করত না। জীবনের অপরিকল্পিত ও অপরিস্ফুট লক্ষ্যই ছিল সেই সমাজে শিক্ষারও অপরিকল্পিত ও অপরিস্ফুট লক্ষ্য। তবে জীবন তখন প্রায় স্থাণু ছিল বলে (উৎপাদন শক্তির স্বল্প বিকাশের জন্য) শিক্ষার এক সাধারণ লক্ষ্য ছিল—অতীতের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ। ব্যক্তির জন্য এই শিক্ষায় পৃথক কোন লক্ষ্য ছিল না। এবং তা সহজবোধ্য, কেননা পরিবেশপিষ্ট সেই সমাজে যূথের বিকাশই কিছুটা সম্ভব ছিল, ব্যক্তির বিকাশের কোন সম্ভাবনাই সেই সমাজে ছিল না।

(খ) প্রাচীন চীন ও অতীতের ভারতবর্ষের শিক্ষার আদর্শ—অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চীন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল 'পণ্ডিত ব্যক্তি' (scholar) তৈয়ার করা। এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরূপে কল্পনা করা হত, কিন্তু তার প্রস্তুতির ব্যবস্থা অনেক কাল ধরে এমনভাবে করা হত যাতে তাদের ঐ কাজের জন্য কোন উপযোগী দক্ষতাই সৃষ্টি হত না। এই শিক্ষার মূল কথা ছিল প্রাচীন সাহিত্যের রচনা রীতিকে অনুকরণ করা। চীনাদের কাছে অনুকরণের ক্ষমতাই ছিল শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি। অবশ্য প্রাচীন সাহিত্যের ভাবরাজিকে কিয়দংশে আয়ত্ত করাও শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গুরুত্ব অর্পণ করা হত তার রচনারীতির উপর।

অতীতের ভারতবর্ষে হিন্দুদের শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল 'মোক্ষলাভ' অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনের সেই অবস্থা যে অবস্থায় সে তার পৃথক ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে অখণ্ড ও সীমাহীন বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়। বহুপ্রকারের বিদ্যা

আয়ত্ত করাও উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু চরম লক্ষ্য ছিল ঐ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মীভূত হওয়া। অন্যান্য সর্বপ্রকার জ্ঞানকে বলা হত 'অপরা' বিদ্যা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই বলা হত 'পরা' বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। শিক্ষার এই আদর্শ ভারতের সমগ্র অতীতযুগ ধরেই অব্যাহত ছিল। সুতরাং দেখা গেল যে, অতীতের চীন ও ভারতবর্ষ দুটি প্রধান সভ্য দেশেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল স্থাণু। প্রায় স্থাণু কৃষিপ্রধান জীবনের অপরিবর্তনীয় আদর্শকে অনুসরণ করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং আদিম সমাজের জীবন ও শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে এই দুই সভ্যতার জীবন ও শিক্ষার আদর্শের স্থাণুত্বের দিক থেকে খুব বেশী মিল ছিল।

(গ) প্রাচীন গ্রীস দেশের শিক্ষা

(১) স্পার্টার শিক্ষা—স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল অপরিবর্তনীয় ও সংরক্ষণশীল, প্রচলিত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে সঞ্চালিত করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্পার্টার লোকদের পক্ষে চতুস্পার্শের পরাধীন জাতিদের অধীনে ও আয়ত্তে রাখার জন্য যোদ্ধার জীবনের নৈপুণ্য অর্জনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহস, সহনশীলতা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সৈনিকসুলভ গুণাবলী সৃষ্টি করা। মানব-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মূলন ছিল এই শিক্ষার কর্মগুলির অন্যতম। এই শিক্ষায় স্পষ্টতঃ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। সমাজের সংরক্ষণই ছিল একমাত্র কাম্য। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই ছিল এই সমাজের জীবন ও শিক্ষার স্থাণুত্বের মূলে।

২। এথেন্সের শিক্ষা

এথেন্সের শিক্ষায় শুধু সমাজের সংরক্ষণ চাওয়া হত না, ব্যক্তির বিকাশও চাওয়া হত। স্পষ্টতঃ পারসীকদের সঙ্গে যুদ্ধের পর এথেন্সের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাবোধের জন্য এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। ব্যক্তির বিকাশের উপর এই গুরুত্ব অর্পণ জগতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভবের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব নিবিড়ভাবে জড়িত। এথেন্সে সীমিতভাবে হলেও কিছুটা ধনতান্ত্রিক (বাণিজ্যিক) বিকাশ হয়েছিল এবং সেই ধনতান্ত্রিক

বিকাশের উপর ভিত্তি করেই সেখানের সীমিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদ (চিন্তার ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের প্রতিফলন) উদ্ভূত হয়েছিল।

এথেন্সের শিক্ষার আদর্শের একটি লক্ষণ হল তার কান্তিবিদ্যাসম্মত সুষমতা (aesthetic harmony)। এথেন্সবাসীরা ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল কিন্তু তারা সব সময়ে দেখত যেন কোন বিষয়ে অতিবৃদ্ধি না ঘটে। মানব-ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ছিল তাদের আদর্শ। তবে তারা ব্যক্তিকে সব সময়ে রাষ্ট্রের পটভূমিতেই দেখত। তাই, তাদের আদর্শ পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিকে আবার সুনাগরিকও হতে হত। তাদের কাছে সুনাগরিকের গুণাবলী ছিল সাহস, মিতাচার, উদারতা ও বিচারবোধ। এথেনীয় গ্রীকেরা কোন কিছুর আধিক্য পছন্দ করত না, তাই তারা আত্মসংযমের চেষ্টা সর্বসময়ে করত। সুতরাং এই শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে প্রগতিবাদী ছিল। তবে আমরা দেখেছি যে, এই শিক্ষার পরিধির বাইরে থাকত এথেন্সের অগণিত দাস-শ্রেণীভুক্ত লোকেরা, যাদের শ্রমের উপর নির্ভর করেই এই অভিজাত-গণতান্ত্রিক জীবন চলত। ফলে এই শিক্ষার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দুদিক থেকে ত্রুটি অনুপ্রবেশ করেছিল। এক দিকে এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্য। অন্যদিকে এর মধ্যে শ্রমের মর্যাদার স্থান ও বৃত্তিশিক্ষার স্থান ছিল না। সুতরাং এই শিক্ষার লক্ষ্য অনেকাংশে প্রগতি-বিরোধীও ছিল। তবে আপেক্ষিকভাবে দেখলে প্রাচীনকালের এথেন্সের শিক্ষার মহত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হয়।

(ঘ) রোমের শিক্ষার লক্ষ্য—রোমকরা গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাদের শিক্ষার আদর্শ প্রধানতঃ দেশজই ছিল। গ্রীকদের চেয়ে তাদের ব্যবহারিক জগতের দিকে টান ছিল অনেক বেশী, তাই তাদের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি। বহুদিন পর্যন্ত তাদের শিক্ষাদর্শনে নিছক সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতি চর্চার স্থান ছিল না। 'স্বাধীনতার শিক্ষা' (libèral education) এদের হাতে ব্যবহারিক জীবনাভিমুখী হয়েছিল এবং সঙ্কীর্ণ ধরণের বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষাদানই ছিল এর মূল কথা। সৌন্দর্যগত শিক্ষাকে এই শিক্ষায় প্রায় বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং দৈহিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গ্রীকদের মত দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছিল না, সৈনিক

জীবনের জন্য প্রস্তুতিই ছিল তার লক্ষ্য। স্পষ্টতঃ দাসপ্রথাসম্বলিত সাম্রাজ্য-নির্ভর দেশের শিক্ষার এই ছিল যোগ্য লক্ষ্য।

(ঙ) মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য—গ্রীক্ ও রোমকদের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ ইহজগতাভিমুখী। যদিও তারা নৈতিক জীবনের উপর গুরুত্ব অর্পণ করত, তবুও তাদের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিল সমাজভিত্তিক, ধর্মনির্ভর নয়। কিন্তু খৃষ্টধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের শিক্ষার লক্ষ্য ইহজগতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি থেকে পরলোকের অবিনশ্বর জীবনের জন্য প্রস্তুতি হয়ে দাঁড়াল। খৃষ্টানরা ইহজগতের জন্য শিক্ষাকে সাধারণতঃ অবহেলা করত। তবে এদিকে যেটুকু নজর দিত, সেটুকুও যীশুনির্দেশিত নৈতিকাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হত।

খৃষ্টধর্মের এই পারলৌকিক আদর্শ চরম রূপলাভ করেছিল মধ্যযুগের মঠে প্রদত্ত শিক্ষায়। শিক্ষার লক্ষ্য সন্ন্যাসের ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য দেহকে যত প্রকারে সম্ভব নির্যাতন করা হত।

মধ্যযুগের শেষের দিকে সমাজ ও ব্যক্তি দুয়েরই উন্নতি সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই শিক্ষার লক্ষ্যেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল। মন ও দেহ দুয়েরই সংযমমূলক চর্চা (discipline) হয়ে দাঁড়াল শিক্ষার লক্ষ্য।

মধ্যযুগের অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্য অবশ্য কিছুটা ভিন্ন প্রকারের ছিল। 'নাইট' (knight) ছিল এই শিক্ষার আদর্শস্থল। 'নাইটের' শিক্ষার লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সাহসী ও দক্ষ সৈনিকের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় নৈতিক আদর্শের দ্বারা তার আচরণকে পরিমার্জিত করা।

স্পষ্টতঃ মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য মূলতঃ কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ উপযোগী ছিল।

(চ) নবজাগরণের ও ধর্মসংস্কারের যুগের শিক্ষার আদর্শ—নবজাগরণের মানুষ পরকালের চিন্তা ত্যাগ করে ইহজগতের নবোদ্ঘাটিত আনন্দের আস্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'হিউম্যানিজম্' বা 'মানবতাবাদ' নামক নূতন শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। এই নূতন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আদর্শ রাজসভাসদ (courtier) তৈরী করা। রাজসভাসদদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহুমুখী ও সুষম বিকাশ সাধন।

আল্পস্ পর্বতের দক্ষিণে নবজাগরণ যদিও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির চর্চার মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তথাপি উত্তরে তার সুর ছিল প্রধানতঃ নৈতিক। নবজাগরণসৃষ্ট স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ উত্তরে, বিশেষ করে জার্মান দেশে, যাজক-সম্প্রদায়ের দোষত্রুটি উদ্ঘাটনের কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল। নবজাগরণের এই দিককার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল 'জ্ঞান-সমৃদ্ধ ধর্মভাব' (wise piety) অর্জন। এই লক্ষ্যের মধ্যে গ্রীক ও খৃষ্টীয় দুই প্রকারের আদর্শেরই প্রভাব দেখা যায়।

নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন দুই-ই নবনির্মীয়মাণ বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক সন্তান। নবজাত বুর্জোয়ারা তখন পৃথিবী ও বিশ্বের দিকে নূতন চোখে চেয়েছিল ও নূতন স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। সেই স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন জীবন ও শিক্ষার আদর্শও নির্ধারিত হয়েছিল।

(ছ) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য —শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বলা হয়েছে যে, এই দুই শতাব্দীর শিক্ষার বাস্তব রূপ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের যুগের ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার লক্ষ্য ধর্মসংস্কারের যুগের অনুরূপ ছিল। (এই বিদ্যালয়গুলি ধর্মসংস্কারে যুগেই প্রধানতঃ সৃষ্ট হয়েছিল)। এদের উদ্দেশ্য ছিল অতি সামান্য কিছু পড়া, লেখা ও গণিত শেখান এবং ধর্মভাব জাগরূক করা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে (একমাত্র জার্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়া) নবজাগরণের 'খৃষ্টীয় মানবতাবাদের' (Christian Humanism) বিকৃত রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল। নবজাগরণের এই বিকৃত রূপানুযায়ী ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা এবং সাহিত্য আয়ত্ত করাই শিক্ষার সর্বোত্তম লক্ষ্য বলে পরিগণিত হত। তবে বলা প্রয়োজন যে, সাহিত্য অপেক্ষা ভাষা শিক্ষার উপরই জোর ছিল বেশী এবং দুটি ভাষার মধ্যে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হত। জীবন-বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষার লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও, আমরা দেখেছি, কম হয় নি। কিন্তু এই প্রতিবাদের ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের আসল কোন পরিবর্তন কোন স্তরেই হয় নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে অবিকৃতই রয়ে গিয়েছিল। মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য নূতন এক প্রকারের

বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলির নাম ছিল 'অ্যাকাডেমী', 'বাস্তববাদী বিদ্যাগার' ইত্যাদি এবং যেগুলির আদর্শ ছিল শিক্ষার্থীকে সমগ্র বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। কিন্তু এই স্তরের শিক্ষায় বেশীর ভাগ প্রচলিত বিদ্যালয়ে ('ব্যাকরণ বিদ্যালয়সমূহে') সেই পুরাতন ধারাই অব্যাহত ছিল। তবে পুরাতন ধারার সমর্থনে নূতন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। আসল লক্ষ্য ছিল, আমরা দেখেছি, প্রধানতঃ প্রাচীন ভাষা শিক্ষা, কিন্তু তার সমর্থনে 'মানসিক বৃত্তি-চর্চা তত্ত্বের' (Theory of Formal Discipline) অবতারণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, শিক্ষার লক্ষ্য নিছক ভাষা শিক্ষা ছিল না, ছিল মানসিক চর্চা (mental discipline) সাধন করা। অবশ্য মানসিক চর্চার সঙ্গে দেহের চর্চা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের কথাও বলা হত, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল ভাষা শিক্ষা অর্থাৎ নূতন একদল 'মান্দারিণ' সৃষ্টি করা। মহা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থাও প্রায় এক প্রকারেরই ছিল। তবে জার্মাণীতে হল বিশ্ববিদ্যালয় (University of Halle) ও গটিন্‌গেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (Gottingen University) স্থাপনের মাধ্যমেই প্রধানত শিক্ষার নূতন আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ পেয়েছিল। এই নূতন আদর্শ ছিল প্রধানতঃ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননির্ভর। স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য আরোপ করা স্থরু হল এবং ধর্মতত্ত্বকে (theology) এখন থেকে মঞ্চের পিছন দিকে স্থান দেওয়া হতে লাগল। নূতন প্রাণবন্ত প্রাচীন শিক্ষার প্রবর্তন শুরু হল এবং জার্মাণ ভাষা ল্যাটিন ভাষাকে অপসারিত করে শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হল। এই সব পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য স্পষ্টতঃ ছিল নূতন সামাজিক (বুর্জোয়াতন্ত্র) ও চিন্তাজগতের (বুর্জোয়াস্থলভ চিন্তা) আবহাওয়ার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন ঘটান। বিপ্লবাভিমুখী ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নূতন এক প্রকারের বিপ্লবী মনীষী শিক্ষার নূতন লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। এই লক্ষ্য শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত হয় নি। এর পরিধির মধ্যে সমাজের অগণিত জনসাধারণকেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, শিক্ষার এই সর্বজনীন লক্ষ্য শিক্ষাজগতে এক যুগান্তরের সূচনা করেছিল। বিপ্লবাভিমুখী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সে দিন (সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে) জনসাধারণের দিকে স্বভাবতঃই দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কেননা তাদের অগণ্য দৃঢ় বাহুর শক্তির প্রয়োজন ছিল পুরাতন সমাজের

(সামন্ততন্ত্রের) সৌধধ্বংস ও ভিত্তি উন্মূলনের জন্য। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তব শিক্ষার লক্ষ্য এই মহান্ নায়কদের বর্ণিত লক্ষ্য দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় নি। কেননা তখনও বুর্জোয়াতন্ত্র কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, বিশেষ করে ফরাসী দেশে ত' নয়ই, যেখানে এই নূতন আদর্শের উদ্ভব হয়েছিল। তবে বুর্জোয়ারা সিংহাসনে আসীন হয়ে জনসাধারণের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং এক নব্য দাসতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল, যেখানে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সুমহান লক্ষ্য নির্ণয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সিংহাসনারূঢ় বুর্জোয়াদের জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যের কথা আমরা এখনই আলোচনা করব।

(জ) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য —উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার ইতিহাস হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। অবশ্য শিক্ষাজগতের এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হল সাধারণ সামাজিক জীবনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনের মূলকথা হল ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের (capitalistic industrialism) বিবর্তন ও তার প্রতিবাদে প্রকৃত (জনগণের) গণতান্ত্রিক শিল্পবাদের জন্য সংগ্রাম ও তার স্থানে স্থানে উদ্ভব। ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের সাধারণ সংরক্ষক মতবাদগুলি হল জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতামূলক গণতন্ত্র (individualistic democracy), রক্ষণশীল মতবাদ (conservatism) এবং তার উগ্র সমর্থক হল ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ। ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের বিকাশের ফলে দেশের ও বিদেশের সমাজের সাধারণ লোকদের প্রচুর দুঃখ-কষ্ট হয়েছিল এবং তাদের বহু প্রকারের অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল। ফলে দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয় ও তার সংহতি নষ্ট হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ যুদ্ধের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়। এই সব কারণে এই ব্যবস্থার বিরোধী মনোভাব নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সমাজমুখী গণতান্ত্রিক মতবাদ (socially oriented liberalism) ও মানবমঙ্গলকামী মতবাদ (humanitarianism) প্রচলিত বুর্জোয়াতন্ত্রকে কিছু পরিবর্তিত করে, তার অবিচারকে কিছুটা প্রশমিত করে, বজায় রাখতে চেয়েছে এবং সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ (communism) পুরাতন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তির

উপর সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গড়তে চেয়েছে। সাধারণ অ-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের রূপ অবশ্য আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। এর সমর্থকেরা এখন আর বুর্জোয়াতন্ত্রকে বাতিল করতে চায় না। সাম্যবাদীদের ভীতিই অবশ্য এই পরিবর্তন স্পষ্টতঃ আনয়ন করেছে। সুতরাং অ-মার্ক্সীয় সমাজ-তন্ত্রও এখন মোটামুটিভাবে বুর্জোয়াতন্ত্রের সংরক্ষক মতবাদ বলেই গ্রহণীয়। সাম্যবাদীরা বর্তমানে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের উপর তাদের প্রভুত্ব স্থাপিত করেছে এবং প্রতি দেশেই (কম-বেশী) ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তিরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বর্তমানে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন না এনে (অর্থাৎ ধনিকদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা না করে) সমাজ ও রাষ্ট্রকে কিছুটা জনমঙ্গলাত্মক (welfare state) করবার চেষ্টা চলেছে। ফলে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের প্রাথমিক রূপ আর কোন অগ্রসর দেশেই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত নেই। এই পরিবর্তনের মূল কথা হল ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে কিছুটা খর্বিত করে সমাজের সংহতির জন্য কিছুটা জনমঙ্গল সাধিত করা। কিন্তু ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তিরা এইটুকু পরিবর্তনে সন্তুষ্ট নয়। তারা গণতন্ত্রের সর্বদিকে অব্যাহত বিকাশ চায়। অর্থাৎ তারা গণতন্ত্রকে একটি সমগ্র জীবন-বিধি রূপে গ্রহণ করতে চায়। এবং তারই জন্য চায় ধনতন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদ, কেননা তাদের সুগভীর বিশ্বাস ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষার জগতে স্বভাবতঃই এই সবের প্রতিফলন হয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ ও শিক্ষার তেমন কিছু রূপান্তর ঘটে নি। নাটকীয় পরিবর্তন সুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। এই সময় থেকে পরিবর্তনের ধারা প্রায় উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাজগতে বিভিন্ন সামাজিক মতবাদের অনুরূপ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাদের সংযোগ ও সংঘর্ষে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল মতবাদগুলির ক্রম-পরাজয় ঘটছে। সামাজিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ধারার রূপাঙ্কন উপরে করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রগতিশীল শক্তিরা চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রয়োগ অর্থাৎ তারা গণতন্ত্রকে একটা সামগ্রিক জীবনবিধি রূপে গৃহীত দেখতে চায়। এই অবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটি দুভাবে

নির্ধারিত হচ্ছে। একদিক থেকে বলা হচ্ছে যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা সকলকে দেওয়া হউক এবং সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শিক্ষার সর্বস্তরের লক্ষ্যরূপে গৃহীত হউক। তবে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির জন্য যোগ্য মনোভাব তৈরী করা এবং সমস্ত শিশুর জন্য সমান সুযোগের দাবী এই লক্ষ্যের অন্তর্গত নয়। এই শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রেণী-সম্প্রীতি ও সহযোগিতার কথা বলা হয়। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেক শিশু যাতে পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে উচ্চতম শিক্ষার জন্য যোগ্য সুযোগ পায় তার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়ের জন্য ব্যক্তিকে সর্বদিক থেকে প্রস্তুত করা। এই লক্ষ্যের অন্তর্গত একটি মূলকথা হল প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করার জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বদিক থেকে যোগ্যভাবে প্রস্তুত করা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধনতন্ত্রের সমর্থক মতবাদগুলির দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার আদর্শে উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও, ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশই ছিল প্রধানতঃ শিক্ষার লক্ষ্য। এখন কিন্তু ঐ লক্ষ্য দুদিক থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। একদিক থেকে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে ঠিক করা হয়েছে এবং অন্যদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক পটভূমিকার কথা ভাবা হয়েছে এবং তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে সমাজের পটভূমিতে সংঘটিত করবার কথা বলা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক আদর্শের গভীর সংঘাতে ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের স্থানে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের আদর্শ গৃহীত হয়েছে এবং ধনতন্ত্রের সমাজ বিরোধী ব্যক্তিনির্ভর প্রসারের ফলেই ব্যক্তির বিকাশের সামাজিক দিকের উপর লক্ষ্য পড়েছে।

মহান শিক্ষানায়কগণ নির্দেশিত শিক্ষার লক্ষ্য

১। **প্লেটো (Plato)**—প্লেটো নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—শ্রমিক যোদ্ধা ও দার্শনিক-অভিভাবক। এদের প্রত্যেকের শিক্ষার আদর্শ হল ভিন্ন কেননা এদের মানসিক প্রকৃতি হল পৃথক। দার্শনিক অভিভাবকরা হলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাই তাঁদের আদর্শই হল উচ্চতম। এই আদর্শের মধ্যে বহুমুখীবিকাশের স্থান রয়েছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর উপরে স্থান

রয়েছে আধিবিদ্যক সত্য ও শিবকে জানার (Dialectic এর সাহায্যে) এবং তাদের অনুধ্যানের।

২। **অ্যারিষ্টটল** (Aristotle)—অ্যারিষ্টটলের কাছে নাগরিক হল প্রধানতঃ স্বাধীন ব্যক্তি এবং এই স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যোগ্য শিক্ষা হল 'স্বাধীনতার শিক্ষা' (liberal education)। এই শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হল বুদ্ধির চর্চা করা, কেননা বুদ্ধিই হল প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এই শিক্ষার ফলে মানুষ যে শুধু শ্রেষ্ঠ নাগরিক হতে পারে তা নয়, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যে সুখ (happiness) তাও লাভ করতে পারে।

৩। ইসোক্রেটস্ (Isocrates)

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল ভিন্ন প্রাচীন গ্রীসের আর একজন বিখ্যাত শিক্ষা-তাত্ত্বিক ছিলেন ইসোক্রেটস্। তিনি ছিলেন আলঙ্কারিক (rhetorician)। তিনিও প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত আদর্শ নাগরিক তৈরী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আলঙ্কারিকের নাগরিকের আদর্শ ও দার্শনিকের আদর্শ এই দুয়ের মধ্যে স্বভাবতঃই যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। আলঙ্কারিকের আদর্শ নাগরিক ও ব্যক্তি হল শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি ভদ্রলোক, দার্শনিকের আদর্শ নাগরিকের মত আধিবিদ্যক সত্য ও শিবের চিন্তায় মগ্ন দার্শনিক নয়।

৪। সিসেরো (Cicero)

বিখ্যাত রোমক রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা সিসেরোর নিকট শিক্ষার আদর্শ হল যোগ্য বক্তা (orator) তৈরী করা। এই বক্তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হল সমস্ত 'স্বাধীনতামূলক শিল্পগুলিকে' (liberal arts) পরিবেশন করা।

৫। কুইনটিলিয়ান (Quintilian)

কুইনটিলিয়নের শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল বক্তা তৈরী করা। তাঁর মতে বক্তা হতে হলে প্রথমে হওয়া প্রয়োজন সৎ লোক এবং এই সৎ লোক হতে গেলে প্রয়োজন বক্তৃতায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সর্বদিকে শ্রেষ্ঠত্ব।

৬। সেণ্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas)

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী সেণ্ট টমাস একুইনাস জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যকে

নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর চর্চার মাধ্যমে সুখলাভ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এই চরম সুখলাভ কোন পার্থিব বস্তুকে অবলম্বন করে সম্ভব নয়, একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্যবস্তু করেই এই চরম সুখলাভ সম্ভব। তাই ঈশ্বরই হলেন জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

৭। ইর‍্যাসমাস্ (Erasmus)

নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ইর‍্যাসমাসের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রথমতঃ ধর্মভাবের উন্মেষ, দ্বিতীয়তঃ, 'স্বাধীন শিক্ষা'র (liberal education) যোগ্য বিষয়সমূহের (liberal studies) প্রতি অনুরক্তি এবং তাদের ভাল করে আয়ত্ত করা, তৃতীয়তঃ, জীবনের কর্তব্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান এবং চতুর্থতঃ অতিশৈশব থেকে সদাচারের চর্চা।

৮। জন মিল্টন (John Milton)

পিউরিটান মতাবলম্বী মহাকবি মিল্টনের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ঈশ্বরকে সঠিকভাবে জানা। তবে আশু লক্ষ্য হিসাবে তিনি জীবনের সমস্ত কাজের ও অবস্থার জন্য উত্তম প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন।

৮। মণ্টেইন (Montaigne)

বিখ্যাত ফরাসী মনীষী মণ্টেইনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল—নৈতিক চরিত্র গঠন। তাঁর মতে নৈতিক চরিত্র গঠিত হলে মানুষ সমস্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগও করতে পারে।

৯। বেকন (Lord Bacon)

লর্ড বেকনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত করা। অবশ্য জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞানলাভের লক্ষ্য হল প্রকৃতির উপর মানবের প্রভুত্ব কায়েম করা। সুতরাং তাঁর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল প্রকৃতিকে বশীভূত করা, এমন কথা বলা যায়।

১১। কমিনিয়াস (Comenius)

কমিনিয়াসের মতে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরন্তন সুখভোগ করা। সুতরাং শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করা। কমিনিয়াসের মতে শিক্ষার ধর্মীয় চরম লক্ষ্য সাধনের

জন্য প্রয়োজন নিজের সত্তার উপর নৈতিক কর্তৃত্ব এবং এই নৈতিক কর্তৃত্বের জন্য প্রয়োজন নিজসত্তা এবং সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান। সুতরাং তাঁর মতে পরপর শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হল জ্ঞান, নৈতিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় চেতনা।

১২। জন লক্ (John Locke)

জন লকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল আদর্শ মানুষ তৈরী করা এবং এই আদর্শ মানবের চারটি গুণ হল নৈতিক উৎকর্ষ (virtue), বিজ্ঞতা (wisdom) সামাজিক সদাচার (breeding) এবং বিদ্যা (learning)। লকের মতে এই গুণ চারটির মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষই হল সর্বপ্রধান। এই নৈতিক উৎকর্ষের ভিত্তি হল অবশ্য ধর্ম। লকের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণার উপর নির্ভর করেই নৈতিক চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন।

১৩। কনডরসেট (Condorcet)

কনডরসেটের মতে অন্যান্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষার লক্ষ্য হল নবজাতকের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর চর্চার মাধ্যমে মানবজাতির সাধারণ ক্রমোন্নতি সাধন করা।

১৪। রুশো (Rousseau)

রুশোও শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি সমাজ পরিচালিত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষ করে ক্ষয়িষ্ণু প্রগতিবিরোধী সমসাময়িক সমাজের হাতে তিনি নবজাতকদের শিক্ষার ভার অর্পণ করতে কোন প্রকারেই রাজী ছিলেন না।

১৫। পেস্তালৎসী (Pestalozzi)

পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নতিসাধন। তাঁর মতে এই উন্নতি-সাধনের পথ হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ও সুষম বিকাশ সাধনকারী শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষার অপেক্ষাকৃত আশু লক্ষ্য হল ব্যক্তির শক্তিসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও সুষম বিকাশ সাধন।

১৬। ফ্রোয়েবেল (Froebel)

ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল এমন একটি সুষম পূর্ণপ্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্ব

সৃষ্টি করা যার সমস্ত শক্তি সমাজের সেবায় নিযুক্ত হবে এবং যে এই সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত বিশ্বসত্তাকে প্রকাশ করে তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করবে। সুতরাং সর্বব্যাপী বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তার মিলন-সাধনই হল ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

১৭। হার্বার্ট (Herbart)

হার্বার্টের মতে নৈতিক চরিত্র গঠনই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। তাঁর মতে সৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা (inner freedom), কর্মদক্ষতা (efficiency) বা পূর্ণাঙ্গ বিকাশ (perfection), উদারতা (benevolence) বা সৎপ্রকল্প (good will), বিচারবোধ (justice) এবং ন্যায়বোধ (equity)। সুতরাং হার্বার্টের মতে নৈতিক আদর্শ বলতে কতকগুলি গুণের এক সুবিন্যস্ত ও সামগ্রিক তন্ত্রকে বোঝায়।

১৮। মন্তেসরী (Montessori)

মন্তেসরীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠত্বে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিকাশের পরিকল্পনার মধ্যে সামাজিক দিকের বিকাশেরও স্থান ছিল।

১৯। জন ডিউই (John Dewey)

শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও অপ্রতিহত বৃদ্ধি সংসাধন করা। এই সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন বলতে বোঝায় মানব ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিক, সৌন্দর্যানুভূতির দিক, বৌদ্ধিক দিক, কর্মদক্ষতার দিক ও নৈতিক দিকের পূর্ণ বিকাশ সাধন।

২০। হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer)

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ জীবনযাপনের (complete living) জন্য প্রস্তুতি। এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য তিনি নিম্নলিখিত আশু লক্ষ্য কয়টি নির্ধারণ কয়েছিলেন ঃ

(ক) আত্মরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

(খ) জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষাদান।

(গ) মানবজাতির উদ্‌বর্তনের জন্য সন্তান উৎপাদন ও সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

(ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

(ঙ) শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি মানবের মানসিক সংস্কৃতির উপাদান সমূহের যোগ্য ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

২১। আমেরিকার জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৯১৮ সালের কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত কমিশন দ্বারা নির্দেশিত লক্ষ্যগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রযুক্ত হচ্ছে। এই লক্ষ্যগুলি হল :

(ক) স্বাস্থ্য।

(খ) মৌলিক বিষয়গুলিকে ('fundamental processes') আয়ত্ত করা।

(গ) পেশা।

(ঘ) যোগ্য গৃহীর শিক্ষা।

(ঙ) নাগরিকতা।

(চ) কর্মবিরতিকালের সদ্ব্যবহার।

(ছ) নৈতিক চরিত্র।

২২। পার্সি নান্ (Percy Nunn)

জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিতার (individuality) পূর্ণ বিকাশ সাধন করা। তাঁর মতে ব্যক্তির সৃজনক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমেই সমাজে সমস্ত নূতন বস্তুর আবির্ভাব হয়। সুতরাং সমাজের প্রগতি ব্যক্তিতার বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২৩। হোয়াইট্ হেড (Whitehead)

হোয়াইট্ হেডের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এমন সব ব্যক্তি সৃষ্টি করা, যারা একই সঙ্গে সংস্কৃতিবান এবং কোন বিশেষ দিকে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানসম্পন্ন

হবে। সংস্কৃতি বলতে তিনি চিন্তার সক্রিয়তা, সৌন্দর্য ও মানবতাসুলভ অনুভূতির প্রতি অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন।

২৪। রবার্ট রাস্ক (Robert Rusk)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সত্তার (reality) সর্বপ্রকার প্রকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্য বিধান (reconcile) করা।

২৫। ফ্রেড্ ক্লার্ক (Fred Clarke)

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল যন্ত্রনির্ভর সমাজের (organised industrial society) মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ। ক্লার্কের মতে আধুনিক যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব।

২৬। এ, আই, কাইরভ (মস্কোর শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি, ১৯৪৬)

কাইরভের মতে সাম্যবাদী শিক্ষার কাজ হল (১) নবজাতকদের যত্ন করা ও তাদের বিকাশের সাহায্য করা, (২) ভবিষ্যতের বাস্তবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য ও অভ্যাস দ্বারা তাদের সজ্জিত করা এবং (৩) তাদের সেই সব প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, ঝোঁক, কর্মের অভ্যাস, সংকল্পের (will) ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের চর্চা করা যেগুলি সাম্যবাদী নৈতিকাদর্শের মূলভাব (spirit) ও তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda)

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষের অন্তর্নিহিত পরমোৎকর্ষের (perfection) বহিঃপ্রকাশ সাধন।

২৮। মোহনদাস গান্ধী (Mohandas Gandhi)

মানুষের দেহ, মন ও আত্মার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে আনা (draw out) হল শিক্ষার লক্ষ্য।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল মুক্তি (freedom)। এই মুক্তি হল তিন প্রকারের : (১) মনের মুক্তি, (২) হৃদয়ের মুক্তি (freedom of the

heart) ও (৩) সংকল্পের মুক্তি (freedom of will)। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে সার্থক যোগস্থাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তি প্রকাশলাভ করে।

৩০। **অরবিন্দ ঘোষ (Aurobindo Ghose)**

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরমোৎকর্ষের বীজ নিহিত আছে। শিক্ষার লক্ষ্য হল সেই চরমোৎকর্ষকে বাহিরে আনা (draw out)।

শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

এতাবৎ শিক্ষার যত লক্ষ্য নির্ণীত হয়েছে সকলকেই তুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণীকে বলা যায় ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং অন্যটিকে বলা যায় সমাজতান্ত্রিক। ব্যক্তিতান্ত্রিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীর লক্ষ্যগুলি সমাজ ও রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই তুই শ্রেণীর লক্ষ্যের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই একটা দ্বৈতভাব আছে। এই তুই শ্রেণীর লক্ষ্য মনুষ্য প্রকৃতির তুটি বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভর করেই নির্ণীত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ প্রকারের দর্শন থেকে এই তুই শ্রেণীর লক্ষ্যের উদ্ভব হয়নি। অনেক সময় একই দার্শনিক মতবাদ থেকে (যেমন ভাববাদ) তুই প্রকার লক্ষ্যেরই উদ্ভব হয়েছে। এখন আমরা এই তুই শ্রেণীর লক্ষ্যের বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এই আলোচনার শেষে আমরা অবশ্য দেখব এই তুই শ্রেণীর লক্ষ্যের মধ্যে কোন প্রকারের ঐক্যসাধন সম্ভব কিনা।

(ক) শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য—শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যানুযায়ী ব্যক্তিতার বিকাশই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সমর্থনে ব্যক্তিবাদীরা নানাপ্রকারের যুক্তির অবতারণা করেন। নিম্নে ঐ সমস্ত যুক্তির কিছু পবিচয় দেওয়া হল ঃ

(১) মানুষ যদিও সমাজের মধ্যে বাস করে, যদিও প্রতিমুহূর্তে তাকে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে হয়, যদিও মনের আদান-প্রদান অবিরত চলেছে, তথাপি প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের একটা তুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান

রয়েছে। সমস্ত আদান-প্রদান, সমস্ত সম্পর্ক একদিক দিয়ে নিতান্ত বাহ্যিক, মানুষের আসল সত্তার পরিচয় থাকে দুর্ভেদ্য রহস্যের আচ্ছাদনে ঢাকা। তাই প্রত্যেকটি মানুষই বলতে পারে, 'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা'। ব্যক্তি-তান্ত্রিক মতবাদীরা ব্যক্তির এই দুর্নিরীক্ষ্য সত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং স্বভাবতঃই শিক্ষার লক্ষ্যকে এই চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অর্থাৎ তাঁরা বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্লঙ্ঘ্যতাকে লঙ্ঘন করা উচিত হবে না।

(২) প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যদিও একই প্রকারের উপাদানে গঠিত বলে যথেষ্ট মিল রয়েছে, তথাপি উপাদানগুলির পরিমাণগত এবং সময়ে সময়ে গুণগত পার্থক্যের দরুণ এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে উপাদানগুলির এক বিশেষ প্রকারের বিন্যাস ঘটায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর। প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিতার জন্যই সমাজে নূতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিতার উপর নির্ভর করেই সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। সুতরাং তাঁদের মতে মানবজীবনের ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজ-প্রগতির আকর এই ব্যক্তিতার বিকাশ সাধন করা।

(৩) ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সুতরাং ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ভিন্ন সমাজের কোন পৃথক সুখ-দুঃখ থাকতে পারে না। তাই সমাজকে সুখী করতে হলে ব্যক্তির সুখের ব্যবস্থা করাই হল একমাত্র উপায়। সুতরাং ব্যক্তির সুখ-বিধানই হওয়া উচিত জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(৪) ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মতের সমর্থনে জীব-জগতের বিবর্তনধারা থেকে যুক্তি আহরণ করেছেন। তাঁদের মতে জীব-জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিরত ব্যক্তিতার উন্নততর বিকাশ ঘটে চলেছে। জীবনের জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিতার জয় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই প্রাকৃতিক বিবর্তনের বিরোধিতা না করে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতার বিকাশের উপরই গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত।

(৫) ব্যক্তিতান্ত্রিকদের মধ্যে অনেকে আবার সমাজের বিবর্তন থেকে তাঁদের মতবাদের সমর্থনে যুক্তি আহরণ করেছেন। তাঁদের মতে মানব-

সমাজের বিবর্তনে ব্যক্তির উদ্ভবই হয়েছে প্রথমে এবং সমাজবদ্ধ জীবনের সুবিধার কথা ভেবে ব্যক্তিগণই সমাজ গঠিত করেছে পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিতার সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনই হল সমাজবদ্ধ মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য এবং জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(৬) রুশোর মত ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, প্রকৃতির কাছ থেকে যা আসে তাই ভাল। সহজাত মানবপ্রকৃতি হল নিষ্কলুষ। সমাজের 'স্থুল-হস্তাবলেপের' জন্যই তাতে মালিন্য আসে। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত ব্যক্তিসত্তার বিকাশই জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৭) ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সমর্থনে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদও উপস্থাপিত করা হয়েছে। ধর্মের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেকটি মানুষের আত্মার মূল্য হল পৃথক। প্রত্যেকের পৃথক আনুগত্য রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি। দর্শনের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পৃথক মানুষ হল মানব সমাজের চরম লক্ষ্যবস্তু। কোন মানুষই উপায় মাত্র নয়।

এই-প্রসঙ্গে সর্বশেষে নিম্নমত কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

(১) জীবন ও শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য সামাজিক লক্ষ্যের পূর্বে আত্ম-প্রকাশ করেনি। আদিম সমাজে, প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ও মধ্যযুগে জীবন ও শিক্ষায় সামাজিক লক্ষ্যেরই প্রাধান্য ছিল।

(২) ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ শুধু ভাববাদ থেকেই উদ্ভূত হয় নি। সমস্ত প্রকারের দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারা বর্তমান।

(৩) সমাজ-জীবন ও জীবনদর্শনের সামগ্রিক রূপের পরিবর্তনের জন্যই বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়, শুধু মনো-বিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্য নয়।

(৪) ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ চরমপন্থী হলেও, সাধারণতঃ ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা সমাজের অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথাও মানেন। তবে তাঁরা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন।

(৫) আধুনিক শিক্ষাজগতে প্রচলিত ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উপর মনস্তত্ত্বের প্রভাব খুব বেশী।

(৬) জীবন ও শিক্ষায় চরম ব্যক্তিতন্ত্রবাদী হলেন প্রাচীন গ্রীসের

সোফিষ্ট-রা (sophists), কার্লাইল এবং নীটশে (Nietzche) এবং সাধারণভাবে ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ হলেন ইর্যাসমাস, বেকন, লক্, ক্যাণ্ট, রুশো, মন্তেসরী, রাসেল, নান্ প্রভৃতি।

শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য

ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মত সমাজতন্ত্রবাদীরাও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের সমর্থনে নানা প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত করেন। প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

(১) একমাত্র সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব। ব্যক্তি জন্মায় শুধু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে। সমাজই সেই সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবেশের সাহায্য বাদ দিলে উদ্দীপকের অভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিতা শুধু অনির্দেশ্য সম্ভাবনারূপে রয়ে যাবে। সুতরাং সমাজের বিকাশই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(২) আধুনিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকেরা (social psychologists) এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববাদীরা (cultural anthropologists) খুব ভালভাবেই দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ববোধের উদ্ভব ও বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের (personality) বিশেষ গঠন ও বিকাশ বিপুলভাবে নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের উপর। সুতরাং সমাজ-জীবনের বিকাশই হওয়া উচিত মানব জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(৩) সঙ্গীহীন মানুষ রক্তক্ষয়ী জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ অপারগ বলেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক অস্তিত্ব ও বিকাশ মানুষের জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এই অবস্থায় জীবন ও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে সমাজসংরক্ষণ ও তার বিকাশ।

(৪) সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি। সুতরাং সমাজের সামগ্রিক সুখবিধান সম্ভব হলেই ব্যক্তির সুখবিধান অপরিহার্যভাবে সম্ভব হয়।

(৫) বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ পরস্পরের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সকলেরই বিকাশ সম্ভব হয়।

(৬) নিঃসঙ্গ জীবনযাপন মানুষের আদিম অবস্থাতেই সম্ভব হয় নি।

আজ যখন মানবজীবন জটিল হইতে জটিলতর হতে চলেছে, তখন আর নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(৭) মানবসমাজের বিবর্তনের ধারা আজ প্রত্যেকটি পৃথক সমাজকে এবং বৃহত্তর মানবসমাজকে প্রতিদিন ব্যাপকতর ও গভীরতর সংহতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ইতিহাসের এই অমোঘ ধারাকে ব্যাহত করে আজ আর ব্যক্তিতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। তাই বাস্তব-বাদীরা একে কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না।

(৮) একথা সত্য নয় যে, অনেকগুলি একক মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে চুক্তি করে সমাজ সৃষ্টি করেছে। মানুষ হল সমাজবদ্ধ প্রাণী। স্বাভাবিক অবস্থায় সমাজ বহির্ভূত মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা বা নৃতত্ত্ব-বাদীরা কখনও পাননি। সুতরাং সমাজবহির্ভূত পৃথক ব্যক্তিতার বিকাশ কখনও শিক্ষার বা জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং সমাজের বিকাশই জীবন ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত।

(৯) দার্শনিক হিগেল ও তাঁর মতাবলম্বীরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে একটি অতিব্যক্তিক (super-personal) পৃথক সত্তা দান করেছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির পৃথক জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের এই অতিব্যক্তিক সত্তার এক অতি ক্ষণস্থায়ী উপাদানমাত্র। যুগযুগান্তকাল ধরে সমাজের প্রবহমান আধ্যাত্মিক জীবনধারায় অংশগ্রহণ করেই ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী সত্তা কিছুটা মূল্য অর্জন করে। সুতরাং এই মতবাদীদের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের (যেটি হল সমাজের সংহত রূপ) বিকাশই হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(১০) সমাজ ও রাষ্ট্রের জৈব ব্যাখ্যাকারীরা বলেন একক ব্যক্তিরা হল সমাজদেহের কোষতুল্য। পৃথক কোষগুলির যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি সমাজবহির্ভূত পৃথক ব্যক্তিদের কোন মূল্য নেই। সুতরাং সমাজের সংরক্ষণ ও বিকাশসাধন হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(১১) প্রায় সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্মে ব্যক্তির আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও সমাজের সকলের মঙ্গলসাধনকে আত্মিক বিকাশের অপরিহার্য অংশ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় সমর্থন শুধু ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে নয়। বিশেষ করে ভারতের ব্রহ্মবাদী ধর্ম ও দর্শন ব্যক্তির পৃথক সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব আদৌ স্বীকার করে না। এদের মতে ব্যক্তির পৃথক সত্তা হল

তার সমস্ত দুঃখের আকর। বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে একত্ব-বোধেই ব্যক্তির মুক্তি।

সমাজতান্ত্রিক মতেরও উগ্র সমর্থক ও সাধারণ সমর্থক আছেন। উগ্র সমর্থকদের মধ্যে প্লেটো, হিগেল, নাৎসী ও ফ্যাসীবাদীরা হলেন প্রধান। সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে অ্যারিষ্টটল, টমাস একুইনাস, পেস্তালৎসী, ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, ফ্রেড্ ক্লার্ক প্রভৃতি হলেন প্রধান।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

মানবসমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ও অবস্থায় শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সামাজিক। সমাজের প্রচলিত চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতিগুলি বজায় রাখাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রাচীন চীনদেশে, ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে সমাজ দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত আদর্শের দ্বারাই ব্যক্তির জীবন ও শিক্ষা পরিচালিত হত। সুতরাং এগুলির ক্ষেত্রেও শিক্ষার আদর্শ ছিল সমাজতান্ত্রিক।

প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টা নগরীতেও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যই বলবৎ ছিল, কেননা রাষ্ট্রের জন্য সমস্ত নাগরিককে এখানে একই ছাঁচে গড়ে তোলা হত। গ্রীসের এথেনীয় রাষ্ট্রের পেরিক্লিসের যুগে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়ের বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু ছিল, যদিও এথেন্সের সোফিষ্ট নামক দার্শনিক-শিক্ষকরা শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সমর্থক ছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই ব্যক্তির বিকাশ চেয়েছিলেন। ব্যক্তিসত্তার সমাজ-বহির্ভূত বিকাশ তাঁরা কেউই চাননি। শ্রেণীগত বা সাধারণ আদর্শের দ্বারা ব্যক্তির শিক্ষা পরিচালনার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছিলেন। তথাপি পেরেক্লিসের এথেন্সে ও মহান গ্রীক দার্শনিকদের আদর্শে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের স্থান ছিল।

মধ্যযুগের খৃষ্টীয় শিক্ষাতে ব্যক্তির পৃথক ও বহুমুখী বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। খৃষ্টের জীবনের সাধারণ একমুখী আদর্শের দ্বারা শিক্ষাক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হত। সুতরাং এই শিক্ষা ছিল সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইয়োরোপের নবজাগরণের যুগে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য

হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও ধর্মের অনুশাসনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়নি এবং ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের উপরও খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সুতরাং এই যুগের শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাব উপস্থিত থাকলেও এই প্রভাব সর্বজয়ী হয়নি।

এর পর রুশোর সময় পর্যন্ত শিক্ষায় সাধারণ ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক আদর্শ (প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা) প্রভাবশীল ছিল। এমন কি রুশোও ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশের উপর জোর দিলেও তার ব্যক্তিতার বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেননি। তিনিও প্রধানতঃ মানবোচিত সাধারণ গুণাবলীকে ব্যক্তির চরিত্রে বিকশিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন। সুতরাং রুশোর সময় পর্যন্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রবল ছিল। এমন কি রুশোর মুখেও ব্যক্তিতন্ত্রের জয়গান মাত্রাহীনভাবে ধ্বনিত হয়নি।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থাতে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের উপর উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্পণ করা হলেও সর্বসময়ে সমাজের পটভূমিতেই ব্যক্তির জীবনকে দেখা হয়েছে। এমন কি কয়েকটি রাষ্ট্রে (নাৎসী, ফ্যাসিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট) ব্যক্তির শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাতে যদিও সমাজের আদর্শকে সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে শেখান হত, বিংশ শতাব্দীর সমস্ত রাষ্ট্রেই সমাজের আদর্শের দ্বারা ব্যক্তির শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ও সজাগভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অবশ্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে এই নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া পূর্বের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মত অত কঠিন ও অনমনীয়ভাবে চলছে না। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিকেরা (যেমন পেস্তালৎসী, ফ্রোয়েবেল, হাবার্ট, হার্বাট স্পেন্সর প্রভৃতি) সাধারণতঃ সামাজিক পটভূমিকাতেই ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে দু-একজন ভিন্ন (যেমন পার্শি নান্ ও অ্যাড্যামসন্) প্রায় সকলেই ব্যক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষতঃ সমাজের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, কেননা সকলেই প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন। পার্শি-নান্ ও অ্যাড্যামসনও কিন্তু সমাজকে ভোলেননি। ব্যক্তিতার বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করলেও সমাজের সভ্য হিসাবেই তাঁরা ব্যক্তিকে দেখেছেন

এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের বিকাশও তাঁরা চেয়েছেন। সুতরাং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক এই দুই প্রকারের মতবাদ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে।

উপরের ঐতিহাসিক রেখাঙ্কন থেকে দেখা গেল যে, মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত প্রাচীন এথেন্স ভিন্ন প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক। এথেন্সে, নবজাগরণের যুগে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় ব্যক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হলেও, সর্বসময়ে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ চাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যায়ে সমাজের চাহিদাকে সর্বাগ্রে মনে রেখেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সমস্ত সভ্য দেশেই চলেছে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-তে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির বিশেষ বিকাশের অপেক্ষা তার সাধারণ বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহে আসা যায়।

(১) সমাজ ব্যক্তি নিয়েই গঠিত। ব্যক্তিবহির্ভূত কোন পৃথক সত্তা সমাজের নেই।

(২) সমাজের প্রগতির চরম মাপকাঠি হল সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।

(৩) ব্যক্তিতার বিকাশে ব্যক্তি পায় চরম আনন্দ এবং সমাজেরও প্রগতি সংসাধিত হয়। সমাজে নূতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভব হয় ব্যক্তিতার বিকাশের মাধ্যমেই।

(৪) মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীব।

(৫) একমাত্র সমাজের মধ্যেই মানুষের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে টিঁকে থাকা সম্ভব। কোন প্রকারে জীবিত থাকলেও সমাজ-বহির্ভূত মানুষের বিকাশ প্রায় জান্তব স্তরেই নিবদ্ধ থাকে।

(৬) সমাজের চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতিকে আয়ত্ত করেই ব্যক্তির বিশেষ সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে। সমস্ত প্রকারের নূতন সৃষ্টির পূর্বে পূর্বসূরীদের অনুসরণ ও অনুকরণ অপরিহার্য।

(৭) বিশেষ করে আধুনিক জগতে প্রধানতঃ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করা উচিত।

(৮) ব্যক্তির বিকাশের ধারণা সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমাজের বিকাশ ব্যক্তির বিকাশের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।

সুতরাং দেখা গেল যে, দুটি শ্রেণীর মতবাদের সমর্থনেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা যায়। অর্থাৎ দুটি শ্রেণীর মতবাদের মধ্যেই যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার ব্যাপক ও সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষ্য নির্ণয় করতে গেলে সমাজ ও ব্যক্তি দুইকেই সমানভাবে মনে রাখতে হয়। বস্তুতঃ সমস্ত বড় চিন্তানায়কই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে সমাজ ও ব্যক্তি দুইকেই স্থান দিয়েছেন। হয়ত একদিক থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সেই দিকে বেশী জোর পড়েছে, কিন্তু অন্যদিক একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যায়নি। সুতরাং অনুগ্রভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয়সাধন করা মোটেই কঠিন নয়। তবে দুই দিককার চরম মতবাদীদের মেলান সম্ভব নয়, কেননা চরমভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কোন সত্যতা থাকতে পারে না। সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার লক্ষ্যকে নিম্নমত কয়েকটিরূপে প্রকাশ করা যায়:

১। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশসাধন।

২। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মঙ্গলময় পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের মঙ্গলময় বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন।

৪। শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিকভাবে মঙ্গলময় মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন।

৫। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশসাধনকারী সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশসাধন।

স্পষ্টতঃ উপরের যে মিলন সংঘটিত হল তা হল তত্ত্বগত। কিন্তু বাস্তব-জীবনে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মিলনের জন্য প্রয়োজন মানব-জীবনের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস। বস্তুতঃ সেই পুনর্বিন্যাস আজও কোথাও সংঘটিত হয়নি বলে জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। দুই শ্রেণীর লক্ষ্যের মিলনের জন্য এমন সমাজ সৃষ্টি করার প্রয়োজন যেখানে ব্যক্তির

বিকাশের সঙ্গে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের কোন দ্বন্দ্ব নেই অর্থাৎ যে সমাজে শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি কোন প্রকারের ক্ষতিকর ভেদাভেদ বর্তমান নেই এবং যেখানে জীবনের সর্বস্তরে (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরসমূহে) গণতন্ত্রের মহান মৌলিক নীতিগুলির (স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের) প্রয়োগ অবারিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও আজ পর্যন্ত কোন দেশেই গণতন্ত্রের জয় সর্বতোমুখী হয়নি, তথাপি ইতিহাসের গতি প্রকৃত গণতন্ত্রেরই অভিমুখে। তবে সামাজিক বিবর্তনের ধারা গণতন্ত্রের অভিমুখে দুদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে—পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে এবং পূর্বের রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের দিক থেকে। কিন্তু গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয় সুনিশ্চিত।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য

প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটির উল্লেখ আমরা এখনই করেছি। সেই বৈশিষ্ট্য দুটি হল—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। ব্যক্তির ও সমাজের এই পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন জীবনের সর্বদিকে গণতন্ত্রের বহুখ্যাত তিনটি তত্ত্বের অবারিত প্রয়োগ। এই তিনটি তত্ত্ব সাধারণতঃ পৃথক্ ভাবে উপস্থাপিত হলেও এগুলি আসলে পরস্পরের পরিপূরক। বস্তুতঃ তিনটি তত্ত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধারণার মত একই বস্তুর তিনটি অচ্ছেদ্য দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্যই স্বাধীনতা ভিন্ন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই। তেমনি সাম্য ভিন্ন স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ ভিন্ন স্বাধীনতা ও সাম্য হয়ে পড়ে প্রাণহীন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, একমাত্র যন্ত্রনির্ভর সমাজেই গণতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ সম্ভব, কেননা প্রাচুর্য না থাকলে সমাজে অসাম্যের উদ্ভব হবেই, ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবেই এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ সম্ভব হবে না। গণতন্ত্রের বাণীও যে মানবেতিহাসে তেমন জোরালো হয়ে এতাবৎকাল ধ্বনিত হয়নি, তার এই কারণ। এতকাল সমাজে এমন প্রাচুর্য বা তার সম্ভাবনা ছিল না যেখানে সকলের বিকাশের জন্য যোগ্য সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে

সর্বব্যাপী প্রাচুর্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই গণতন্ত্রের দাবী চারিদিকে এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সমাজ দুয়েরই লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। সুতরাং একথা বলা যায় যে, প্রকৃত শিক্ষাই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও সমাজের (দেশের ও আন্তর্জাতিক) সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার চরম লক্ষ্য। এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে এমন কতকগুলি আশু লক্ষ্য নির্ণয় করা প্রয়োজন যেগুলি সিদ্ধ হলে চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। নিম্নে গণতান্ত্রিক শিক্ষার আশু লক্ষ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত করে উপস্থাপিত করা হল।

(অ) ব্যক্তির আত্মবিকাশমূলক লক্ষ্যসমূহ

(১) দৈহিক বিকাশ—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) ব্যক্তির ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(খ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সু-অভ্যাসসমূহ।

(গ) স্বাস্থ্যের প্রতি অনুরাগের মনোভাব (attitude)।

(২) ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন সমস্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর শক্তির বিকাশ, বিশেষ করে দেখা ও শোনার দক্ষতা।

(৩) বৌদ্ধিক বিকাশ—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) কথাবলা, পড়া, লেখা ও গণিতে দক্ষতা।

(খ) বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজ সম্বন্ধে যোগ্য জ্ঞানার্জন।

(গ) বহুমুখী বৌদ্ধিক অনুরাগ (many-sided interest)।

(ঘ) অনুসন্ধিৎসু, সুবিচারক্ষম, সংস্কারমুক্ত, নমনীয় ও সাহসী মন।

(ঙ) জ্ঞানার্জনের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ আয়ত্তীকরণ।

(৪) প্রক্ষোভ ও প্রয়াসমূলক দিকের বিকাশ—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) সংহত ও মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি।

(খ) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ।

(আ) জীবনের অর্থনৈতিক দিকসম্বন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ

(১) উৎপাদনকারী হিসাবে দক্ষতা—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) পেশা মনোনয়নে ও পেশাগত কর্মে দক্ষতা।
(খ) নিজ পেশায় আনন্দ ও তার সামাজিক মূল্যবোধ।
(গ) সমাজের বিভিন্ন পেশার সংবাদ রাখা এবং প্রয়োজন হলে অন্য পেশা গ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি।
(ঘ) নিজ পেশার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির পূর্বে সাধারণভাবে কর্মজগতের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি।

(২) সম্ভোগকারী হিসাবে দক্ষতা—এই লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজ আয়ের পরিকল্পনামত ব্যয়ের ক্ষমতা।
(খ) ক্রেতাহিসাবে দক্ষতা।
(গ) বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের জালে না-পড়ার ক্ষমতা অর্জন।
(ঘ) ক্রীত বস্তুসমূহের যোগ্যতম ব্যবহার।

(ই) মানবীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ

(১) পরিবারের সভ্যহিসাবে দক্ষতা—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) সমাজে পরিবারের স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন।
(খ) পরিবারের কর্মাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা।
(গ) পরিবারের আদর্শের প্রতি অনুরাগ।
(ঘ) পরিবারকে গণতন্ত্রের ধাত্রীরূপে গঠন করা ও পরিচালিত করা।

(২) সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে দক্ষতা—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) মানুষের জীবনে মানবীয় সম্পর্কের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

(খ) মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।

(গ) নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অর্জনে, ও সকলের সঙ্গে ভদ্রব্যবহার প্রদর্শনে দক্ষতা। সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার ও খেলার দক্ষতা।

(ঘ) বন্ধুত্ব ও ভদ্রতাকে অন্তরের সঙ্গে উপভোগ করা।

(৩) দেশের নাগরিক হিসাবে দক্ষতা—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান।

(খ) সামাজিক উচ্চ আদর্শাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল প্রকার বিভেদমূলক বৈষম্যের প্রতি বিরাগ।

(গ) তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, পরমতসহিষ্ণুতা, বিজ্ঞানের দানকে সমাজের পটভূমিতে দেখার দক্ষতা, জাতীয় সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণার্জন।

(ঘ) সামাজিক আদর্শানুযায়ী কাজ করার দক্ষতা।

(ঙ) ইতিহাসের ধারায় গণতন্ত্রের স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান।

(চ) গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য।

(ছ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে যোগ্য জ্ঞানলাভ ও তদনুযায়ী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস।

৪। আন্তর্জাতিক নাগরিক হিসাবে দক্ষতা—এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন :

(ক) সমগ্র মানবসমাজের মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান। ঐক্য-বিরোধী শক্তিসমূহ সম্বন্ধেও সম্যক্ জ্ঞান।

(খ) ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব।

(গ) আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ জীবন ও জাতীয় জীবনকে দেখার অভ্যাস।

(ঘ) আন্তর্জাতিক ঐক্যসাধনের জন্য বহুমুখী কর্মের প্রয়াস এবং বহুপ্রকারের মাধ্যম ও কৌশলের ব্যবহার।

শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। ঐ লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণেরও প্রয়োজন আছে, কেননা তবেই এমন অবস্থা সৃষ্ট হবে যাতে করে ঐ লক্ষ্যগুলি সিদ্ধ হয়। নিম্নে গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হল ঃ

১। বংশধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সমস্ত শিখন ও বিকাশ সম্ভব হয় জন্মগত শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে বংশধারার ক্রমাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষ প্রয়োজন।

২। দৈহিক নিরাপত্তা ও বিকাশের ব্যবস্থা

সুদৃঢ় দৈহিক ভিত্তির উপরই সুন্দর মানসিক সৌধ গড়ে তোলা যায় এবং দৈহিক বিকাশ নিজের জন্যও প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকের দেহের সংরক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা সমাজকে করতে হবে।

৩। অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা

পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং যোগ্য পেশা মনোনয়ন ও লাভ সুখী জীবনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রকে পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি লোক তার শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষালাভ করতে পারে এবং শিক্ষান্তে যোগ্য পেশাও লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই প্রকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, কেননা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন শোষক ও শোষিত শ্রেণীর উপস্থিতির ফলে এবং উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের করায়ত্ত নয় বলে অর্থনৈতিক সুযোগ ব্যাপারে সাম্যনীতির অনুসরণ অসম্ভব।

৪। উচ্চ মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে বাধা অপসারণ

মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে গণতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন

অবারিত সম্পর্ক স্থাপনের পথের সমস্ত বাধা অপসারণ। অর্থনৈতিক শ্রেণীও সামাজিক শ্রেণীর (অর্থাৎ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল সমস্ত প্রকারের মানবীয় ক্ষতিকর বিভেদের) অবসান প্রয়োজন।

৫। স্বাধীন জীবন যাপনের ব্যবস্থা

আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের গভীরতম আনন্দলাভ করে। এই আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। অন্য সকলের স্বাধীনতার কথা ভেবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির কথা মনে রেখে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। এই স্বাধীনতা বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশ পাবে: (ক) জীবনের সঙ্গীনির্বাচন, (খ) পেশানির্বাচন, (গ) গমনাগমন, (ঘ) জীবন ভঙ্গি (manner of living), (ঙ) বাসস্থান নির্বাচন এবং দল ও সঙ্ঘ নির্বাচন। বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরও গণতন্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৬। সত্য প্রচারের ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্য প্রচারে বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় সমাজের সকল সভ্যের যোগ্য অংশগ্রহণের জন্য সর্ববিষয়ে সত্য পরিবেশন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৭। উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা

মানুষ জন্মায় কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে মাত্র। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রকে সকলের জন্য সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে অংশগ্রহণের সমান সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য

বহুদিন পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন হয়েছে জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ নিয়ে, বহুপ্রকারের সামাজিক অসাম্য নিয়ে, হিমালয় প্রমাণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিয়ে, দেশব্যাপী আত্মিক জড়তা নিয়ে, অকল্পনীয় সামাজক চেতনার অভাব নিয়ে এবং বেদনাদায়ক চিন্তার পঙ্গুতা নিয়ে। এই সর্বাংগীণ অবনতির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে

সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করা চাই। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কি আমরা তা পূর্বেই দেখেছি। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে ঐ লক্ষ্য-গুলিকে ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা উচিত। তবে ভারতবর্ষ আজ গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত এবং বিশ্বজগৎ দুর্বার গতিতে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্যপ্রদান প্রয়োজন। সেই বিষয়গুলি হল ঃ

১। দ্রুত সর্বাঙ্গীণ আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সর্বব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন।

২। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সুবিচারের ভিত্তিতে নিম্নতম ও উচ্চতম জীবনমান নির্ণয়।

৩। বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠন ও বিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার।

৪। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিদূরণ।

৫। সমাজ-জীবনে সর্বত্র সুবিচার ও সহনশীলতার চর্চা।

৬। সমস্ত ব্যক্তিকে সমান শিক্ষার সুযোগদান এবং সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব গঠন ও চিন্তার স্বাধীনতা দান।

৭। নারীজাতিকে সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দান।

৮। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রদেশবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি গঠন।

৯। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনকে সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা ও স্থান দান করা।

১০। গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরী করা এবং তাদের সর্বদিকে প্রয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১১। ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন মানব-প্রেম ও মানব-মৈত্রীর বাণীর দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, বিশ্বে সেই বাণী প্রচার করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

শিক্ষার বিভিন্ন প্রচলিত লক্ষ্যের মূল্যায়ন

১। শিক্ষার লক্ষ্য জীবিকার জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি

অনেকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবিকার্জনের জন্য দক্ষতা লাভ। কিন্তু এই লক্ষ্যটি হল অত্যন্ত অবাস্তব ও সঙ্কীর্ণ এবং তাই অচল। সুদূর ভবিষ্যতে শিশুর কি পেশা হবে তা প্রথম থেকে নির্ণয় করা অসম্ভব। আবার পরিবর্তনশীল বর্তমান জগতে অতি পূর্ব থেকে পেশা নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তার ওপর প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা। নিছক পেশাসম্পর্কিত শিক্ষায় মানুষ হওয়ার ব্যাপক শিক্ষালাভ হয় না। বলা বাহুল্য, এই মানুষ হওয়ার শিক্ষা বলতে বোঝায় সামাজিক পটভূমিতে সর্বপ্রকার শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।

২। শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন

কেউ কেউ মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করা। এঁদের মতে জ্ঞানের প্রয়োগ মুখ্য বস্তু নয়, কারণ জ্ঞান ধ্যানের বস্তু এবং জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভ। শিক্ষার এই লক্ষ্যটি ভ্রমাত্মক, কেননা মানুষ জ্ঞানার্জনে প্রয়াসী হলেও বাঁচার তাগিদেই প্রধানতঃ সে জ্ঞানলাভ করতে চায় এবং তাই অর্জিত জ্ঞান নিছক উপভোগের বস্তু হতে পারে না। তারপর যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন, সেইহেতু নিছক জ্ঞানার্জন (যা বৌদ্ধিক বিকাশের একটি দিক) কখনও শিক্ষার পূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে না।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানলাভ করে মানসিক বৃদ্ধি সংঘটিত করা

মানসিক বৃদ্ধি বলতে স্পষ্টতঃ এখানে বৌদ্ধিক বিকাশকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য হতে পারে না। তার উপর যে কোন প্রকারে জ্ঞানার্জন করলেই মানসিক বৃদ্ধি সংঘটিত হয় না। একমাত্র সক্রিয়ভাবে এবং উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞানার্জন করলেই মানসিক বিকাশসাধন সম্ভব। সুতরাং আলোচ্য লক্ষ্যটি সঙ্কীর্ণ ও অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট।

৪। শিক্ষার লক্ষ্য মানসিক শৃঙ্খলাসৃষ্টির মাধ্যমে মনের শক্তি বৃদ্ধি

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে আমরা এই ধারণাটির (মানসিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির) সম্মুখীন হয়েছি। এই তত্ত্বটি শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যাপারে কতটা ভ্রমাত্মক তা আমরা দেখেছি। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যাপারেও মানসিক শৃঙ্খলাসৃষ্টির ধারণাটি সম্পূর্ণ অচল, কেননা যে ধারণা ভ্রমাত্মক তা যে কোন পটভূমিতেই অচল। আধুনিক মনস্তত্ত্ব পৃথক মানসিক শক্তির অস্তিত্বে ও চর্চার মাধ্যমে তাদের সাধারণ শক্তি বৃদ্ধিতে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

৫। শিক্ষার লক্ষ্য কৃষ্টিলাভ

কৃষ্টি শব্দটির অর্থ নানাপ্রকারের। কারুর কারুর কাছে কৃষ্টির অর্থ সমাজের বিরাম-ভোগকারী শ্রেণীর (leisure class) উপযোগী জ্ঞান ও অভ্যাসসমূহ। অন্যান্যদের কাছে কৃষ্টির অর্থ মানবিক বিষয়সমূহ (humanities) সম্বন্ধে জ্ঞান। এঁদের নিকটে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির কৃষ্টিগত মূল্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের অপেক্ষা অনেক বেশী। এমন আরও অনেকে আছেন যাঁদের কাছে কৃষ্টির অর্থ মানুষ হিসাবে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্যাস, আদর্শ ইত্যাদি। এঁদের কাছে পেশাগত জ্ঞানের কৃষ্টিগত মূল্য ঐ সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অনেক কম। আরও অন্যদের কাছে কৃষ্টির অর্থ চারু শিল্পসমূহে উৎকর্ষ। এঁদের কাছে চারু শিল্পগুলির কৃষ্টিগত মূল্য কারু শিল্পগুলির চেয়ে অনেক বেশী। এমনি আরও অর্থ প্রচলিত আছে। যে ধারণাটির অর্থ এত প্রকারের তার কোন সঠিক অর্থ-নির্ধারণ না করে তাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে প্রচলিত কোন অর্থেই তাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কেননা প্রত্যেকটি অর্থেই মানব-ব্যক্তিত্বের কোন না কোন দিককে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

৬। শিক্ষার লক্ষ্য স্বাভাবিক বিকাশ

শিক্ষার এই লক্ষ্যটিকে রুশোই প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন। রুশোর মতে মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার লক্ষ্য। সুতরাং মানুষের

জন্মগত স্বভাব-ধারাকে অব্যাহত রাখাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই সংজ্ঞায় সমাজের সঙ্গে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটি ভুল। কেননা প্রকৃতিগতভাবে মানুষ নিয়ে আসে শুধু কতকগুলি সম্ভাবনা, যেগুলি সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। মানব-সমাজ প্রকৃতির পরিপূরক, তার বিরুদ্ধ শক্তি নয়। তবে বিশেষ সমাজের বিশেষ সময়ের রূপ প্রকৃতি-বিরোধী হতে পারে এবং তখন সেই সমাজের বিরোধিতা করাও প্রয়োজনীয়। কিন্তু সমাজমাত্রই খারাপ এমন ধারণা নিতান্ত ভুল।

৭। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতার বিকাশ

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি যে, শুধু ব্যক্তিতার বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই বিকাশের স্থান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির সাধারণ গুণাবলীর বিকাশ ব্যক্তিতার বিকাশের মতই অপরিহার্য।

৮। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মপ্রকাশ (Self-expression)

সাধারণ অর্থে আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিতার বিকাশ দুটি ধারণা একই। সুতরাং যে কারণে লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্তিতার বিকাশ অচল, সেই কারণেই লক্ষ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশও অচল।

৯। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মবিকাশ (Self-realisation)

আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিতার বিকাশ বা আত্মপ্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আত্মবিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কেননা এই অর্থে ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবেও দেখা হয় এবং ব্যক্তির বর্তমান অপূর্ণ অবস্থাকেও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। এই ধারণাটির দ্বারা বোঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি দিকেরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।

১০। শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রগঠন

ব্যাপক এবং প্রকৃত অর্থে চরিত্রগঠনই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য, এমনি কথা

অনেক মহান্ শিক্ষাবিদ্ই বলেছেন এবং তাঁরা ঠিকই বলেছেন, কেননা চরিত্রের পরিধির মধ্যে জীবনের সর্বকর্ম ও সর্বদিকই পড়ে এবং সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ নিশ্চয়ই মানুষের চরম ও পরম কাম্য। মনে রাখা প্রয়োজন, দৈহিক আচরণ, বৌদ্ধিক আচরণ, সামাজিক আচরণ, সৌন্দর্য-সম্বন্ধীয় আচরণ প্রভৃতি সর্ববিধ আচরণই চরিত্রের বিষয়বস্তু, শুধু তথাকথিত নৈতিক আচরণ নয়।

১১। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির শক্তিসমূহের সুষম বিকাশ

ব্যক্তির শক্তিসমূহের সুষম বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু গ্রহণ করার পূর্বে কয়েকটি ভুল ধারণার নিরসনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম কথা হল এই যে, মানুষের শক্তি বলতে যদি পুরাতন মনস্তত্ত্বের মানসিক শক্তিগুলিকে (faculties) বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্য অচল, কেননা আমরা দেখেছি যে, ঐ সব শক্তির অস্তিত্বই আধুনিক মনস্তত্ত্ব স্বীকার করে না। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, এই ধারণার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা অন্ততঃ প্রত্যক্ষত হয় নি। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের দিকও এই ধারণায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই ধারণার দ্বারা যদি সামাজিক পরিবেশে সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তির সর্বদিকের সুসমঞ্জস বিকাশ বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্যটি গ্রহণীয় হতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিতার বিকাশও এই সুসমঞ্জস সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে পড়ে।

১২। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ

সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষলাভকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় যদি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ভুল ধারণাকে দূর করা হয়। প্রথম কথা হল এই যে, জীবনের শুধু ভাল বস্তুগুলিরই বিকাশ প্রয়োজন, সমস্ত বস্তুর নয়। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, সর্বদিকের সমান উৎকর্ষ প্রত্যেকের জন্য কাম্য নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সর্বদিকের বিকাশ প্রয়োজন। তৃতীয় কথা হল এই যে, সমস্ত দিকের বিকাশের মধ্যে সংঘর্ষ যেন না বাঁধে, এটিও লক্ষ্যণীয়। চতুর্থ কথা হল এই যে, এই লক্ষ্যটিতে প্রকাশ্যভাবে সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির বিকাশের কথা বলা হয় না। তবে এই লক্ষ্যটির প্রধান গুণ হল এই যে, মানুষের বহুমুখী বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর এটি যথাযোগ্য গুরুত্ব অর্পণ করেছে।

১৩। শিক্ষার লক্ষ্য সংগতিবিধান

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করেই মানুষ আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশ সাধিত করে। আমরা এও দেখেছি যে, শিক্ষার কাজ হল এই সঙ্গতিসাধন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করা। মানুষ তার পরিবেশকে ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করে বলে তার সঙ্গতিবিধানের চেষ্টাকে 'উন্নততর' সঙ্গতিবিধান বলেও অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সমাজের সমস্ত মানুষের উন্নততর সঙ্গতি বিধানের প্রয়াসকে বিরামহীনভাবে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে দেওয়াকে আমরা শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করতে পারি।

১৪। শিক্ষার লক্ষ্য বৃদ্ধি (growth)

জন ডিউই বৃদ্ধিকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বৃদ্ধির ধারণার মধ্যে অবশ্য বিকাশের (development) ধারণাকেও স্থান দিয়েছেন এবং বৃদ্ধি বলতে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়ের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে বিরামবিহীন বৃদ্ধি সুষ্ঠু ও মঙ্গলময় হতে বাধ্য, কেননা অমঙ্গলজনক বৃদ্ধি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তথাপি এই শিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিকাশের এবং অব্যাহত বিকাশের উল্লেখ করা এবং ব্যক্তির ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে।

১৫। শিক্ষার লক্ষ্য সুখলাভ

অনেকে (সুখবাদীরা) বলেন, জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল সুখলাভ। এই লক্ষ্যটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন সুখলাভ বলতে হলে সকলের সুখলাভ না বোঝালে তা গণতান্ত্রিক অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। তারপর সুখলাভকে কর্মের চরম পরিণতি হিসাবেই দেখা উচিত। কর্মের আশু পরিণতি হিসাবে সুখকে দেখলে জীবনে মহত্ত্বের অনেক হ্রাস ঘটবে। নিজের ও সকলের সুখলাভের জন্য অনেক সময়ে ব্যক্তিকে সুখলাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়, একথাও মনে রাখা উচিত। তবে প্রকৃত গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, কারা বঞ্চিত হবে এবং কখন বঞ্চিত হবে।

১৬। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বমানবের চাহিদা (Wants) মেটান

কেউ কেউ বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল সর্বমানবের চাহিদা মেটান। তাঁদের মতে মানুষ চাহিদা মেটানর জন্যই সর্ব কর্ম করে এবং তাই মানুষের ভালমন্দ চাহিদা মেটানর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে সুখও এই চাহিদার পরিতৃপ্তি থেকে উদ্ভূত হয়। তাঁদের এই সমস্ত বক্তব্যই যুক্তিসহ। তবে মনে রাখতে হবে যে, মানুষের চাহিদাগুলি স্থাণু নয়, তাদের রূপ ও সংখ্যা নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সর্বমানবের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাসমূহের তৃপ্তিসাধন। আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিকাশপ্রাপ্ত চাহিদাগুলিকে মেটান নয়। নূতন চাহিদার সৃষ্টি, পুরাতন চাহিদার রূপান্তর সাধন, এমনকি উন্মূলনও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে সেই সব চাহিদারই উন্মূলন প্রয়োজন যেগুলি অন্য চাহিদার তৃপ্তিসাধনের পথে অন্তরায়স্বরূপ। সুতরাং শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যকে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। পরিবর্তনের পর লক্ষ্যটি এমনি রূপ নেয়ঃ সর্বমানবের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলির সুসমঞ্জস তৃপ্তি ও বিকাশ সাধন।

১৭। শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন (Complete living)

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেছিলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন। এই লক্ষ্যটিকে গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন বলতে যদি জীবনের প্রধান দিক কয়টির সুসমঞ্জস বিকাশ বোঝান হয় এবং যদি এই সুসমঞ্জস বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের কোন দ্বন্দ্ব না থাকে তবেই পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের লক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য। স্পেন্সর আরও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতিই হল শিক্ষার লক্ষ্য। প্রস্তুতি তত্বটির আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি এবং তার দোষ কোথায় দেখেছি। এখন শুধু বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। স্পেন্সর তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনের চিত্রের মধ্যে সাহিত্য শিল্প, দর্শন ইত্যাদিকে যে গৌণ স্থান দিয়েছেন তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এগুলিকে স্পেন্সর জীবনের

অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বস্তু বলে মনে না করে খুবই ভুল করেছেন, কারণ পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের ধারণার মধ্যে অন্নবস্ত্রের স্থান ঐসব বিষয়ের পূর্বে নয়, সঙ্গেই।

১৮। সুনাগরিকতা হল শিক্ষার লক্ষ্য

পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের ধারণার মধ্যে স্পেন্সর নাগরিকতার ধারণাটিকেও স্থান দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নাগরিকতার ধারণাটির পরিধি বাড়িয়ে মানুষের সমগ্র জীবনকেই তার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে সুনাগরিক হতে হলে জীবনের সর্ব দিকেরই বিকাশ প্রয়োজন। সুতরাং তাঁরা বলেন যে, সুনাগরিকতাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এই লক্ষ্যটির বিষয়েও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল এই যে, যদি নাগরিকতাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে আজকের দিনে জাতীয় নাগরিকতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক নাগরিকতাকেও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। তারপর নাগরিকতাকেই শুধু লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে (যতই ব্যাপকভাবে হোক) ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিকের প্রতি অবহেলার অবকাশ থাকে। তৃতীয় কথা হল এই যে, সুনাগরিকতার দ্বারা শুধু সমাজ-সংরক্ষণ বোঝালে এই আদর্শটি বিশেষ ত্রুটিযুক্ত হয়ে উঠবে। এই আদর্শের মধ্যে সমাজ প্রগতির জন্য প্রয়াসেরও যোগ্য স্থান থাকা চাই। স্পষ্টতঃ এই মতবাদটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা উপস্থাপিত করেছেন।

১৯। সামাজিক দক্ষতা (Social efficiency)

জন ডিউই বৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক দক্ষতাকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। তবে তিনি সামাজিক দক্ষতাকে ব্যাপক অর্থে-গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সঙ্কীর্ণ অর্থে সামাজিক দক্ষতার অর্থ মানুষের স্বভাবজ শক্তিসমূহকে সমাজের নিয়মাবলীর দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যাপক অর্থে সামাজিকতা হল 'মনের সামাজীকরণ' (socialisation of the mind)। মনের সামাজীকরণ বলতে ডিউই সামাজিক কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বভাবজ শক্তিগুলির সামাজিক বিকাশকে বুঝিয়েছেন। ডিউইর মতে ব্যাপক অর্থে সামাজিক দক্ষতা দুটি বস্তুকে বোঝায়ঃ (১) অর্থনৈতিক বিষয়ে দক্ষতা এবং (২) সুনাগরিকতা।

অর্থনৈতিক দক্ষতা ব্যক্তির উৎপাদনকারী ও পণ্যব্যবহারকারী হিসাবে দক্ষতাকে বোঝায় এবং নাগরিক হিসাবে দক্ষতা বলতে ভাল সঙ্গী হওয়া থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায়। নাগরিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, শিল্প-কর্ম উপভোগ ও শিল্পসৃষ্টি, বিরামের সময়ের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুরই স্থান রয়েছে। সুতরাং ডিউইর সামাজিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে ব্যক্তিতার বিকাশ, অর্থনৈতিক দক্ষতা, নাগরিকতার বিকাশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই স্থান রয়েছে এবং তাই এই অর্থে সামাজিক দক্ষতাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ডিউইর মত ব্যাপকভাবে অর্থ নিরূপণ না করলে সাধারণ অর্থে সামাজিক দক্ষতা কখনই শিক্ষার লক্ষ্য বলে গৃহীত হতে পারে না, কেননা তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিক দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হবে।

বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ বেগলি (Bagley)-ও সামাজিক দক্ষতা লাভকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে সামাজিক দক্ষতা বলতে তিনটি জিনিস বোঝায়: (১) অর্থনৈতিক দক্ষতা, (২) নেতিবাচক নীতি অর্থাৎ অন্যের অর্থনৈতিক দক্ষতাকে বাধা দেয় এমন ইচ্ছাকে ত্যাগ করা, এবং (৩) ইতিবাচক নীতি অর্থাৎ নিজের যে ইচ্ছা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রগতিসাধন করে না তাকে ত্যাগ করা। সামাজিক দক্ষতার এই আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় যদি পরোক্ষভাবে সমাজের প্রগতি সাধনের ধারণার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব সমাজ অবিরোধী যে কোন ইচ্ছার পূরণকেই স্থান দেওয়া হয়। তা না হলে এই লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের ও সুখভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে।

২০। শিক্ষার লক্ষ্য সমাজসংরক্ষণ

সমাজসংরক্ষণকে অনেকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, সমাজসংরক্ষণ যদিও শিক্ষার প্রধান ও অপরিহার্য কর্তব্য, তথাপি তা শিক্ষার একমাত্র কাজ হতে পারে না, কেননা সমাজের প্রগতি সাধনও শিক্ষার কাজ। তার উপরে রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের প্রশ্ন। শিক্ষার কাজ যেমন সমাজের বিকাশসাধন করা, তেমনি ব্যক্তিতার

বিকাশসাধন করাও তার কাজ। সুতরাং সমাজসংরক্ষণকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

২১। শিক্ষার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ

বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ, বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ-স্থাপনের উপায়গুলির (means of communication) অভূতপূর্ব উন্নতি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে একসূত্রে বদ্ধ করেছে এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পরের অতি নিকটে এনে উপস্থিত করেছে। এই বন্ধন ও নৈকট্য ইচ্ছা করে ও সজ্ঞানে সংঘটিত না হলেও আজ কারও সাধ্য নেই যে এদের পরিধির বাইরে যায়। আজ সর্বদেশ ও সর্বজাতিকে এই মহাসত্যকে স্বীকার করতেই হবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণও করতে হবে। তার পর বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মানুষ শুধু পরস্পরের নিকট এসে গেছে বলেই নয়, এই নৈকট্যের শ্রম-বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-জনিত বিপুল ও বহুমুখী সুবিধার জন্যও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আরও একটি কারণে এই সম্প্রীতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে শুধু মানবমঙ্গলের উপকরণসমূহ সৃষ্ট হয় নি, সমগ্র মানবসমাজের নিশ্চিত ধ্বংসের উপকরণও সৃষ্ট হয়েছে। তাই শুধু বাঁচার তাগিদেই আজ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই সত্যটি মনে রাখলে মানবসভ্যতার বিকাশের বর্তমান স্তরে এ কথা বোধ হয় খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, আজকের সমস্ত মানবীয় কর্তব্যের মধ্যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরূক করা হল সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি এই অবস্থাতেও বিশ্বমানবের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধ জীবন ও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ ব্যক্তির বিকাশ ও জাতীয় সমাজের বিকাশের উপরই বিশ্বমানবের সংরক্ষণ ও প্রগতি নির্ভর করছে এবং স্বভাবতঃই বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধও নির্ভর করছে। সুতরাং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ ব্যক্তির ও জাতীয় সমাজের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হতে পারে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্যরূপে কখনও গৃহীত হতে পারে না।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করবার পরেই যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় সে প্রশ্নটি হল শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের অব্যবহিত পরেই প্রশ্ন উঠে, কেমন করে ঐ লক্ষ্যকে বস্তুজগতে রূপদান করা সম্ভব? অর্থাৎ ঠিক করা প্রয়োজন হয়ে উঠে, কি উপায়ে নির্ণীত লক্ষ্যকে লাভ করা যায়? শিক্ষার বিষয়বস্তু হল শিক্ষার ঐ লক্ষ্যভেদের উপায়স্বরূপ। আমরা দেখেছি জীবন-দর্শনের আলোকেই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণীত হয়। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত জীবনদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক প্রভাবে অনেক সময়ে বিষয়বস্তু প্রভাবিত হলেও জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঐ সমস্ত প্রভাব কাজ করে। বিভিন্ন প্রকারের জীবনদর্শন শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারে কিরূপ নির্দেশ দেয় নিম্নে তা আলোচিত হল।

১। ভাববাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

ভাববাদ মানসিক ও আত্মিক দিক থেকেই বিষয়বস্তুর সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। শিশুর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাববাদ মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করে। সংক্ষেপে ভাববাদের নির্দেশ হল 'বিদ্যালয়ে মানবসভ্যতাকে প্রতিফলিত কর' অর্থাৎ ভাববাদ চায় যে, বিদ্যালয়ে মানবজাতির সঞ্চিত সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল বস্তুগুলি পরিবেশিত হোক। ভাববাদের মতে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্তীকরণই শিশুকে মানব জীবনের মহত্তম আদর্শানুযায়ী পরিচালিত করতে সমর্থ হবে।

স্বভাবতঃই বিভিন্ন ভাববাদী বিভিন্নভাবে মানব অভিজ্ঞতার শ্রেণীকরণে প্রয়াসী হন। নিম্নে এইরূপ প্রচেষ্টার দুটি উদাহরণ দেওয়া হল :

(ক) কোন কোন ভাববাদী মানব অভিজ্ঞতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেন : (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও (২) সামাজিক পরিবেশ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং এই শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়-বস্তুকেও দুটি ভাগে ভাগ করেন—(১) বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তুসমূহ ও (২) মানব-জীবন-সম্পর্কিত বিষয়-বস্তুসমূহ (humanities)। তাঁদের মতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে এই দুই শ্রেণীর বিষয়-বস্তুরই স্থান থাকা উচিত।

(খ) অন্য কোন কোন ভাববাদীরা আবার মানব মনের তিনটি দিকের উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে অগ্রসর হন। এই তিনটি দিক হল: (১) প্রয়াসমূলক দিক (conative aspect), জ্ঞানীয় দিক (cognitive aspect) ও অনুভূতির দিক (affective aspect)। তাঁদের মতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষ যা করে, যা জানে এবং যা অনুভব করে এই তিনেরই সমাবেশ হওয়া উচিত।

২। প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

রুশোপন্থী স্বপ্নচারী প্রকৃতিবাদীরা শিশুর বর্তমান ঝোঁক (interest), কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতার উপরই একমাত্র গুরুত্ব অর্পণ করেন। এঁরা চান শিশুপ্রকৃতির স্বাধীন, সুখময় ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। তাই তাঁরা বড়দের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কোন কিছুকেই শিশুর উপর চাপাতে চান না। এঁদের নিকটে যা-কিছুই শিশুর স্বাধীন, সুখময় ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সহায়ক তাই শিক্ষার বিষয়বস্তু।

প্রকৃতিবাদের এই চরম রূপ আজকাল আর দেখা যায় না, কেননা এর বাস্তবতা-বিবর্জিত স্বপ্নচারী মনোভাব আজকের দিনের মানুষের মনকে আর আকৃষ্ট করে না। প্রকৃতিবাদের বৈজ্ঞানিক রূপেরই প্রচলন এখন অনেকটা হয়েছে। আধুনিককালে এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার ও হাক্সলী (Huxley)। এঁদের বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত মতাবলী পরে সন্নিবেশিত হল।

৩। প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

প্রয়োগবাদী চিন্তাধারাই আজকাল পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রবল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রয়োগবাদীদের মতে নিত্য-পরিবর্তনশীল জগতে উপযুক্তভাবে বাঁচবার জন্য যা-কিছু জ্ঞান, নৈপুণ্য, মনোভাব ও আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সেই সবেরই স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা উচিত। এঁরা শিশুর জীবনকে বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎ এই দুয়েরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে চান এবং স্পষ্টতঃ বিষয়বস্তুর নির্বাচনে উপযোগিতার (utility) মাপকাঠি ব্যবহার করেন। এঁরা বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রূপে দেখেন। শিশুর জীবনের সুষম ও

বহুমুখী বিকাশসাধন এবং সমাজের প্রগতির জন্য যত রকমের কর্ম ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সব কিছুকেই এঁরা পাঠক্রমের মধ্যে স্থান দেন। এঁরা মনে করেন, কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান, মনোভাব ও আদর্শ ইত্যাদি সৃষ্ট হয় সেইগুলিই হয় স্থায়ী। প্রয়োগবাদীশ্রেষ্ঠ জন ডিউইর বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত অতি মূল্যবান ও গভীর মৌলিকতাসম্পন্ন মতাবলীর আলোচনায় আমরা একটু পরেই প্রবৃত্ত হব।

৪। বস্তুবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুবাদীরা বাস্তব জগতের সংগে শিশুর সার্থক সংগতি বিধানের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন। এই বাস্তব জগতের মধ্যে তাঁরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দুই প্রকারের জগতকেই স্থান দেন। বস্তুবাদীরা বিদ্যালয়ের জীবনের সংগে বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান একান্তভাবে দূর করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্যবস্তু ও ক্রিয়াকর্মকে বাইরের ব্যাপক জীবনের সংগে সম্পর্কিত দেখতে চান। স্বভাবতঃই এঁরা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু (প্রাকৃতিক ও সামাজিক) এবং শিক্ষার পেশাগত দিকের উপর বেশী জোর দেন। সুতরাং এঁদের মতে বাস্তব জগতের সংগে সংগতি বিধানের জন্য যা কিছু জ্ঞান, কর্ম, নৈপুণ্য, অভ্যাস ও আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সবকিছুই শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হওয়া উচিত। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদীরা (sense realists) বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও বস্তুসমূহের উপর, সামাজিক বস্তুবাদীরা (social realists) সামাজিক দিক থেকে মূল্যবান বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার উপর এবং মানবতাবাদী বস্তুবাদীরা (humanistic realists) বিষয়বস্তুগত মূল্যের জন্য প্রাচীন চিরায়ত (classical) সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

৫। মানবতাবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

যুক্তিবাদী মানবতাবাদীদের (rational humanists) নিকটে বুদ্ধির চর্চাই হল মানব শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, কেননা তাঁদের মতে বুদ্ধির মধ্যেই (উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সঙ্গে তুলনায়) মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এঁরা শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৌদ্ধিক বিকাশের মাপকাঠিই ব্যবহার করেন।

এঁদের মতে 'স্বাধীনতার উপযোগী কলাগুলির' (liberal arts) স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে, কেননা বৌদ্ধিক বিকাশে এগুলি সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এইগুলির মধ্যে আবার মানবীয় বিষয়গুলির (humanities) মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী।

নব জাগরণের প্রথম পর্যায়ের মানবতাবাদীরা বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য পাঠকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। এই সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ও মহান্ প্রাচীন জীবনের সংগে গভীর পরিচয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাচীন সাহিত্যপাঠ ও প্রাচীন ভাষা শিক্ষাই একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। এই পর্যায় শিক্ষার বিষয়বস্তু (অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে) বলতে প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষা দুটিকেই শুধু বোঝাত।

৬। জড়বাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

জড়বাদীরা ব্যক্তি ও সমাজের ইহলোকে সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য, তত্ব, কর্ম ও নৈপুণ্য ইত্যাদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করতে চান। আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে ও মানবজগতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী নন বলে তাঁরা ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে স্থান দিতে রাজী নন এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে মানসিক উৎকর্ষসাধক বিষয়গুলির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন না।

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দার্শনিক মতাবলীর সংক্ষিপ্তসার—

উপরের মতাবলীর আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারে বিভিন্ন বস্তুর উপর গুরুত্ব দেয় এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারেও বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করে।

ভাববাদের প্রবণতা হল অতীতের দিকে। অতীতের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং তার বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাপকাঠি হল মানসিক উপভোগের (appreciation)। বিশ্ব-জগতের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানতঃ দর্শকের (spectator)।

প্রয়োগবাদের প্রবণতা হল বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে। শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা এবং সমাজের প্রগতির উপর এ সর্বাপেক্ষা জোর দেয় এবং তার বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাপকাঠি হল উপযোগিতার (utility)। বিশ্বজগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানতঃ কর্মীর (door)।

বস্তুবাদের প্রবণতা হল বর্তমানের দিকে। বর্তমানের পরিবেশের উপর সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারে প্রয়োগবাদের মত উপযোগিতার মাপকাঠি ব্যবহার করে। বিশ্বজগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হল মধ্যমভাবে কর্মীর। বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার উপর এই মতবাদ প্রয়োগবাদ অপেক্ষা কম গুরুত্ব দেয়।

মানবতাবাদীরাও প্রধানতঃ অতীতাভিমুখী। তাঁরা অতীতে সৃষ্ট সাহিত্যাদির উপর সর্বাপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধাশীল এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে মানসিক বিকাশের মাপকাঠি ব্যবহার করেন। বিশ্বজগতের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মিশ্রিতভাবে দর্শকের ও ভোগীর (enjoyer)।

প্রকৃতিবাদের প্রবণতা প্রধানতঃ বর্তমানের দিকে। শিশুর বর্তমানের ঝোঁক ও চাহিদা এবং তার স্বাধীন বিকাশের উপর তাঁরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাপকাঠি হল শিশুর স্বাধীন বিকাশ। বিশ্বজগতের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মধ্যমভাবে কর্মীর।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, আলোচিত দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে প্রয়োগবাদের পরিধিই হল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎ এবং আংশিকভাবে অতীতও (যতটা বর্তমানের প্রয়োজনে লাগে) এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত। শিশু ও তার পরিবেশ দুয়ের প্রতিই তার দৃষ্টি রয়েছে। এর কর্মীসুলভ দৃষ্টিও প্রশংসনীয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের ও ভোগীর দৃষ্টিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানব জীবন শুধু কর্মেরই ক্ষেত্র নয়, তার মধ্যে দেখার, মানসিক উপভোগের (appreciation) এবং ভোগেরও (enjoyment) অবকাশ যথেষ্ট আছে। স্পষ্টতঃ প্রয়োগবাদ জীবনের এই দিকগুলির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য দিয়েছে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও শিক্ষার বিষয়বস্তু

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনের ভূমিকাই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বাদির উপর প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করতে হয়, তথাপি শেষ পর্যন্ত দর্শনকেই সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বের মূল্য নিরূপণ করে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত দর্শনের উপর নির্ভর করতে হলেও প্রত্যক্ষতঃ বিজ্ঞানের

উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়, কেন না দর্শনদ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্যের অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিপ্রয়োগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি—বর্তমানে ও অতীতে

বিষয়বস্তুর ইংরাজী প্রতিশব্দটি অর্থাৎ কারিক্যুলম (curriculum) শব্দটি হল আসলে ল্যাটিন শব্দ। এর প্রাথমিক অর্থ হল ঘোড়দৌড়ের মাঠ (race-course)। এই প্রাথমিক অর্থ থেকে এর আধুনিক অর্থের উদ্ভব হয়েছে। এর আধুনিক অর্থ অবশ্য একটি নয়। বিখ্যাত শিক্ষাসম্বন্ধীয় Dictionary of Education-এ কারিক্যুলমের নিম্নমত তিন প্রকারের অর্থ দেওয়া হয়েছে :

১। **প্রথম অর্থ**—পঠনীয় একটি ব্যাপক ক্ষেত্রে ('a major field of study') কয়েকটি পাঠ্যসূচীর (course of study) একটি সুসংবদ্ধ সমষ্টি কিম্বা কয়েকটি বিষয়ের পারম্পর্য ('sequence') যেমন, সামাজিক বিষয়বস্তুর পাঠক্রম।

২। **দ্বিতীয় অর্থ**—কোন বিদ্যালয়ে পরিবেশিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের বিশেষ সামগ্রিক পরিকল্পনা, যেমন—বি. এ-র পাঠক্রম।

৩। **তৃতীয় অর্থ**—ব্যক্তিকে সমাজজীবনের যোগ্য করে তোলবার উপযোগী কিম্বা কোন পেশার জন্য প্রস্তুত করে তোলবার উপযোগী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিবেশিত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতাসমূহ।

উপরের তিনটি অর্থের মধ্যে তৃতীয় অর্থটির প্রথমের অংশটিই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। শিক্ষাকার্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য উপরোক্ত তৃতীয় অর্থটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্তু বলতে বর্তমানে বোঝায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে যত রকমের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা হয় সেই সব-কিছুই। এই অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকারের অভিজ্ঞতাই থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন, বিষয়বস্তুকে অনেকে পাঠ্যসূচীর (course of study) সঙ্গে এক করে দেখেন; কিন্তু সে ভাবে দেখা নিতান্ত ভুল। কেননা পাঠ্যসূচী বলতে আসলে বোঝায় কোন বিশেষ শ্রেণী বা কয়েকটি বিশেষ

শ্রেণীর কিম্বা শিক্ষার্থীদের যে কোন সমষ্টির জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিষয় বা পাঠের এলাকা (area of study) সম্পর্কে শিক্ষাদানের সহায়ক প্রামাণ্য নির্দেশ। এই নির্দেশ শিক্ষাপরিচালকদের সাহায্যের জন্য রচিত হয়। স্পষ্টতঃ এই নির্দেশ আর বিষয়বস্তু একই বস্তু নয়।

বিষয়বস্তুর বর্তমানের ধারণা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল না। প্রধানতঃ নূতন সামাজিক (গণতান্ত্রিক) পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত 'নূতন শিক্ষার' (New Education) লক্ষ্যের সংগে সংগতি রেখে এবং মনস্তত্ত্বের নবোদ্‌ঘাটিত তত্ত্বাবলীর উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত (বিংশ শতাব্দীর প্রথম এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত) পুরাতন ধারণা অনুযায়ী যে বিষয়বস্তু প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) এই বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রস্তুতি তত্ত্বের দ্বারা এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হোত।

(২) আধুনিক জীবনের সংগে এর বিশেষ সংগতি ছিল না। এই বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ অতীতাভিমুখী।

(৩) শিক্ষার্থীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি, চাহিদা, প্রবণতা, আগ্রহ, সামর্থ্য ইত্যাদিকে এই বিষয়বস্তু অগ্রাহ্য করেছিল। পরিণত বয়স্কদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলতঃ এই বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছিল।

(৪) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সমস্ত শিশুর জন্য একই প্রকারের পরিণতির নির্দেশ এই বিষয়বস্তু দিত।

(৫) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনের আধুনিকতম পরিণতির সংগে এর কোন যোগ ছিল না। জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং হচ্ছে। ঐ বিষয়বস্তুতে এই পরিবর্তন আদৌ প্রতিফলিত হয় নি।

(৬) এই বিষয়বস্তুতে সামাজিক মনোভাব ও সাধারণভাবে রস (sentiment) সৃষ্টির দিকে কোন নজর দেওয়া হত না।

(৭) মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এই বিষয়বস্তু করেনি।

(৮) সুসংহত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রতি বিচ্ছিন্নবিষয়সমন্বিত এই বিষয়বস্তু কোন লক্ষ্য রাখেনি।

(৯) মানুষের উচ্চতম কাম্যবস্তুগুলির (highest values) প্রতি এই বিষয়বস্তু উদাসীন ছিল।

(১০) সুনাগরিকতার শিক্ষা এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সম্ভব ছিল না।

(১১) এই বিষয়বস্তুর নির্ধারণ, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন পরিকল্পিতভাবে সাধিত হত না।

(১২) পরীক্ষাশাসিত শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়বস্তুও পরীক্ষার প্রভাবে বিকৃত রূপ ধারণ করত।

(১৩) বৃত্তিগত বিকাশের দিকে এই বিষয়বস্তু কোন লক্ষ্য রাখেনি।

(১৪) মূলতঃ ভাষানির্ভর এই বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর ভাষাগত দিক ভিন্ন অন্য দিকের বিকাশের প্রতি প্রায় লক্ষ্য করে নি।

(১৫) অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে ভারাক্রান্ত ছিল এই বিষয়বস্তু।

(১৬) এই বিষয়বস্তুর নির্ধারণে শিক্ষকদের ও সমাজের সাধারণ নাগরিকদের কোন হাত ছিল না।

(১৭) শিশুর আত্মসক্রিয়তা ও সৃজনক্ষমতা এই বিষয়বস্তুর দ্বারা অবজ্ঞাত হত।

১৮। শিক্ষকের সৃজনক্ষমতার যোগ্য বিকাশও এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সম্ভব ছিল না।

১৯। গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কোন শিক্ষালাভ করা যেত না।

২০। আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সাধিত হত না।

২১। যোগ্যভাবে অবসর যাপনের শিক্ষা এই বিষয়বস্তু দিত না।

অতীতের বিষয়বস্তু নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ

অতীতের বিষয়বস্তুর ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুটা বিশদভাবেই আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে, পূর্বে বিষয়বস্তু

ভুল পদ্ধতি ও ভিত্তির উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হত। নিম্নে কতকগুলি ভুল পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হল ঃ

১। অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হত। শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও ব্যক্তিতার বিকাশ এই বিষয়বস্তুর লক্ষ্য ছিল না।

২। মানসিক শক্তি ও মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে প্রায়ই বিষয়বস্তু নির্ধারিত হত।

৩। অতীতের প্রতি অন্ধ ভক্তি বিষয়বস্তুর মধ্যে বহু অচল জিনিসকে স্থান দিয়েছে।

৪। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুকে অনেকভাবে বিকৃত করে তোলা হত।

৫। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময়ে বিষয়-বস্তুকে অবাঞ্ছিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

৬। পরিণত বয়স্কদের প্রবণতা ও কর্মাবলীর উপর নির্ভর করে অনেক সময়ে বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষ নির্বাচিত হয়েছে।

৭। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখবার জন্য অনেক সময় বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে তোলা হয়েছে। উদাহরণ—প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সাধারণ বিদ্যালয়ের (public schools) বিষয়বস্তু।

৮। সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী দলের অপপ্রভাবে (যেমন ধর্মযাজকদের প্রভাবে) অনেক সময়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে অবাঞ্ছিত বিকৃতি এসেছে।

৯। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির (psychological method) পরিবর্তে যৌক্তিক পদ্ধতি (logical method) অবলম্বন করে বিষয়বস্তুকে দুষ্পাচ্য করে তোলা হয়েছিল।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য আন্দোলন

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলন নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য জন্মলাভ করেছে এবং ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

১। শিক্ষানায়করা জীবন-বিচ্ছিন্ন এই বিষয়বস্তুর বহুমুখী অসম্পূর্ণতা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

২। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অংশও এর জীবন-বিমুখতার প্রতি অবিরত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন।

৩। শিক্ষাবিষয়ক গবেষকরা এর ফল সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, এই বিষয়বস্তুর আশু ফল ও দূরের ফল কোনটিই আশানুরূপ নয়। শিক্ষার মহত্তম লক্ষ্যগুলিও এর দ্বারা সাধিত হয় না।

৪। নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির উদাহরণও পুরাতন বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

(৫) শিক্ষাবিদেরা আজ ভাল করে অবহিত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ও তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত।

(৬) শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার শিক্ষাক্রিয়ার সামগ্রিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে বিষয়বস্তুকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

বিষয়বস্তু-পরিকল্পনা কাদের কাজ ?

নিত্যপরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে ও শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্বের অবিরত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে অবিরত পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের কাজে যাঁদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য তাঁদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

(১) এই কাজের নেতৃত্ব স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাসম্বন্ধীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞবৃন্দের উপর ন্যস্ত হবে।

(২) শিক্ষকদের ভূমিকাও এই কার্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) এই বিষয়ে অভিভাবকদের মতামতের মূল্যও অনেকখানি।

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। সকলেরই মত এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা, শক্তি ইত্যাদির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন। এই কার্যে ব্যাপৃত নেতৃবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেরই এ দিকের প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া কর্তব্য।

শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন কখন এবং কতবার হওয়া উচিত ?

যতদিন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন চলতে থাকবে, যতদিন ছাত্রদের সংখ্যা ও প্রকৃতি (সমাজের নূতন নূতন অংশ থেকে ছাত্র আসার জন্য) পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং যতদিন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বাবলীর পরিবর্তন ঘটতে থাকবে, ততদিন অবশ্যম্ভাবীভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের সংগে শিক্ষার বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ছোট-বড় পরিবর্তন অবিরতই চলতে থাকবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়

শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিকল্পনার কাজ বর্তমানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। নিম্নে এই পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(১) প্রথমেই রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে নির্ণয় করা প্রয়োজন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় সমাজের বিশেষ লক্ষ্যগুলিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৩) তৃতীয়তঃ, শিশুমনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের সংগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

(৪) চতুর্থতঃ, স্থানীয় শিশুদের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে পরিচয়ের প্রয়োজন।

(৫) পঞ্চমতঃ, সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে একটি সুস্পষ্ট, সুসংহত ও দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন শিক্ষাদর্শন গঠনের প্রয়োজন।

(৬) ষষ্ঠতঃ, নিধারিত দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকার্যের আকাঙ্ক্ষিত ফলসমূহের (outcomes) একটি বিশদ হিসাবের প্রয়োজন।

(৭) সপ্তমতঃ, শিক্ষার অন্যান্য মাধ্যমগুলির দ্বারা সংসাধিত ফলসমূহের একটি হিসাবের প্রয়োজন।

(৮) অষ্টমতঃ, নির্ধারিত কাম্য ফলসমূহের উপযোগী কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচনের প্রয়োজন।

(৯) নবমতঃ, পূর্বোল্লিখিত পর্যায়গুলির সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন এবং তাদের ফলাফল নির্ণয় করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও গঠনের মৌলিক তত্ত্বাবলী

শিক্ষার আধুনিকতম বিষয়বস্তুর আলোচনা হল আসলে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তুরই আলোচনা। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও তার গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই কিছুটা অবহিত হয়েছি। নিম্নে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও গঠন-সম্পর্কিত মৌলিক তত্ত্বাবলীর বিশদ পরিচয় দেওয়া হল। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সমস্ত তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজের ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য (ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ) লাভের পথ অনেকটা সুগম হবে।

(১) গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে

শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তু গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শন দ্বারা নির্ণীত লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে এবং তারই আলোকে নির্ধারিত হবে।

(২) ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সহায়ক হবে

গণতান্ত্রিক শিক্ষর চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন। সুতরাং এই শিক্ষার বিষয়বস্তু এই দুটি লক্ষ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে।

(৩) সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে ও পরিবর্ধিত করতে সাহায্য করবে

সাধারণভাবে মানবসমাজের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমাজের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্তনশীল কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করতে শিক্ষার বিষয়বস্তু সাহায্য করবে।

(৪) শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ গুণাবলীর বিকাশসাধন করবে

গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বহুমুখী ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে তৎপর হওয়ার সাথে সাথে তার বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশের বিষয়েও বিশেষভাবে সচেষ্ট হবে।

(৫) সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদার সুষমতা রক্ষা করবে

গণতান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদার সমন্বয় সাধন। সুতরাং গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তুরও লক্ষ্য হবে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার সামঞ্জস্য সাধন।

(৬) আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করার সহায়ক হবে

সমাজসচেতন নাগরিকতার উপর গণতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং এই সমাজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্যতম লক্ষ্য হবে সুনাগরিক সৃষ্টি করার কাজে সহায়ক হওয়া।

(৭) বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রয়োজনের মাপকাঠি ব্যবহার করতে হবে

মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের উপর নির্ভর না করে এবং অতীতের প্রতি অন্ধ-ভক্তিসম্পন্ন না হয়ে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তাকে খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক সবকিছুই হল প্রয়োজনীয় একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

(৮) বিষয়বস্তু যোগ্যভাবে অবসরযাপনের শিক্ষাদান করবে

যান্ত্রিক যুগ সাধারণ মানুষের কাছেও আজ অবসরের সুযোগ এনে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে আনবে। সুতরাং যোগ্যভাবে এই অবসরযাপনের জন্য শিক্ষালাভও শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত যে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহৎ জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবসর যাপনের শিক্ষালাভ

করে অবসর যাপনের পদ্ধতির প্রভাব কর্মের (work) উপর পড়ে এবং অবসর যাপনের মধ্য দিয়ে কর্মের মধ্যে যে সব সুস্থ মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সম্ভব নয় তাদের বিকাশও সম্ভব হয়। সেইজন্যও যোগ্য-ভাবে অবসর যাপনের জন্য শিক্ষালাভের প্রয়োজন।

(৯) যোগ্য বৃত্তিনির্বাচনের সহায়ক হবে

বৃত্তিশিক্ষাদান সাধারণ বিদ্যালয়গুলির কর্মের অন্তর্গত নয়। তথাপি যেহেতু যোগ্য বৃত্তি মানুষের জীবনের সুখের অন্যতম প্রধান আকর, সেইহেতু সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ এমনভাবে সাধন করতে হবে যে, সে যেন পরবর্তী জীবনে যোগ্য বৃত্তি নির্বাচন করতে এবং বৃত্তির জগতে দক্ষ কর্মী হতে সহজেই সমর্থ হয়। বহুমুখী কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান এই দিক থেকে খুবই মূল্যবান।

(১০) শিশুর ভবিষ্যতের চাহিদা অপেক্ষা বর্তমানের চাহিদার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করবে

বর্তমানের চাহিদার উপর বেশী লক্ষ্য রাখলে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে এবং ফলে ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানও সহজ হয়ে উঠবে।

(১১) বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ স্তরের লক্ষ্য দুই-ই সিদ্ধ হবে

শিক্ষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষ্য আছে যেগুলিকে শিক্ষার সর্বস্তরেই নজরে রাখতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ স্তরসমূহের (যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) বিশেষ লক্ষ্যসমূহের প্রতিও নজর রাখা প্রয়োজন।

(১২) স্থানীয় সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নজরে রাখতে হবে

জাতীয় সমাজ ও স্থানীয় সমাজ এই দুয়ের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

(১৩) প্রত্যেক স্তরের বিষয়বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে যুক্ত হবে

প্রত্যেক স্তরের শিক্ষা যেন পরবর্তী স্তরের শিক্ষার ভূমিকামাত্র না হয় সেটি দেখা প্রয়োজন, কেননা প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী রয়েছে। তবুও শিক্ষার ধারবাহিকতা বজায় রাখতে হলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে প্রতিটি স্তরের যোগ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

(১৪) সুগ্রথিত মঙ্গলময় ব্যক্তিত্বসৃষ্টি বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত

ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সুসংহত ও মঙ্গলময় হওয়া প্রয়োজন। সর্বদিকের বিকাশের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র বর্তমান থাকা উচিত। সুসংহত ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বিষয়বস্তুকে যতদূর সম্ভব সম্পৃক্ত (correlated), একীভূত (fused), ও সংহত (integrated) করা প্রয়োজন। আর দেখতে হবে ব্যক্তির সমস্ত প্রকারের আচরণই যেন মঙ্গলময় হয়।

(১৫) বিষয়বস্তু দেশের আইনানুগ হওয়া উচিত

বিষয়বস্তুর গঠন দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিষ্পন্ন করা উচিত।

(১৬) বিষয়বস্তু জীবনভিত্তিক হবে

বিষয়বস্তু সমাজের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হবে।

(১৭) বিষয়বস্তু কর্মভিত্তিক হবে এবং সর্বপ্রকারের কর্ম তার অন্তর্ভুক্ত হবে

কর্মের (activity) মধ্য দিয়েই শিশুরা প্রধানতঃ শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিষয়বস্তু কর্মভিত্তিক হবে। জীবনের সর্বদিকই শিক্ষার পরিধির মধ্যে পড়ে বলে শিক্ষার্থীর সর্বদিকের কর্মই বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হবে।

(১৮) সৃজনাত্মক দিকের বিকাশ বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত

বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিখনের (learning) সৃজনমূলক দিকের বিকাশ হওয়া উচিত। বিশেষ করে সৃজনমূলক চিন্তার বিকাশ বিষয়বস্তুর অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

(১৯) বিষয়বস্তুকে শিক্ষামূলক সমস্ত কর্মের মধ্যে খেলার সত্তাকে (spirit) সঞ্চারিত করতে হবে

খেলার মূল কথা হল স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বাধীনতা ও আনন্দ। সমস্ত শিক্ষণীয় কর্মের মধ্যে খেলার এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।

(২০) পরিণমনের (maturation) স্তর নির্ণয় করে বিষয়বস্তুর অন্তর্গত সমস্ত কর্মকে নির্বাচন করতে হবে

পরিণমনের স্তরের সংগে সংগতিপূর্ণ কাজ আনন্দদায়ক হয় এবং প্রকৃত শিক্ষারও (অর্থাৎ বৃদ্ধি ও বিকাশের) সহায়ক হয়।

(২১) যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা উচিত

সুস্থ যৌন বিকাশ মানুষের সাধারণ বিকাশধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই যৌনবিকাশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময় হল কৈশোর (adolescence)। সুতরাং কৈশোরে সুষ্ঠু যৌনবিকাশের জন্য উপযোগী যৌন শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

(২২) উপযুক্ত দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে

উত্তম দৈহিক ভিত্তির উপরই মহৎ জীবনের সৌধ নির্মাণ করা সম্ভব। সুতরাং দৈহিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা উচিত।

(২৩) মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ অবহিত হতে হবে

সুসংহত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে ইতিমধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। তবুও আজকের দিনের মানুষের মনের উপর বিরাট চাপের কথা মনে রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

(২৪) বিষয়বস্তুর অন্তর্গত কর্মাবলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত

গণতান্ত্রিক সমাজে বাঁচার শিক্ষা গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে লাভ করা যায়। সুতরাং গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির দ্বারা বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মই পরিচালিত হওয়া উচিত।

(২৫) বিষয়বস্তু সমাজের সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত

যদিও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এবং তাদের ঐ কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগও যতদূর সম্ভব দেওয়া উচিত।

(২৬) নির্বাচিত কর্মাবলীর মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে

প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের মূলকথা হল সহযোগিতা। সুতরাং গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান যতটা কমান যায় ততটাই ভাল।

(২৭) বিষয়বস্তুকে অবিরত পরিবর্তিত করতে হবে

নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে বিষয়-বস্তুকে অবিরত পরিবর্তিত করতে হবে।

(২৮) বিষয়বস্তুকে যাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তাঁদের সকলকেই নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে ভালভাবে বুঝতে হবে

শিক্ষাপরিচালক (administrator), তত্ত্বাবধায়ক (supervisor), ও শিক্ষক প্রত্যেকেরই নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে ভালভাবে বোঝা উচিত, কেননা তা না হলে বিষয়বস্তু শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপারে পর্যবসিত হবে।

(২৯) বিদ্যালয়ে পরীক্ষার পর বিষয়বস্তু নির্বাচিত করতে হবে

বিষয়বস্তু নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যালয়ের পরিবেশে তাকে ভালভাবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ অচল হলে তত্ত্বের দিক থেকে অনিন্দ্যসুন্দর বিষয়বস্তুও মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩০) বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর জীবনে সক্রিয় (functional) হতে হবে

বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে হবে,

তার প্রতি মুহূর্তের বাঁচার অংশীভূত হতে হবে, তাকে উন্নততর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তার শিখনক্রিয়াকে আনন্দপূর্ণ ও সংহত করে তুলতে হবে, তার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের বিকাশের সহায়ক হতে হবে এবং সমাজজীবনে নিজ অবস্থান সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলতে হবে।

(৩১) বিষয়বস্তুকে প্রয়োগ করবার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে

বিষয়বস্তুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় যোগ্য শিক্ষকের হাতে। সুতরাং যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন বিষয়বস্তুর সমস্যাসমাধানের অন্তর্গত একটি প্রধান বিষয়।

(৩২) বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সকল অংশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহনশীলতা ও প্রেমের ভাব জাগরূক করতে হবে

গণতন্ত্রের দুটি মূল স্তম্ভ হল সহনশীলতা ও প্রেম। পরমতসহিষ্ণুতা ও পরকে নিজের মত দেখা ও ভালবাসা হল প্রকৃত গণতন্ত্রের দুটি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে জীবনের সর্বস্তরে এই দুটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

(৩৩) বিষয়বস্তুকে সামাজিক জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং তাদের নিরাকরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে

শিক্ষা সার্থক সামাজিক জীবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। কিন্তু সমাজের ভাল-মন্দ সকল কিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করলে চলবে না। সমাজের প্রগতি সাধনের জন্য তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে অবহিত করে তুলতে হবে এবং ত্রুটি দূরীকরণের জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৩৪) বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-সম্পর্কিত পরিচালনার (educational guidance) যোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে

আজকের দিনে শিক্ষার বিষয়বস্তু, বহুবিসর্পিত ও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ধারাও ভিন্ন। সমাজের জীবনধারাও হয়ে উঠেছে অতি জটিল ও অবিরত পরিবর্তনশীল। এই অবস্থায় যোগ্য

বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না।

(৩৫) সমাজের অন্যান্য সংস্থার শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে

পরিবার, ধর্ম, সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, যুব প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ইত্যাদির শিক্ষাসম্পর্কিত প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় করতে হবে।

(৩৬) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কতকগুলি একেবারে নূতন বিষয়কে বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করতে হবে

আজকের দিনে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত গতিতে চলেছে। ফলে অনেক নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কতকগুলি নূতন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে যেমন, যোগ্য গৃহীর শিক্ষা, দক্ষ পণ্যক্রেতার শিক্ষা, নিরাপত্তার শিক্ষা ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার শিক্ষা।

উপরের নীতিগুলি সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন। ঐ নীতিগুলি মোটেই পৃথক নয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নীতি বা নীতিসমষ্টি অন্য একটি বা একাধিক নীতির অন্তর্গত। তবুও নীতিগুলিকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই জন্য যে, পৃথক উপস্থাপনের ফলে ঐ গুলির প্রতি বেশী নজর দেওয়া ও সুবিচার করা সম্ভব হবে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলি প্রধানতঃ প্রয়োগবাদের আলোকেই নির্ণীত হয়েছে।

শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর স্থান

শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর স্থানের ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার দিয়েছি। এস্থলে শুধু সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্রিয়ায় লক্ষ্যের স্থানও যেমন মূল্যবান, বিষয়বস্তুর স্থানও তেমনি মূল্যবান। কেননা বিষয়বস্তু হল শিক্ষার উপায় (means) একমাত্র যার সাহায্যেই শিক্ষার লক্ষ্য (end) সাধিত হয়। উপায় এবং পরিণতি বা লক্ষ্যের সুগভীর ঐক্যের কথা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। যে কোন উপায় থেকে যে কোন পরিণতির

উদ্ভব হয় না এবং যে কোন পরিণতি যে কোন উপায় থেকে উদ্ভূত হয় না।

বিষয়বস্তুর বিবর্তনের ইতিহাস

(১) আদিম যুগের বিষয়বস্তু

আদিম যুগের শিক্ষার দুটি অংশ ছিল—একটি ব্যবহারিক এবং অন্যটি তত্ত্বগত। সে যুগের ব্যবহারিক শিক্ষা (খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়সৃষ্টির শিক্ষা) অনুকরণের মাধ্যমেই প্রধানতঃ সংঘটিত হত। সুতরাং শিক্ষার এই অংশের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রকারের কর্ম, যে সবের মাধ্যমে আদিম মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গতি সাধন করত। প্রথম স্তরে এই অনুকরণ অজ্ঞাতসারেই চলত, কিন্তু দ্বিতীয় এবং উন্নততর স্তরে অনুকরণ চলত সজ্ঞানে। শিক্ষার এই অংশের জন্য পৃথক কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। এই আদিম স্তরেও মানুষ, বিশ্বের মৌল সত্তা সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করেছিল এবং অনেক তত্ত্বকথাও জড়ো করেছিল। বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে এই তত্ত্বকথা ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শিশুদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে মানবেতিহাসের সেই অপরিণত স্তরেও শেখান হত। সুতরাং শিক্ষাদান এক্ষেত্রে ছিল সজ্ঞান এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। তবে তত্ত্বগত শিক্ষা-চলত মৌখিকভাবে, কেননা লিখিত ভাষার তখনও জন্ম হয় নি। সুতরাং শিক্ষার এই অংশের বিষয়বস্তু ছিল আদিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ও তাদের সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ।

(২) সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তু

আদিম সমাজের অপরিণত মৌলিক বিশ্বাসগুলি থেকেই ক্রমে প্রাকৃতিক ধর্মগুলির (যেমন, প্রাচীনতম গ্রীক ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম), প্রাথমিক দর্শনের ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল এবং তাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমে ঐগুলিকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীরও (পুরোহিত শ্রেণীর) উদ্ভব হয়েছিল এই লিখিত বিদ্যাকে আয়ত্ত করে সমাজের শিশুদের দীক্ষিত করবার জন্য। সভ্যতার এই পর্যায়ে প্রথম দেখা দিয়েছিল বিদ্যালয়। এখন থেকে লিখিত ভাষা ও লিখিত বস্তুই শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে লাগল। (অবশ্য

ভারতবর্ষের হিন্দুরা বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে প্রথম দিকে বিষয়বস্তুকে মৌখিক ভাষাতেই সঞ্চিত রেখেছিল।) এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত সভ্যতাগুলির শিক্ষাব্যবস্থায় উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হয়েছিল।

গ্রীকদের শিক্ষার বিষয়বস্তু

আদিম ও প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তু যেমন প্রাত্যহিক জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং জীবনে সক্রিয় ছিল, গ্রীকদের বেলায়ও তেমনি বিষয়বস্তু ছিল জীবনোদ্ভূত ও জীবনে সক্রিয়। গ্রীকদের মধ্যে এথেন্সবাসীদের দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী। তারা তাদের জীবনে কার্যকরী এমন এক বিষয়বস্তু সৃষ্টি করেছিল যার ব্যাপ্তি ও সুষমতা আজও বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সৌন্দর্যগত দিক প্রভৃতি মানব প্রকৃতির প্রায় সর্বদিকের বিকাশেরই ব্যবস্থা ছিল।

বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য গ্রীকরা সাতটি 'স্বাধীনতার বিদ্যার' (liberal arts) ব্যবস্থা করেছিল। তাদের জীবনে এই সাতটিরই ব্যবহারিক মূল্য ছিল এবং এদের নাম হল—ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা, পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সংগীত। গ্রীকদের নিকটে এই সাতটি বিদ্যার মধ্যে প্রথম তিনটিই ছিল বেশী মূল্যবান। কিন্তু এই মূল্য আরোপ তারা এগুলির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্য করে নি। তারা মনে করত যে, এই তিনটির সাহায্যে মানুষের বুদ্ধি বা আত্মাকে গঠিত করা যায়। তাদের ধারণা ছিল যে, এই তিনটি বিদ্যা ছিল মানব মনের মৌলিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষের চারটি বিদ্যার মধ্যে গণিতের দুটি বিভাগকে গ্রীকরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, কেননা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও গ্রীকরা ভাবত যে, গণিতে শুধু বিমূর্ত চিন্তার অবকাশ থাকায় তার সাহায্যে মানুষ পরিবর্তনশীল মূর্ত জগৎ থেকে বিশ্বের মৌল সত্তার জগতে প্রবেশ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুকে গ্রীকরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত না, কেননা বিজ্ঞানের সমস্ত কাজ পরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যেই নিহিত থাকে।

দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থাও গ্রীকরা করেছিল, যদিও তাদের মনে দেহের

অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। দৈহিক শিক্ষার জন্য গ্রীকরা কতকগুলি পরিচিত খেলার ব্যবস্থা করেছিল যেমন, দৌড়ান, লাফান, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, বর্শাছোঁড়া ইত্যাদি। প্রথমে এই খেলাগুলির সামরিক মূল্যের উপর জোর দেওয়া হত। কিন্তু পরে নৈতিক ও সৌন্দর্যগত দিক থেকেও এদের মূল্য নির্ধারিত হত।

সৌন্দর্যগত শিক্ষার প্রতি গ্রীকদের আকর্ষণ বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করত। পরিমিতি (moderation) ও সুষমতা (proportion) এই দুটি ধারণার মধ্য দিয়েই তাদের সৌন্দর্যবোধ বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছিল। এই দুটি ধারণাকে তারা জীবন ও শিক্ষার সর্বদিকেই প্রয়োগ করত। সুতরাং এটি বোধ হয় বল্লে ভুল হবে না যে, গ্রীকদের সমস্ত শিক্ষাই ছিল মূলতঃ সৌন্দর্য-বোধের শিক্ষা। তারা দেহের সুষম বিকাশ চাইত এবং দেহ ও মনের এবং সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ চাইত। কোন দিকেই তারা অপরিমিত বৃদ্ধি বা বিকাশ পছন্দ করত না। সৌন্দর্যগত শিক্ষায় সংগীতের স্থান গ্রীকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তারা ভাবত যে সংগীতের মূল কথা হল তান (rhythm) এবং এই তানের প্রকাশ শুধু সংগীতে নয়, পদ্যে এবং নৃত্যেও দেখা যায়। সুতরাং তাদের মতে দৈহিক, ও বৌদ্ধিক শিক্ষার মধ্যে ও সংগীতের মৌল সত্তা বর্তমান থাকে।

নৈতিক দিকের শিক্ষার প্রতিও গ্রীকদের কম আকর্ষণ ও যত্ন ছিল না। নৈতিক শিক্ষাকে তারা শিক্ষার অন্যান্য দিকের সঙ্গে অত্যন্ত সুষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

গ্রীকদের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কিন্তু একটি মহৎ ত্রুটি ছিল। তারা বিষয়বস্তুর মধ্যে বৃত্তিগত শিক্ষা বা হাতের কাজের জন্য কোন ব্যবস্থা করে নি। এর কারণ ছিল এই যে, গ্রীক সমাজে (অর্থনৈতিক) উৎপাদনের কাজ দাসদের উপর ন্যস্ত ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষার এই ত্রুটি পরবর্তী সমস্ত যুগের শিক্ষার উপর প্রভূত কুপ্রভাব বিস্তার করেছে এবং ফলে বর্তমান যুগেও বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অনাসক্তি যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

রোমকদের শিক্ষার বিষয়বস্তু

রোমকরা গ্রীকদের বিষয়বস্তুই গ্রহণ করেছিল এবং এই বিষয়বস্তু

তাদের জীবনে বেশ সক্রিয়ও ছিল। অবশ্য তার সঙ্গে একটি নূতন বিষয়ও তারা যোগ করে নিয়েছিল। সেটি হল গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা। এমনি করে সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুর মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা (bilingualism) শিক্ষার স্থান হয়েছিল।

মধ্যযুগের বিষয়বস্তু

মধ্যযুগের প্রথম দিকে খৃষ্টানরা ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়সমূহকেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছিল। এমনকি বেশীর ভাগ সময়ে অন্যান্য সমস্ত বিষয়কেই বাদ দিত। দৈহিক বিকাশের স্থানে তারা দেহকে অবিরত শাসন করত এবং 'স্বাধীনতার বিদ্যাগুলিকে' (liberal arts) তারা যতদূর সম্ভব পরিহার করে চলত। মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্কবিদ্যার পুনরায় মূল্য বেড়েছিল, কেননা ধর্মযাজকরা তখন বুঝতে পেরেছিল যে, ঐগুলিকে তারা খৃষ্টীয় দর্শনের সমর্থনে ব্যবহার করতে পারবে।

নবজাগরণ ও ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগের বিষয়বস্তু

নবজাগরণের শিক্ষার প্রথম স্তরে গ্রীকদের শিক্ষার মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্তরের বিষয়বস্তু জীবনের সর্বদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ণীত হয়েছিল। তবে তার মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য। কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীকদের মহত্তর জীবনের সংগে পরিচয় লাভ।

নবজাগরণের শিক্ষার পরবর্তী স্তরে প্রথম স্তরের শিক্ষাদর্শের ও বিষয়বস্তুর বিকৃতি ঘটেছিল। সর্বাংগীণ বিকাশের আদর্শ তখন পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং লাতিন ও গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ বহিরঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হত। এমনকি কোন কোন স্থানে গ্রীক ভাষা শিক্ষাও প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং লাতিন ভাষা ও সাহিত্য চর্চা মহান্ বাগ্মী সিসারোর (Cicero) লেখার আংগিকের চর্চায় পর্যবসিত হয়েছিল।

ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগে প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তুতেই পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠের প্রয়োজনীয়তার জন্য দেশীয় ভাষা পঠনের

উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করা হত। কিন্তু উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য পাঠই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে করা হত। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে নবজাগরণের শিক্ষার বিকৃত রূপেরই প্রাধান্য ছিল এবং সেই প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্তু

এই দুই শতাব্দীতে সমাজজীবনের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এবং সেইজন্য প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও নানাদিক থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমস্ত প্রতিবাদের মূল কথা ছিল শিক্ষার লক্ষ্যকে ও বিষয়বস্তুকে বাস্তবমুখী করা। শিক্ষার এই বস্তুবাদী আন্দোলন প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদে, সামাজিক বস্তুবাদে ও মানবতাবাদী বস্তুবাদে। ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তুবাদ বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুসমূহকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল। সামাজিক বস্তুবাদ দেশভ্রমণ ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য পাঠের অপেক্ষা মূল্য দিত। মানবতাবাদী বস্তুবাদ মহাকবি মিল্‌টনের মাধ্যমে এক সুবিস্তৃত বিষয়বস্তুর রূপাঙ্কণ করেছিল। এই বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ভাষা, গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য এবং নানা প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্তু

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের (humanities) দ্বন্দ্ব যুদ্ধ খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। শেষে হার্বার্ট স্পেন্সর ও হাক্সলী প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের ও বিজ্ঞানসমর্থকদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞানের (প্রাকৃতিক) স্থান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'নব্য মানবতাবাদ' (New Humanism) নামে একটি আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছিল। এই মতবাদ লাতিন অপেক্ষা গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত। তবে মানবতাবাদীরা গ্রীক সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করত গ্রীক জীবনের মহৎ আদর্শের জন্য, শুধু গ্রীক্ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে নয়।

প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট এই মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ উইলিয়াম হ্যারিসও এই দলভুক্ত ছিলেন তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মতবাদের শেষ রশ্মিও অন্তর্হিত হয়। তার পর থেকে পুনরায় মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে, যত দিন না পর্যন্ত ঐ তত্ত্বটি থর্ণডাইক (Thorndike) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের দ্বন্দ্ব অনেকটা প্রশমিত হয়েছে মানব জীবন সম্পর্কিত নূতন বিজ্ঞানসমূহের আবির্ভাবের জন্য। এই বিজ্ঞানগুলির নাম নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব। মানব সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞানগুলি ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল ও আধুনিক ভাষাসমূহের স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। ক্রমে চারুশিল্পসমূহ, দৈহিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (health education), পেশাগত শিক্ষাসম্পর্কিত বিষয় ও কর্মাবলী ও সাধারণভাবে কর্মের (activity) স্থানও বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। পাঠক্রমবহির্ভূত খেলাধূলা, নানাপ্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও নানাপ্রকারের 'হবি'-রও স্থান উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে সামাজিকতা, নাগরিকতা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের শিক্ষাসম্পর্কিত জ্ঞান ও কর্মাবলী ইত্যাদিও শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান পেয়েছে। স্বভাবতঃই এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধানতঃ কাজ করেছে নবাবির্ভূত চারটি সামাজিক শক্তি—জাতীয়তাবাদ, শিল্পবিপ্লব, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধু নূতন বিষয়বস্তুর আবির্ভাবই হয় নি, তার মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাস সম্বন্ধে নানারকম সৃজনাত্মক জল্পনা-কল্পনা এবং প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে এই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচয় দানের চেষ্টা করা হল।

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নূতন ধারণার প্রবর্তন

প্রায় প্রথম থেকে সমস্ত সভ্য দেশেই শিক্ষার বিষয়বস্তু বিভিন্ন বিষয়

(subjects) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বিষয়গুলি হল অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানের সমষ্টি এবং তর্কবিদ্যাসম্মতভাবে বিন্যস্ত। অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা-সমূহের বিন্যাসের প্রয়োজন হয়েছিল সংহতি ও কার্যকারিতার দিক থেকে এবং বিশ্ব সম্বন্ধীয় এক বিশেষ ধারণার জন্য তর্কবিদ্যার নীতিগুলির উপর নির্ভর করে এই বিন্যাস সাধিত করা হয়েছিল। পূর্বে মনে করা হত বিশ্বের গঠনের মধ্যেই তর্কবিদ্যার নীতিগুলির সমর্থন পাওয়া যায়, কেননা বিশ্বের গঠনই (structure) হল যুক্তিসম্মত (logical)। এই অবস্থায় বিষয়বস্তু পূর্ব হতেই নির্ধারিত হত এবং তার মধ্যে একটা অনমনীয়তাও থাকত। বিশ্বের মৌল প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিশুপ্রকৃতির সংগে এর সংগতি প্রায় আদৌ থাকত না। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় অব্যাহতভাবে চলে এসেছে এবং বিংশ শতাব্দীতেও কিছুটা রয়ে গেছে। তবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত ঐ ধারণা ক্রমাগত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং পরিশেষে প্রায় সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ শিক্ষার গণতান্ত্রিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের সমর্থকদের সমবেত প্রচেষ্টায়। এঁদের প্রথম পথ-প্রদর্শক হলেন রুশো এবং সর্বাপেক্ষা পরিণত তাত্ত্বিক হলেন জন ডিউই। শেষোক্ত শিক্ষানায়কদের বিপুলভাবে প্রভাবশীল মতাবলীর (বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয়) সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হল।

রুশোর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মতাবলী

বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য রুশো যদিও শুধু 'রবিনসন ক্রুশো' পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন, তথাপি বহুমুখী কর্মকেই তিনি বিষয়বস্তুর মৌল অংশ বলে মনে করতেন। কেন না, সংগীত, অংকন, দৌড়ঝাঁপ, শিকার, হাতের কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর বহুমুখী বিকাশ সাধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৌতূহল উদ্রেকের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা এই দুইটি মূলসূত্রের উপর নির্ভর করেই রুশো 'বিষয়বস্তু' নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার জন্য অবশ্য রুশো পরোক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক শিক্ষা মূলতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত হোক্ এমনি নির্দেশ যদিও রুশো দিয়েছিলেন, তথাপি নৈতিক সামাজিক শিক্ষার বেলায় তিনি সেই মত পরিবর্তিত করেছিলেন।

জন ডিউইর বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত মতাবলী

জন ডিউইর মতে বিষয়বস্তু (subject-matter) হল সেইসব বস্তু যেগুলি কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ অবস্থায় লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য জানা প্রয়োজন। 'পাঠ্যবস্তু' হল শিক্ষণীয় বিষয় (subject) যেগুলিকে বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে শেখান হয়। আসলে বিষয়গুলি হল তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত অতীত জ্ঞানের সমষ্টি। ডিউইর মতে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত করে নিয়ে যেতে হবে। সেই স্তরগুলি হল: ১। বস্তুকে আয়ত্তে আনার জ্ঞান, ২। অপরের নিকট হতে লাভ করা তথ্য এবং ৩। বিজ্ঞান। অর্থাৎ প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে। তারপর শিখতে হবে পরের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সর্বশেষে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। তবে প্রত্যেকটি স্তরের কাজ তার পরবর্তী স্তর বা স্তরগুলিতে চলবে এবং বিজ্ঞান হল স্পষ্টতঃ বিষয়-বস্তুর চরম পর্যায়। শেষের স্তরে অবশ্য সকল শিক্ষার্থী নাও পৌছাতে পারে।

শিক্ষকের কাজ হল পাঠ্যবস্তুকে শিশুদের শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা, কেননা পাঠ্যবস্তু পরিণত বয়স্কদের বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু শিশুদের বিষয়বস্তু নয়। পাঠ্যবস্তুর নির্বাচনে প্রকৃত 'সামাজিক' ও 'মানবীয়' মাপকাঠি ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ দেখতে হবে কোন্ কোন্ বিষয় অপরিহার্য এবং সমাজের প্রয়োজন মেটায় ও তার অগ্রগতির পথ সুগম করে এবং কোন্ কোন্ বস্তু সমাজের সমস্ত মানুষের প্রয়োজনে লাগে, কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে না। শিক্ষার বিষয়বস্তুর শুধু বৌদ্ধিক ও সামাজিক দিকই নেই, তার একটা মূল্যের দিকও (value aspect) আছে। মূল্যায়ন দু' রকমের হতে পারে। এক প্রকারের মূল্যায়ন বস্তুকে তার নিজের জন্য গ্রহণ করে, আর এক প্রকারের মূল্যায়ন হিসেব করে দেখে বস্তুটি কোন্ কোন্ প্রয়োজনে লাগবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়। তাদের এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যে, তারা যেন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। বিষয়গুলিকে এইভাবে দেখার স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নূতন প্রয়াসসমূহ

বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেই শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের মত বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সুতরাং সেখানকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রয়াস চলেছে তাদের সংগে কিছু পরিচয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। নিম্নে সেই পরিচয় প্রদান করা হল।

প্রাথমিক স্তর

অধ্যাপক ক্যাণ্ডেলের মতে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তুর বিন্যাস সম্বন্ধে তিন প্রকারের মত ও প্রচেষ্টা প্রচলিত রয়েছে। বিষয়বস্তুর এই তিন প্রকারের বিন্যাসের নাম হল—(১) বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু, (২) শিশুকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ও (৩) সমাজকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু।

বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু হল বিষয়বস্তুর অতীতাগত রূপ। বর্তমানে এই প্রকারের বিষয়বস্তুর প্রধান সমর্থক হলেন অধ্যাপক বেগলি (Bagley) প্রমুখ 'মূলবস্তুবাদীরা' ('essentialists')। এঁরা বলেন যে, শিক্ষার মৌল কর্তব্য হল মানবজাতির অতীতের সঞ্চিত ঐতিহ্যকে নবজাতকের মধ্যে সঞ্চালিত করে দেওয়া। এঁদের মতে, বিষয়গুলি হল মানুষের 'বৌদ্ধিক মূলধন' ('intellectual capital') যার সাহায্যে মানুষ নূতন জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় এবং বিষয়গুলির মধ্যে মানুষের সেই সব মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে যেগুলি প্রয়োজনীয় বলেই কালের সম্মার্জনীর হাত থেকে বেঁচে রয়েছে। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তুর ভিত্তিরূপে বিষয়গুলিকেই গ্রহণ করা উচিত। এঁদের মতে শিশুর চাহিদা ও ঝোঁক এবং সামাজিক পরিবর্তন এগুলির কোনটার উপর নির্ভর করেই বিষয়বস্তু গঠিত হওয়া উচিত নয়। কেননা তাহলে শিক্ষা পরিবর্তনের ঘূর্ণীপাকে পড়ে স্থির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে।

শিশুকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু শিশুর ঝোঁক, চাহিদা, প্রবণতা ও শক্তি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গঠিত হয়। শিশু তার ইচ্ছা, প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী নানা সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হয় এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ করে। এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্যকে সুবিন্যস্ত করলে বিষয়গুলির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ এখানে বিষয়গুলি হল শিশুর

কর্মের উপজাত ফল, তার প্রধান উপজীব্য নয়। শিশুর বিভিন্ন কর্মই হল এখানের প্রকৃত বিষয়বস্তু।

সমাজকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু (Community-centred) শিশুর সামাজিক কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতাসমূহকে অবলম্বন করে গঠিত। এখানেও বিষয়গুলিকে সরাসরি গ্রহণ করা হয় না। স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন বিষয় অনুধাবন বা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মৌলিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসমূহ শিশুরা আয়ত্ত করে। এই প্রকারের বিষয়বস্তুর সমর্থকেরা বলেন যে, বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল সমস্যাকীর্ণ বর্তমান জগতের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য শিশুদের উপযুক্তভাবে গঠন করে তোলা।

মাধ্যমিক স্তর

প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মানবীয় সেই সব আদান-প্রদান ও প্রকাশের হাতিয়ার (tools of expression and communication) আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয় যেগুলির সহায়তায় তারা সমাজের সাধারণ অভিজ্ঞতাসমূহে যোগ্যভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার এই ভিত্তির উপর মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষার কাঠামো তৈরী করা হয় তার উদ্দেশ্য হল দুটি: (১) শিক্ষার্থীরা যে সমাজের অংশীভূত সেই সমাজের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম অনুধাবন করতে এবং সেই সবের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে তাদের সাহায্য করা এবং (২) পরবর্তী জীবনের বিশেষ কর্মের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন ও প্রস্তুত করা। শিক্ষার এই স্তরে শিক্ষার্থীদের জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণের প্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরের মত এখনও অগ্রসর হয় নি। এই স্তরের বিষয়বস্তুর মধ্যে এখনও বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির স্থান যথেষ্ট প্রকট রয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর নবায়নের জন্য প্রচেষ্টা নানা দিক দিয়ে চলেছে। একদিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বেশী করে স্থান দেবার চেষ্টা চলেছে এবং বিষয়বস্তুগুলিকে আরও জীবন-সক্রিয় (functional) করবার চেষ্টা চলেছে। অন্যদিকে সমাজ জীবনের নূতন নূতন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন নূতন পাঠ্যবস্তুর সন্নিবেশ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের 'সাধারণ শিক্ষা' (general education) দেবার চেষ্টা চলেছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত প্রকারের বিষয়বস্তু আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে সাতটি হল প্রধান:

(১) সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু (correlated curriculum), (২) মিলিত বিষয়বস্তু (fused curriculum), (৩) কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু (core curiculum), (৪) একীভূত বিষয়বস্তু (unified curriculum), (৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু (experience curriculum), (৬) কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু (activity curriculum) ও (৭) চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু (need-centred curriculum)। তবে সমস্ত প্রকারের নূতন বিষয়বস্তুর লক্ষ্য হল প্রধানতঃ একই—শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সংহত করা (integrate) এবং শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্যকরী করে তোলা। বিষয়বস্তুকে সংহত করার প্রয়োজন এই জন্য অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং মানুষের মন জ্ঞানকে সংহতভাবেই গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবমুখী আধুনিক মানুষের মন বিষয়বস্তুকে শুধু সংহত করতে নয়, শিশুর জীবনের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করতে চেয়েছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হল।

(১) সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মাণ শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট ও তাঁর শিষ্যরা বিষয়-বস্তুকে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও নানাভাবে বিষয়বস্তুকে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। হার্বার্ট ও তাঁর শিষ্যরা বিষয়বস্তুকে সম্পৃক্ত করার দাবী প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। বর্তমানে কিন্তু বিশ্বের ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অখণ্ডতার উপরও সমান গুরুত্ব অর্পণ করা হয়।

সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক (functional relationships) স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। যেমন বাংলা-সাহিত্যের সংগে বাংলার সাধারণ ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করে পড়ান যায়। তবে যেহেতু সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত নিবিড় নয়, সেইহেতু সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে সার্থক হতে পারে না।

(২) মিলিত বিষয়বস্তু

বিচ্ছিন্ন বিষয়নির্ভর বিষয়বস্তুর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এই প্রচেষ্টাটিও করা হয়েছে। এখানে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের

চেষ্টা করা হয়নি, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে ব্যাপক বিষয়বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যাকে সম্মিলিত করে সাধারণ বিজ্ঞানরূপ এক ব্যাপক বিষয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের বেলায়ও অনুরূপ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার সমগ্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের স্থানে কয়েকটি ব্যাপক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যেমন, মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক পাঠসমূহ (social studies) ইত্যাদি। তবে কতকগুলি পৃথক বিষয়কে মিলিত করলেই শিশুর জীবনের সংগে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে না। এখানে যোগ্য শিক্ষকের কৃতিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়—কেননা শিক্ষকের রুচি, প্রবণতা ও শিক্ষা এই পরিবর্তনের অনুকূল না হলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

(৩) কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা প্রচলিত আছে এবং নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে। সুতরাং এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য পরিচয় দেওয়া ঠিক সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বোধ হয় সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই প্রকারের বিষয়বস্তুতে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী ব্যাপক বিষয়নির্ভর বিষয়বস্তু বা সমস্যাসমূহকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু রচনা করা হয়। অনেকের মতে আদর্শ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে বিষয়গুলিকে (subjects) পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যাসমূহকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের বেশ একটা বড় অংশ এর জন্য নির্ধারিত করা প্রয়োজন।

(৪) একীভূত বিষয়বস্তু

একীভূত বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন বিষয়ের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত বিষয়বস্তুকে এক করে তোলা হয়। বিষয়ের ব্যবধান নিরসনের প্রচেষ্টায় সাধারণতঃ বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করবার জন্য সংগঠনের 'ইউনিট পদ্ধতি' (unit method of organisation) ব্যবহার করা হয়। এই ইউনিটগুলিকে নানা-প্রকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গঠন করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর গঠিত 'ইউনিটগুলির' মধ্যে অনেক সময় মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রজেক্ট

পদ্ধতি ও ডাল্টন পদ্ধতির মত বিষয়বস্তুকে গঠিত ও উপস্থাপিত করবার অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত পুরাতন পদ্ধতি থেকেই এই 'ইউনিটের' জন্ম। ইউনিটের সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য কয়েকপ্রকারের আছে। এক রকমের ইউনিটে বিষয়বস্তুর মধ্যেই একীকরণের ভিত্তি রয়েছে এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাস সেখানে যুক্তিনির্ভর। দ্বিতীয় প্রকারের ইউনিটে একীকরণের ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর মনোমত কোন কেন্দ্রীয়বস্তু (central theme of pupil interest)। এখানে যে কোন বিষয় থেকে বিষয়বস্তুকে সংগ্রহ করা যায়। আর একরকমের ইউ-নিটের নাম হল 'অভিযোজনের ইউনিট' (unit of adjustment)। এই ইউনিটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটি হল কতকগুলি পরিকল্পিত ও সম্মিলিত (co-ordinated) কর্মের সমষ্টি যেগুলিকে শিক্ষার্থী কোন বাস্তব অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য সম্পাদন করে। এখানে একীকরণের ভিত্তি হল শিক্ষাক্রিয়ার অভিলষিত ফল।

(৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু

অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর কাজ শিশুকে নিয়েই সুরু হয় এবং তার সেই সব শক্তি, ঝোঁক, প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে রচিত হয় যেগুলির মাধ্যমে শিশুর পূর্ণাংগ বিকাশ সম্ভব। এই প্রকারের বিষয়বস্তু শিক্ষার যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণানুযায়ী শিক্ষা হল এমন একটি বিরামবিহীন প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার পরিবেশকে আপন পূর্ণাংগ বৃদ্ধির জন্য সার্থকভাবে ব্যবহার করে। এই বিষয়বস্তুর সমস্যা হল এমন সব শিক্ষণীয় অবস্থার সৃষ্টি করা যেগুলির মাধ্যমে শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সার্থকভাবে অগ্রসর হতে পারে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনেরই সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার নির্বাচন, বিকাশ ও পরিচালনা সাধিত হয়। এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিশু আপন অনুভূত চাহিদার ('felt needs') পরিতৃপ্তি সাধন করে এবং এর মধ্যে এমন কোন পূর্ব-পরিকল্পনার স্থান থাকতে পারে না যা কর্ম-পদ্ধতিকে জড়ধর্মী ও অনমনীয় করে তুলতে পারে। বলা প্রয়োজন, এই প্রকারের বিষয়বস্তু জন ডিউইর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তত্ত্ব থেকে সরাসরি উদ্ভূত। এই বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বিভিন্ন 'প্রজেক্ট' অর্থাৎ জীবনভিত্তিক কর্ম-সমস্যাকে নিয়ে গঠিত হয়। তবে এই বিষয়বস্তুকে সার্থকভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে অতি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও সৃজনমূলক কল্পনাপ্রবণ শিক্ষকের প্রয়োজন

এবং যেহেতু এই রকম শিক্ষক এখনও খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নয়, সেইহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করা বর্তমানে খুব কঠিন।

(৬) কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু

এই বিষয়বস্তু শিখনের কর্মভিত্তিক তত্ত্বের (activity theory of learnings) উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষায় বহুকাল ধরে বিষয় ও বিষয়সমন্বিত পাঠ্যপুস্তকের প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য খর্ব করবার জন্যই শিখনের উপরোক্ত তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। তবে কর্মনির্ভর শিখনতত্ত্বের স্বপক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাদার্শনিক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই যুক্তিগুলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) তত্ত্ববিদ্যাগত যুক্তি (ontological argument), (২) জীববিদ্যাগত (biological) যুক্তি, মনস্তত্ত্বগত (psychological) যুক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বগত (epistemological) যুক্তি। নিম্নে এই এই চারটি শ্রেণীর যুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(ক) তত্ত্ববিদ্যাগত যুক্তি

সেণ্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas) প্রথম এই শ্রেণীর যুক্তির অবতারণা করেন। পরে ফ্রোয়েবেল ও তাঁর পরবর্তী অনেক ভাববাদী শিক্ষাবিদ্ এই শ্রেণীর যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। এঁদের বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে, মানুষের জীবনের মৌল সত্তা হল সক্রিয়। সুতরাং শিক্ষালাভে শিশুকেই সক্রিয় হতে হবে। এঁদের মতে শিক্ষাক্রিয়ার মূল কথা হল শিশুকে জ্ঞানার্জনের জন্য বা শিক্ষালাভের জন্য তার জন্মগত শক্তিসমূহকে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা।

(খ) জীববিদ্যাগত যুক্তি

এই যুক্তির উপস্থাপয়িতারা বলেন যে, মানুষ অন্য প্রাণীর মত দেহবিশিষ্ট জীব এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োগ তার বাঁচবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিক্ষণ তাঁদের মতে এই বাঁচার সহায়ক প্রক্রিয়া। সুতরাং শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় মানবদেহের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

(গ) মনস্তত্ত্বগত যুক্তি

অনেক মনস্তাত্ত্বিক বলেন যে, মানব মনের মৌলিক উপাদান হল কতকগুলি আদিম কর্মপ্রবণতা। এই প্রবণতাগুলির যোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমেই মানব-

মনের অর্থাৎ মানবাচরণের যোগ্য বিকাশ সম্ভব। স্বভাবতঃই এঁরা যখন শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁরা শিশুর সক্রিয়তার উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন। জেম্‌স্‌, থর্ণডাইক, ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌, নান্‌, জন ডিউই প্রভৃতি হলেন এই প্রকারের যুক্তির বিখ্যাত সমর্থকবৃন্দ।

(ঘ) জ্ঞানতত্ত্বগত যুক্তি

শিখনের কর্মভিত্তিক তত্ত্বের সমর্থনে এই শ্রেণীর যুক্তি জন ডিউই-প্রমুখ প্রয়োগবাদীরা উপস্থাপিত করেছেন। এঁদের মতে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই সত্যজ্ঞানলাভ সম্ভব। এঁরা বলেন যে, সমস্ত সত্যই হল পরীক্ষিত ('verified') সত্য এবং সত্যের উদ্ভব ও পরীক্ষার জন্য পরিবেশকে ব্যবহার করে প্রাণবন্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সমর্থনে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত করা হলেও তার ব্যবহারিক রূপায়ণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নানাপ্রকারের খেলাধূলা, ভ্রমণ, পরীক্ষাগারের ও কর্মশালার (workshop) বিভিন্ন কাজ, কারুশিল্পগত কর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই বিষয়বস্তু রূপলাভ করে। অবশ্য প্রয়োগবাদীদের বেলায় কেন্দ্রীয় কর্ম প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক পার্থক্য প্রায় নেই বললেও চলে। দুয়েরই মূল কথা হল শিশুর সক্রিয়তা ও তার বিভিন্ন কর্ম।

(ঙ) চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু

আমরা দেখেছি যে, বহুকাল ধরে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়েছে। যেহেতু বিষয়গুলি হল একমাত্র পরিণত বয়স্কদেরই সরাসরি ব্যবহারোপযোগী এবং যেহেতু বিষয়গুলির নির্বাচনও সবসময়ে পরিণত বয়স্কদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হত, সেইহেতু একথা বোধ হয় খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই বলা যায় যে, এই বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ছিল আসলে বয়স্কদের চাহিদাকেন্দ্রিক। চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু হল কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে শিশুর চাহিদাকে কেন্দ্র করেই বিষয়বস্তু গঠিত হয় এবং বয়স্কদের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বলা প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের প্রভাবোদ্ভূত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অংশ

হিসাবে চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক বলেই এই বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতঃই বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও শিশুর চাহিদাকে মনে রেখে বিষয়গুলিকে অনেক সময়ে এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। তবে চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ একমাত্র শিশুর কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব।

* * * *

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর কিছুটা পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে যে, শিশুকেন্দ্রিক, চাহিদাকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক ও একীভূত বিষয়-বস্তুগুলি শিক্ষাক্ষেত্রের অতি নবীন ভাবধারাসমূহ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সম্পৃক্ত ও মিলিত বিষয়বস্তুর উপরও নূতন ভাবধারার প্রভাব পড়েছে—তবে মধ্যম প্রকারের। একমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর উপরই নবীন ভাব-ধারাসমূহের কোন প্রভাবই পড়ে নি। এটি পুরাতন ভাবধারাসঞ্জাত ও পুরাতন ভাবধারাকে বর্তমানেও বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

গণতন্ত্র ও বিষয়বস্তু

আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পূর্ণাংগ বিকাশ। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য পূর্বোল্লিখিত সমস্ত প্রকারের বিষয়বস্তুকেই ব্যবহার করা যায়। তবে ঐ লক্ষ্যের সংগে সবচেয়ে বেশী সঙ্গতিপূর্ণ হল নবীন ভাবধারাগুলির দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত বিষয়-বস্তুগুলি যেমন, শিশুকেন্দ্রিক, চাহিদাকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক ও চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুসমূহ। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিশুপ্রকৃতির সৃজনমূলক অংশের বিকাশের সুযোগ খুব বেশী থাকে এবং সমাজের পরিবর্তন-শীলতার উপর গুরুত্ব অর্পণ করার জন্য এগুলি সমাজের প্রগতিরও খুব বেশী সহায়ক। তবে মনে রাখা উচিত কি ভাবে বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করা হবে তার উপরই খুব বেশী রকম নির্ভর করে বিষয়বস্তুর চরম পরিণতি। সুতরাং বিষয়বস্তুর পরিচালক ও সন্নিবেশক শিক্ষকের উপরই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে গণতন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে কিনা।

———

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলী

যে সব কর্মকে সহপাঠক্রমের অন্তর্গত বলে বর্তমানে মনে করা হয় সেগুলির পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিতর্ক, খেলাধূলা ও অভিনয় ইত্যাদি প্রাচীন স্পার্টাতে দেখা গিয়েছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ইতিহাসেও নানাপ্রকারের খেলাধূলা ইত্যাদি দেখা গিয়েছে। অন্যান্য প্রাচীন দেশে এবং সভ্যতার অন্যান্য স্তরেও এই সব কর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রধানতঃ এগুলি ছিল শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহসম্ভূত। কখনও কখনও শিক্ষকরা ও বিদ্যালয়-পরিচালকরা সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দেখেছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি বড়দের মনোভাব ছিল বিরূপ এবং সময়ে সময়ে তাদের উৎসাদনের ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই কর্মগুলির ভিত্তি শিশুদের অপ্রতিরোধ্য প্রাণধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হেতু সমস্ত বাধা ও বিরূপতা সত্ত্বেও সেগুলির অস্তিত্ব সবসময়ে বজায় রয়ে গেছে। তবে কখনও তাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, এমনকি পাঠক্রমের বিষয়গুলির সমমর্যাদাও দান করা হয় নি। সহানুভূতির সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখনও পাঠক্রমের বহির্ভূত কর্মাবলী (extra-curricular) বলেই তাদের গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টি কেন হল? এই প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি কারণের উল্লেখ করা যায়।

(১) দেহ অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা

আদর্শবাদী দর্শনের প্রভাবে মন ও তার বিকাশকে জীবন ও শিক্ষায় প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দৈহিক সম্পর্কযুক্ত সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীকে মর্যাদার স্থান দেওয়া হয় নি।

(২) শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব

গণতন্ত্রপূর্ব সামাজিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকেও শ্রদ্ধা করা হয় নি, তাদের শিশুদেরও নয়। তাই শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহউদ্ভূত কর্মাবলীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় নি।

(৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব

পূর্বে বিদ্যালয়বহির্ভূত সামাজিক সংস্থাগুলির (যেমন পরিবার, ধর্ম,

ইত্যাদি) শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা অনেক ব্যাপক ছিল। তাই বিদ্যালয় একমাত্র বিষয়নির্ভর বৌদ্ধিক চর্চা ও বিকাশ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

গণতান্ত্রিক যুগে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করা অশ্রদ্ধার বস্তু হয়ে উঠায় শ্রম ও দেহের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব কেটে গেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ভিন্ন সামাজিক সংস্থার শিক্ষামূলক কর্মের পরিধিও বর্তমানে অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। এইসব কারণে বর্তমানে পাঠক্রমবহির্ভূত কর্মাবলীকে আর পাঠক্রমবহির্ভূত বলা হয় না। নূতন নামকরণের ফলে সেগুলিকে শ্রেণীবহির্ভূত (extra-class), পাঠক্রমপ্রতিম (semi-curricular), সমান্তরাল (co-lateral), সহপাঠক্রমিক (co-curricular) ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে এই সব কর্মকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষামূলক কর্মগুলির মতই মূল্যবান মনে করেন। আবার অনেকে শ্রেণীকক্ষের প্রচলিত কর্মাবলী ও শ্রেণীর বাইরের ছাত্র-পরিচালিত কর্মগুলির মধ্যে ব্যবধান দূর করে দিয়ে দুই-প্রকারের কর্মকে একত্রিত করে সমগ্র কর্মধারাকে কর্মমূলক পাঠক্রম বা জীবনভিত্তিক পাঠক্রম বলে অভিহিত করেছেন। তবে এঁদের মত তত্ত্বের দিক থেকে যদিও নির্ভুল, তথাপি অন্য মতের শিক্ষাবিদ্‌দের তুলনায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনও এঁদের প্রভাব সীমিত।

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মূল্য

(১) সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মাধ্যমে সহযোগিতা ও ন্যায়পরায়ণতার (fair play) অভ্যাস গঠন করা যায়।

(২) সাধারণ সৎ নাগরিকতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা লাভ হয়।

(৩) কর্মবিরতির সময়ের সৎব্যবহারের শিক্ষালাভ হয়।

(৪) দৈনন্দিন পাঠক্রমিক কর্মাবলীর সংগে যুক্ত করলে এগুলি থেকে দায়িত্ববোধ, কর্মোৎসাহ, কর্মে আনন্দ ও গৌরববোধ ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমোক্ত কর্মাবলীতে সহজে সঞ্চারিত (transferred) হতে পারে।

(৫) এই কর্মাবলী বিদ্যালয়-চেতনা (school-spirit) জাগরণের বিষয়ে খুব কার্যকরী হয়।

(৬) পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনে এই সব কর্মকে প্রসারিত করলে সমাজের লোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আনুকূল্যলাভ করা যায়।

(৭) সমাজ জীবনে প্রসারিত করলে এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজের সেবার মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের আস্বাদ পেতে পারবে।

(৮) যুব শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলির ব্যবহারিক মূল্যও আছে। কেননা এগুলির মধ্য দিয়ে পেশাগত আসক্তির উদ্ভব ও পেশা-নির্বাচন অনেক সময়ে সহজ হয়।

(৯) এগুলির উপাস্থিতি বিদ্যালয় জীবনকে প্রাণবন্ত, আগ্রহদীপ্ত ও তাই সার্থকতর করে তুলতে সাহায্য করে।

(১০) বহুমুখী বিকাশরূপ শিক্ষার আদর্শকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করতে এই কর্মাবলী নানা দিক থেকে সাহায্য করে।

সহপাঠক্রমিক কর্মপরিচালনা সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ

সুষ্ঠুভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালিত করতে হলে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির অনুসরণ প্রয়োজন ঃ

(১) সমস্ত প্রকারের কর্মই বিদ্যালয়ের আদর্শানুযায়ী হওয়া উচিত এবং বিদ্যালয়-পরিচালকদের অনুমতিতে ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ও গঠিত হওয়া উচিত।

(২) সমস্ত কর্মেরই কাম্য সামাজিক, নাগরিক এবং নৈতিক আদর্শের রূপায়ণে সহায়ক হওয়া উচিত।

(৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার একটি সুষম, বহুবিচিত্র ও সৃজনমূলক কর্মসূচী গঠন করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচীর প্রয়োগও উভয়ের সহযোগিতায় হওয়া প্রয়োজন।

(৪) কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্তর ও ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী হওয়া উচিত।

(৫) সমস্ত কর্মই গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত।

(৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন না কোন কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করা উচিত।

(৭) কর্মগুলি এমনই হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও পাঠ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(৮) যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্মগুলি সম্পন্ন হওয়া উচিত।

(৯) প্রত্যেকটি কর্মের জন্য সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত।

(১০) কর্মপরিচালকদের (activity leaders) শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনে ছাত্রদের যতদূর সম্ভব যোগদান করতে দেওয়া উচিত।

(১১) সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের এলাকাতেই এই কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এতে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে।

(১২) টাকাকড়ির তত্ত্বাবধান শিক্ষকদের করা উচিত।

(১৩) অর্থের অভাবের জন্য কোন শিক্ষার্থীকে কোন উপযোগী কর্মে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর নানা প্রকারের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব। নিম্নে একপ্রকারের শ্রেণীবিভাগের পরিচয় দেওয়া হল।

(ক) বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ।

(খ) বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ।

(গ) সাংস্কৃতিক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ।

(ঘ) সেবামূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ।

(ঙ) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াসম্পর্কিত কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ।

(চ) স্কাউট, গাইড্ ও এন্. সি. সি. জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

(ক) বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ

বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিকতা ও গণতান্ত্রিক নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। এই জন্য প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে

দেওয়া হয়। তবে বিদ্যালয় শাসন-ব্যাপারে শেষ অধিকার থাকে বিদ্যালয়ের পরিচালকদের। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরী করা হয় এবং সেই সংগঠনটিকে পরিচালনা করে নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধি এবং শিক্ষকদের দ্বারা গঠিত 'ছাত্র মন্ত্রণাসভা' (Student Council)। এই মন্ত্রণাসভা বিদ্যালয়ের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের বেশীর ভাগই ছাত্র নেতা ও শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। ছাত্রমন্ত্রণাসভার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে নিম্নের কর্তব্যসমূহ পালন করা প্রয়োজন :

১। গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষাদান করা।

২। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে সব কাজ করা।

৩। বিদ্যালয়ে উন্নত নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

৪। বিদ্যার্জনে উৎসাহদান করা।

৫। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া।

৬। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিষয়ে উৎসাহদান করা ও সেগুলিকে যোগ্যভাবে পরিচালিত করা।

৭। বহুবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘ-চেতনাকে জাগান।

(খ) বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ

বিদ্যালয়ের কোন কোন কার্যের পরিচালনায় বোধ হয় বরাবরই ছাত্রদের সাহায্য নেওয়া হত। তবে সংগঠিতভাবে ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণের প্রথা বর্তমান কালেই প্রচলিত হয়েছে। এই প্রথার সুফল নিম্ন প্রকারের হয়ে থাকে :

১। যে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়।

২। তারা কর্মপরিচালনায় কারণসমূহ জানতে পারে।

৩। তারা বিদ্যালয়ের আদর্শরক্ষায় তৎপর হয়।

৪। তারা অপর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

দলবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীরা নিম্নমত কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে—

১। বিবরণ দানের সময়ের কার্যাবলী (report period activities)।

বিবরণ দানের সময়ে পাঠদান ভিন্ন অন্যান্য কাজ করা হয়ে থাকে যেমন, বিজ্ঞপ্তি পাঠ, দৈনিক উপস্থিতি পরীক্ষা ইত্যাদি।

২। সাধারণ সভাসমূহের (assemblies) কর্মাবলী।

৩। বিদ্যালয়ের অর্থ সঞ্চয়াগার (bank) সম্পর্কিত কর্মাবলী।

৪। লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ।

(গ) সাংস্কৃতিক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ

বিদ্যালয়ে বিতর্ক, অভিনয়, সাময়িকপত্রে লেখা ও সম্পাদনা, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের বৌদ্ধিক ও সৌন্দর্যবোধমূলক বিকাশ সংঘটিত হতে পারে।

(ঘ) সেবামূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ

সমাজ সেবার বহুপ্রকারের প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিকতা শিক্ষা সার্থকতর হয়ে উঠতে পারে।

(ঙ) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া সম্পর্কিত কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ

উদ্যান রচনা, ভ্রমণ, হাইকিং (hiking), চড়ুইভাতি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকারের বিকাশ সাধিত হতে পারে।

(চ) বয়স্কাউট, গার্লগাইড্ ও এন. সি. সি. ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ

'বয়স্কাউট' ও 'গার্লগাইড' দলে যোগদান করে এবং এন. সি. সি-র মত আধা-সামরিক দলের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে দৈহিক ও সামাজিক এবং অন্যান্য আরও বহুদিকের বিকাশ সংঘটিত হয়।

বলা বাহুল্য, সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃজনশীলতা ও আনন্দবোধের প্রকাশের প্রচুর অবকাশ থাকায় এগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকে অসীম এবং তাই তাদের মাধ্যমে বৃদ্ধিও হয় সহজ। সুতরাং এগুলি সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বেশী হলে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী বিকাশ সহজসাধ্য হয়।

শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্ত্বসমূহ

শিক্ষণের তত্ত্ব সমাজদর্শন ও শিখন সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। যে-হেতু চলমান জগতে সমাজদর্শন—(যা প্রধানতঃ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে) পরিবর্তনশীল, সেই হেতু শিক্ষণের মূলনীতিগুলিও স্থাণু নয়, পরিবর্তনশীল। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে (মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) শিখনের স্বরূপ ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এর ফলেও শিক্ষণের মূলতত্ত্বগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিখনের মনোবিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বগুলিও সমাজদর্শনের তত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। এখন গণতান্ত্রিক শিক্ষণের মূলতত্ত্বগুলির নির্ধারণের পূর্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণতান্ত্রিক দর্শন প্রভাবিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিখনের মূলতত্ত্ব-গুলির সংগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা শিক্ষণ ত শিখন পরিচালনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিম্নে সেই তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে শিখনের মৌলপ্রকৃতি সম্বন্ধে মতৈক্য নেই। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের (schools) মতাবলম্বীরা শিখনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন। নিম্নের তত্ত্বগুলি তাঁদের মতগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে মিল রয়েছে তার উপর নির্ভর করে নির্ণীত হয়েছে।

শিখনের মূলতত্ত্বসমূহ

১। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবের আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে তারই নাম শিখন।

২। শিখনের অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা।

৩। শিখন বলতে বোঝায় বৃদ্ধি ও বিকাশ, কেননা শিখনের মধ্য দিয়েই প্রধানতঃ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়।

৪। শিখনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সংগঠিত হয়। শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্যাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ ইত্যাদি অবিরত পরিবর্তিত হয়।

৫। সার্থক শিখন সর্বসময়েই উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়। উদ্দেশ্যহীন শিখন প্রায়ই শিক্ষার্থীর কাজে আসে না।

৬। শিখন সব সময়েই বুদ্ধি-নির্ভর ও সৃজনধর্মী। শিখনের সমস্ত ক্ষেত্রেই উপস্থিত অবস্থার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজন হয় প্রতিক্রিয়া (response) নির্বাচন।

৫। সার্থক শিখনে শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকে। এই সক্রিয়তা দৈহিক ও মানসিক দুই স্তরেই প্রকাশ পায়।

৮। শিখন একদিক থেকে একটি ব্যক্তিগত এবং অন্যদিক থেকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেকের শিখন এক দিক থেকে একান্তভাবে তার নিজস্ব ব্যাপার, কেননা তার হয়ে কেউ শিখতে পারে না, কিন্তু অন্যদিক থেকে সেই শিখনই হল আবার সামাজিক। কেননা একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের শিখন সংঘটিত হয়।

৯। শিখনের মাধ্যমে সংঘটিত আচরণিক পরিবর্তনের স্বরূপ জীব ও তার পরিবেশ উভয়ের উপরই নির্ভর করে।

১০। অর্থহীন বস্তু অপেক্ষা অর্থপূর্ণ বস্তুকে শেখা সহজ।

১১। উদ্দীপক (stimulus) ও প্রতিক্রিয়া (response) দুই-ই জটিল ও বিন্যস্ত। অর্থাৎ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া কোনটাই সহজ, একক বা অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে না।

১২। শিখনের মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয়েরই স্থান রয়েছে।

১৩। শিখন তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন ব্যক্তি উপস্থিত অবস্থার মধ্যবর্তী সম্পর্কনিচয়কে ভাল করে বোঝে এবং কোন মূর্ত (concrete) সমস্যার মৌলতত্ত্বকে আয়ত্তে আনে।

১৪। সাংকেতিক (symbolical), প্রক্ষোভগত এবং সামাজিক আচরণ পরস্পরের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভাষাগত শিখন প্রক্ষোভগত ও সামাজিক শিখনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৫। এক অবস্থার সঙ্গে অন্য অবস্থার গঠন (structure) ও অর্থের (meaning) সঙ্গতি থাকলে শিখনের সঞ্চালন (transfer) সহজ হয়।

১৬। শিখন প্রক্রিয়া চলার সময়ে ফলের দ্বারা প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়।

১৭। শিখনে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই লক্ষ্য করা প্রয়োজন হয়।

১৮। যে কাজ আয়ত্ত করতে হবে, তার উপর শিখনের প্রকৃতি নির্ভর করে। সম্পাদ্য কর্ম নানা প্রকারের হয় বলে শিখনও নানা প্রকারের হয়, যেমন, সংযোগমূলক (associative) শিখন, পর্যবেক্ষণমূলক (observational) শিখন, গতিমূলক শিখন (motor learning), সমস্যা সমাধানমূলক (problem-solving) শিখন, পরীক্ষামূলক শিখন (experimental learning), সৃজনমূলক (creative) শিখন এবং সৌন্দর্যানুভূতিমূলক (appreciative) শিখন।

১৯। শিখনের বিভিন্নতা যদিও আছে, তথাপি কোন জীবন্ত (live) শিক্ষামূলক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের শিখনের উপাদান যুক্তভাবেই থাকে, তাই সার্থক শিখন হল একটি সমগ্র ও সংশ্লিষ্ট পূর্ণ প্রক্রিয়া (integrated whole)

সার্থক শিক্ষণের তত্ত্বাবলী

১। সার্থক শিক্ষনের অর্থ হল শিখন পরিচালনা করা। সার্থক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শিখনে উৎসাহিত করা হয় এবং যোগ্য অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে শিখনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা হয়।

২। সার্থক শিখনের জন্য সুপরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

৩। সার্থক শিক্ষণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য শিখনকে পরিচালিত করে।

৪। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তিকে মুক্তিদান (liberate) করে ও বিকশিত করে। সার্থক শিক্ষণের চরম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে আত্মশিক্ষণের (self-education) উপযুক্ত করে তোলা।

৫। সার্থক শিক্ষণের জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাবের প্রয়োজন।

৬। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রভাবের প্রয়োজন।

৭। সার্থক শিক্ষণ আদেশের ব্যবহার না করে ইঙ্গিতের (suggestion) ব্যবহার করে। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যবহার ত্যাগ করে পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

৮। সার্থক শিক্ষণ অবিরত উন্নতির প্রয়াসী। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষণপদ্ধতির অবিরত উন্নতি কামনা করে।

৯। সার্থক শিক্ষণের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার প্রয়োজনীয়।

১০। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের অসুবিধাসমূহ জেনে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১১। সার্থক শিক্ষণ একটি শিল্পকর্ম। শিক্ষকের শক্তি ও প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের যোগ্য ব্যবহারের উপর শিক্ষণ-শিল্পের সার্থকতা নির্ভর করে।

১২। সার্থক শিক্ষণ প্রয়োজনবোধে মুক্তমনে যে কোন শিক্ষাপদ্ধতি বা কৌশলকে ব্যবহার করে।

বিভিন্ন প্রকারের শিখনে শিক্ষকের কর্তব্য

আমরা দেখেছি যে, শিখন এক প্রকারের নয়। সুতরাং শিক্ষণের সাধারণ তত্ত্বগুলি সর্বপ্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব ও উচিত হলেও বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে কিছুটা বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষণের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষণের তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

ক। পর্যবেক্ষণমূলক শিখন ও তার পরিচালনা

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের এইটিই হল সবচেয়ে সহজ উপায়। সমস্ত প্রকারের পাঠ্য বিষয়ে ও শিক্ষার সমস্ত স্তরেই এর প্রয়োজন রয়েছে। পর্যবেক্ষণ খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও তার পরিচালনার প্রয়োজন আছে, কেননা পরিচালনাবিহীন পর্যবেক্ষণ ভাল ফল প্রসব করে না। উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হলেই পর্যবেক্ষণ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। পর্যবেক্ষণমূলক কর্মাবলীতে শিশুদের আগ্রহ, বিষয়বস্তুর নূতনত্ব, সজীবতা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য শিশুরা পর্যবেক্ষণে ভুল করে। পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সময় শিক্ষকদের এই সব বিষয়ে অবহিত হতে হয় এবং নিম্নমত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করতে হয়ঃ

১। পর্যবেক্ষণকে সযত্নে পরিচালিত করা।

২। উদ্দেশ্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণে শিশুদের উৎসাহিত করা।

৩। যোগ্য বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে শিশুদের পর্যবেক্ষণে আগ্রহান্বিত করা।

৪। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণে শিশুদের অভ্যস্ত করা।

৫। পর্যবেক্ষণের পূর্বে ও পরে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার ব্যবস্থা করা।

৬। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

খ। গতিমূলক শিখন ও তার পরিচালনা

গতিমূলক শিখন হল কর্মের মধ্য দিয়ে শিখন এবং তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী-সংক্রান্ত বহুপ্রকারের কর্মেই এর প্রয়োগ হয়। এই প্রকারের শিখন খুব সহজ হতে পারে। আবার খুব জটিলও হতে পারে। এই প্রকারের শিখনে দুই প্রকারের সাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। এক প্রকারের নৈপুণ্য হল বস্তু বা প্রক্রিয়া বোঝার নৈপুণ্য, যেমন, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী তৈরীতে নৈপুণ্য এবং আর এক প্রকারের নৈপুণ্য হল অঙ্গ চালনার নৈপুণ্য, যেমন, টেনিস খেলায় নৈপুণ্য। গতিমূলক শিখনের প্রথম কাজ হল শিশুদের জীবনের সাধারণ কাজকর্মের উপযুক্ত করে তোলা এবং দ্বিতীয় কাজ হল শিশুদের বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝতে সাহায্য করা। গতিমূলক শিখনে প্রত্যক্ষণের (perception) যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই এই প্রকারের শিখনকে অনেকে প্রত্যক্ষণ ও গতিমূলক শিখন (perceptual-motor learning) বলে অভিহিত করেন। প্রত্যক্ষণ ও গতিমূলক উপাদানসমূহ বিভিন্ন প্রকারের কর্মে বিভিন্ন রূপে যুক্ত হয়। অর্থাৎ কোন কোন কর্মে গতিমূলক উপাদানের বাহুল্য থাকে।

গতিমূলক শিখন পরিচালনার জন্য শিক্ষককে নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হয়ঃ

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি নজর রাখা।

২। যোগ্য প্রেষণা (motivation) সৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া এবং বাস্তব অবস্থায় বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্যে নৈপুণ্য অর্জনের ব্যবস্থা করা।

৩। সঠিক পরিবেশে যোগ্য অবসরের পরে পরিমিত অভ্যাসের ব্যবস্থা করা।

৪। মানসিক অভ্যাসের ব্যবস্থা করা।

৫। নৈপুণ্য সৃষ্টিতে ছন্দের ভূমিকাকে স্বীকার করা। (অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের ছন্দ পৃথক রূপ গ্রহণ করে।)

৬। শিক্ষক কর্তৃক সঠিক পদ্ধতি হাতে-কলমে দেখান।

৭। নৈপুণ্য অর্জনের তত্ত্বগত আলোচনার ব্যবস্থা করা।

(গ) সংযোগমূলক শিখন ও তার পরিচালনা

সংযোগমূলক শিখনে শিক্ষার্থী তার চারপাশের জগতের সম্পর্কসমূহকে (connections) জানে ও আয়ত্ত করে। সংযোগমূলক শিখনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) স্বয়ংগতিশীল সংযোগ (automatic association), (২) ভাব (concept) ও সামান্যীকরণ (generalisation)। এগুলির প্রত্যেকটিই ভাষানির্ভর। সাধারণতঃ তথ্যের পর ভাব এবং ভাবের পর সামান্যীকরণ এইভাবে শিক্ষার্থী এই প্রকারের শিখনে অগ্রসর হয়। স্বয়ংগতিশীল সংযোগমূলক শিখন বলতে তথ্য ও সংবাদ আয়ত্তীকরণকে বোঝায়। শব্দের অর্থ শেখা, ছোট ছোট যোগ বিয়োগ ফল মনে রাখা, বৈজ্ঞানিক নিয়ম মনে রাখা প্রভৃতি এই প্রকার শিখনের অন্তর্গত। এই প্রকারের শিখনকে স্বয়ংগতিশীল বলা হয় এইজন্য যে, শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়াগুলিকে প্রয়োজনবোধে তৎক্ষণাৎ ও অনায়াসে পাওয়া প্রয়োজন। এই প্রকারের শিখন অপেক্ষা ভাবশিখন আরও জটিল। ভাবগুলিকে আয়ত্ত করতে হলে আরও উচ্চাংগের মানসিক সংগঠনমূলক ক্রিয়ার প্রয়োজন। সামান্যীকরণের দ্বারা দুই বা ততোধিক ভাবের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করা হয়। এই প্রকারের শিখন পরিচালনার জন্য নিম্নমত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন :

১। যোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করা। অন্তর্নিহিত প্রেষণা (inner motivation) ও বহিরাগত প্রেষণা (outer motivation) উভয়কেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা। (যোগ্য অবস্থা সৃষ্টি করে অন্তর্নিহিত প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়। বহিরাগত প্রেষণা নিন্দা-সুখ্যাতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পুরস্কার দান ও শাস্তিবিধান ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।)

২। এই প্রকারের শিখন-পরিচালনার সময়ে শিক্ষকের সমকালীন শিখনসমূহের (concomitant learning) প্রতি দৃষ্টি রাখা। সমকালীন শিখন বলতে মনোভাব (attitude), আদর্শ, ভালমন্দ লাগা (liking and disliking) ইত্যাদির শিখনকে বোঝায়।

৩। 'পূর্ণ পদ্ধতি' (whole method) ব্যবহারের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ব্যবস্থা করা। (পূর্ণ পদ্ধতিতে সম্পাদ্য কর্মকে সামগ্রিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়।)

৪। স্বয়ংগতিশীল সংযোগমূলক শিখনের জন্য 'অতি-শিখনের' (over-learning) ব্যবস্থা করা। (অতি-শিখন বলতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রার শিখনকে বোঝায়।)

৫। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাবের বিকাশ ঘটে। সুতরাং ভাবগুলির সঠিক অর্থ আয়ত্তীকরণের জন্য নূতন নূতন অবস্থা ও পরিবেশে তাদের প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

৬। সামান্যীকরণের বিকাশও নূতন সমস্যামূলক অবস্থায় প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সুতরাং ঐরূপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) অনুধ্যানমূলক চিন্তানির্ভর শিখন বা সমস্যা সমাধান-মূলক শিখন ও তার পরিচালনা

সমস্যা সমাধান বা অনুধ্যানমূলক চিন্তনকে (reflective thinking) অনেকে অন্য সমস্ত প্রকারের শিখনের চরম পরিণতি বলে মনে করেন। এই প্রকার চিন্তনে যুক্তি করার শক্তির প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়-গুলির মধ্যে গণিত এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে যুক্তি প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকে। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলতঃ একই এবং শিখন ও চিন্তার এটি হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, কেননা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমেই মানুষ নিজ কর্ম ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশুদের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি বা চিন্তন শেখান শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান ও কঠিন কর্তব্য। সমস্যার উদ্ভব তখনই হয় যখন কোন কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। চিন্তাকারী এই বাধার বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। বাধাটি সম্পূর্ণভাবে মানসিক হতে পারে কিম্বা বস্তুজগৎসম্পর্কিতও হতে পারে। সমস্যার প্রধান লক্ষণ হল এই যে, যে ব্যক্তি তার সম্মুখীন হয় সে সমস্যাটির সমাধান বিশেষভাবে চায়। সমস্যার সঙ্গে 'প্রজেক্ট' বা কর্মমূলক সমস্যাকে অনেক সময়ে এক করে দেখা হয়, কিন্তু তা ঠিক নয়। সমস্যার সমাধান শুধু চিন্তার মাধ্যমেই হতে পারে, কিন্তু কর্মমূলক সমস্যা-

সমাধানের জন্য বস্তুজগৎ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষায় ভাল সমস্যা তাকেই বলা হয় যা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, চিত্তাকর্ষক, বোধ্য, উপযোগী, ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবান এবং যা চিন্তার উদ্রেক করে। যদিও বুদ্ধির সঙ্গে সমস্যা সমাধানের শক্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তথাপি মনে করলে ভুল করা হবে যে, উন্নত ধরণের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি আপনা হতেই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠে। পূর্ণ সাফল্যের জন্য সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পৃথক শিক্ষণের প্রয়োজন। সমস্যা-সমাধানের শক্তির বিকাশের জন্য নিম্নপ্রকারের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ সকলের জন্য এক প্রকারের সমস্যা নির্ধারণ করলে ঠিক হবে না।

২। শক্তির বিকাশের স্তরানুযায়ী সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

৩। নানা ক্ষেত্রে নানাপ্রকারের সমস্যা-সমাধানের সুযোগ দিতে হবে।

৪। সমস্যাসমূহ সমাধানের সময় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং পরবর্তী শিখনের সময়ে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে শেখাতে হবে।

৫। প্রমাণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের উদ্রেক করতে হবে।

৬। জটিল সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ভাল করে তথ্য আহরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৭। তথ্যের উৎস নির্বাচন, উৎসের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ, পাঠ থেকে সঠিক অর্থ সংগ্রহ এবং তথ্যসমূহ থেকে সুবিন্যস্ত ভাবরাজি সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় সম্পর্কসমূহকে দেখার জন্য সুশৃঙ্খল প্রয়াস এবং প্রকল্প নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ণ—এই সমস্ত বিষয়েই শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে।

৮। সংকেতসমূহের সদ্ব্যবহার, পরিবর্তনশীল মনোভাব রক্ষা করা এবং আপন আপন প্রক্ষোভগত ভ্রান্ত ধারণাকে পরীক্ষা করতে শেখা ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

৯। চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের ও ভাবের প্রতিও শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, কেননা যোগ্য তথ্য ও ভাব না থাকলে এককভাবে পদ্ধতি সার্থক কিছুই গড়ে তুলতে পারে না।

১০। মূলসমস্যাকে ভাল করে বুঝতে, চিন্তার সময়ে সমস্যাটি সম্বন্ধে সব সময়ে সচেতন থাকতে ও আসল প্রশ্নটি মনে রেখে সমস্যামূলক অবস্থাটির উপাদানগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে শিক্ষাদান করতে হবে।

Yoakam ও Simpson বলেছেন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যদিও কোন নির্ধারিত প্রণালী নেই, তথাপি নিম্নলিখিত সোপানগুলিকে মনে রাখলে সমস্যা সমাধান ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের কিছুটা ভালভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হবে।

১। সমস্যাকে উপস্থাপিত করা।

২। সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করা।

৩। তথ্য সংগ্রহ করা ও তাদের মূল্য নির্ণয় করা।

৪। পরীক্ষামূলক সমাধানসমূহ নির্ধারণ করা।

৫। ফল পরীক্ষা করা।

জন ডিউইও সমস্যা সমাধানমূলক শিখন পরিচালনার জন্য পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। তবে সেগুলিকেও মোটামুটিভাবেই প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সব ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য নয়, এ কথা মনে রাখা দরকার। ডিউই নির্দেশিত পাঁচটি সোপান হল:

১। অনুভূত অসুবিধা (felt difficulty)।

২। সমস্যাটির অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয়।

৩। সম্ভাব্য সমাধানের উপস্থাপন।

৪। যুক্তির দ্বারা সমাধানের প্রভাব ও ফল নির্ণয়।

৫। আরও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরে নির্ধারিত সমাধানটিকে গ্রহণ বা বর্জন করা।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, Yoakam ও Simpson নির্দেশিত পাঁচটি সোপান মূলতঃ ডিউই নির্দেশিত পাঁচটি সোপান হতে অভিন্ন।

(ঙ) গঠনমূলক শিখন ও তার পরিচালনা—সেই শিখনকেই গঠন-মূলক শিখন বলা হয় যার মধ্য দিয়ে কোন নূতন চিন্তা, প্রক্রিয়া বা বস্তুর উদ্ভব হয়। গঠনমূলক শিখনে উদ্ভাবনী-শক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। এই শিখন উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সংগঠনমূলক। এই প্রকার শিখনে নূতন কিছু উদ্ভাবন

করা যেতে পারে কিম্বা পূর্বে উদ্ভাবিত কোন বস্তুর পুনরুদ্ভাবন করা হয়। গঠনমূলক শিক্ষণের উপাদানগুলির বর্ণনা দেওয়া কঠিন কেননা উদ্ভাবনী ক্রিয়ার সোপানগুলিকে বিশ্লেষণ করা কঠিন এবং ব্যক্তিগত বৈষম্যও থাকে প্রচুর। বিদ্যালয়ের গঠনমূলক কর্ম দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকারের কর্ম হয় স্বতউৎসারিত এবং অন্য প্রকারের কর্ম প্রথমে পরিচালিত হলেও পরে স্বতউৎসারিত হয়ে উঠে। গঠনমূলক শিখনপরিচালনা ব্যাপারে নিম্নের তত্ত্বগুলিকে মনে রাখা প্রয়োজন।

১। গঠনমূলক শিখনকে শিশুর গঠনমূলক আত্মপ্রকাশ বলে শিক্ষকের মনে করা উচিত, শুধু নানা প্রকারের নৈপুণ্যের বিকাশের সহায়ক বলে মনে করা উচিত নয়।

২। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিষয়েই নূতন কিছু করবার সুযোগ থাকে। তবে সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে গঠনমূলক শিখনের সুযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী।

৩। গঠনমূলক কর্ম আপনা থেকেই শিশুদের খুব আগ্রহান্বিত করে তোলে।

৪। গঠনমূলক কর্মে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্মের প্রস্তাব করতে পারে।

৫। এই প্রকারের শিখনে শিশুরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায়।

৬। সুপরিকল্পিত প্রস্তাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা শিশুদের মৌলিক কর্মে উৎসাহিত করা যায়।

৭। এই প্রকারের শিখনে শ্রেণীকক্ষের কাজ ভাবের আদান-প্রদান, সহানুভূতিশীল বিচার এবং সমবেত পরিকল্পনা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হওয়া উচিত।

৮। গঠনমূলক শিখনে প্রায়ই চারটি সোপান লক্ষ্য করা যায়। সোপান কয়টিকে মনে রাখলে এই প্রকারের শিখন পরিচালনা সহজ হয়ে পড়ে। সোপান কয়টি নিম্নমত :

(ক) প্রস্তুতি (preparation)—এই সোপানে শিক্ষার্থী নানাদিক থেকে তথ্য আহরণ করে।

(খ) গোপন বিকাশ (incubation)—এই সোপানে শিক্ষার্থীর মন অজ্ঞাতসারে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে পরিবর্ধিত করে।

(গ) চকিতে প্রকাশ (inspiration)—এই সোপানে শিক্ষার্থী সমাধান সম্পর্কে সহসা সচেতন হয়।

(ঘ) সত্যতানির্ণয় (verification)—এই সোপানে শিক্ষার্থী উদ্ভাবিত ধারণাকে বা বস্তুকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে।

(চ) উপভোগমূলক শিখন ও তার পরিচালনা—উপভোগের দুটি দিক আছে—বৌদ্ধিক ও সৌন্দর্যগত। বৌদ্ধিক উপভোগ প্রধানতঃ অর্থবোধ ও ভাবগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট, যদিও এর প্রক্ষোভের দিকও আছে। সৌন্দর্যগত উপভোগ সৌন্দর্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার অর্থ, মূল্য বা প্রয়োজনের কথা না ভেবে তার নিছক গঠনকে উপভোগ করা হয়। সৌন্দর্যগত উপভোগের কথা সাধারণতঃ সেই সব কর্মের বিষয়েই উঠে, যেগুলিকে ব্যবহারের দিকে না চেয়ে তাদের নিজেদের জন্যই মূল্যবান মনে করা হয়। কোন বিষয়ের সৌন্দর্যগত উপভোগ অবশ্য তার পরবর্তী বৌদ্ধিক আলোচনার সহায়ক হতে পারে। এই প্রকারের শিখনপরিচালনার সময়ে নিম্নের তত্ত্বগুলির কথা মনে রাখা প্রয়োজন :

১। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে সৌন্দর্যগত উপভোগের অবকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী।

২। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে বৌদ্ধিক উপভোগের সুযোগ খুব বেশী।

৩। সমস্ত প্রকারের বিষয়েই উভয় প্রকারের উপভোগের অবকাশ রয়েছে।

৪। কোন বিষয়ের সৌন্দর্যগত উপভোগের জন্য যোগ্য প্রক্ষোভগত ভূমিকা রচনায় প্রয়োজন রয়েছে।

৫। উপভোগের জন্য প্রথম ধারণা (first impression) ভাল হওয়া প্রয়োজন।

৬। পূর্বস্থিত আগ্রহ উপভোগকে সহজ করে তোলে।

৭। সৌন্দর্যগত উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজের মূল্য হল শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের উপভোগবৃদ্ধির দিক থেকে।

৮। সৌন্দর্যগত উপভোগসম্পর্কিত শ্রেণীকক্ষের কাজ অনেক সময়ে শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করায় পরিণত হয়।

৯। বৌদ্ধিক উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে ভাল করে ব্যাখ্যা, প্রশ্ন, মন্তব্য ও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

১০। সৌন্দর্যগত উপভোগ শিল্পকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

১১। উপভোগ ব্যাহত করে এমন সমস্ত বাধার অপসারণ প্রয়োজনীয়।

১২। ব্যাখ্যা, তুলনা, ইত্যাদি বৌদ্ধিক কর্মের দ্বারা অপরিণত উপভোগকে উন্নত করা প্রয়োজন।

১৩। কবিতা উপভোগ বিষয়ে সুন্দর কবিতা আবৃত্তির মূল্য আছে।

১৪। কবিতার বেলায় কিছু কিছু মুখস্থ করার মূল্য আছে।

১৫। বৌদ্ধিক আলোচনা ও অর্থ-ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট শিখন ও শিক্ষণ (Integrated learning and teaching)

উপরে আমরা সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন দিকের আলোচনা করলাম। শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনার সময়ে এই রকম বিশ্লেষণের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সার্থক শিখনের রূপ হল সংশ্লিষ্ট ও সামগ্রিক। তাই বর্তমানে প্রগতিশীল বিদ্যালয়সমূহে নানা প্রকারের সংশ্লিষ্ট শিখনমূলক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকারের কর্মাবলীতে দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও সৌন্দর্যগত দিকগুলি এক সমগ্র অর্থপূর্ণ অবস্থার উপাদান হিসাবে বর্তমান থাকে এবং সেগুলি পারিপার্শ্বিক জীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকে না। শিখনের এই সামগ্রিক রূপে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান, নৈপুণ্য, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি অর্জন করে এবং পুস্তককে তথ্য ও ভাবের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে।

সংশ্লিষ্ট শিখন সাধারণতঃ চার প্রকারের কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে—কর্মসমস্যামূলক একক (project unit), সমস্যামূলক একক (problem unit), বিষয়মূলক একক (subject unit), এবং কর্মমূলক একক (activity unit)। কর্ম-সমস্যামূলক এককের আলোচনা আমরা পরে একাধিকবার করব।

সমস্যামূলক একক বলতে মুখ্যতঃ কোন বৌদ্ধিক সমস্যাসমাধানকে বোঝায়। বিষয়মূলক এককে বিভিন্ন বিষয়কে অর্থমূলক এককে বিভক্ত করা হয়, কিন্তু সব সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কিত করে দেখা হয় না। এই বিষয়মূলক এককগুলিকে অনেকে পূর্ণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষণমূলক কর্ম বলে মনে করেন না। তবে এখানে বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা হয়। কর্মমূলক এককে শিশুদের কোন স্বাভাবিক জীবনক্রিয়াকে স্থান দেওয়া হয়। এখানে শিশু তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কর্মের মাধ্যমে অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। অনেকে এই প্রকারের এককেই প্রকৃত সংশিষ্ট শিখনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেন।

শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের বিচারের তত্ত্বাবলী

বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক যে ভাবে অগ্রসর হন তাকে শিক্ষার পদ্ধতি বলা হয়। অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সাহায্যে মানুষ অনেক প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। সেই সবের মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বর্তমানে বহু আলোচিত ও প্রচলিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মূল্যায়ন সার্থক শিখন ও শিক্ষণের তত্ত্বগুলির নিরিখে করা উচিত।

প্রধান প্রধান পদ্ধতিসমূহ

১। **বক্তৃতামূলক পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে প্রধানতঃ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

২। **আলোচনামূলক পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে প্রধানতঃ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

৩। **অভ্যাসমূলক পদ্ধতি**—পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা অভ্যাস করার মাধ্যমে এই পদ্ধিতিতে শিক্ষাদান করা হয়।

৪। **প্রদর্শনমূলক (Demonstration) পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সমস্যাটিকে সমাধান করে প্রথমে দেখিয়ে দেন। তারপর শিক্ষার্থীরা তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করে।

৫। **গবেষণাগারের বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি**

পরীক্ষামূলক পদ্ধতিসমূহ হল উদ্ভাবন (discovery) ও সত্যতা নির্ণয়ের

(verification) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূল্যবান যন্ত্রপাতির চেয়ে মুক্ত মন ও প্রকৃত কৌতূহলের মূল্য অনেক বেশী।

৬। **কর্মসমস্যামূলক (Project) পদ্ধতি**—বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন। প্রথম প্রচলিত (কিছুটা সঙ্কীর্ণ) অর্থে এর দ্বারা বোঝায় বাস্তব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিকে। পরে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতিকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতের সঙ্গে আমরা পরে পরিচিত হব।

৭। **অভিনয়মূলক পদ্ধতি (Method of Dramatic Expression)**

এই পদ্ধতিতে শিশুদের স্বাভাবিক অভিনয়প্রীতি ও প্রবণতাকে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

৮। **আত্মসক্রিয়তার পদ্ধতি**

আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতিসমূহের উদ্দেশ্য হল শিশুর স্বাধীন শিখনের ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করা।

৯। **ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ (Play-way Methods)**

এই পদ্ধতিসমূহে শিশুদের স্বাভাবিক খেলার প্রবণতাকে কাজে লাগান হয়। এই পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বলা বাহুল্য, কর্মসমস্যামূলক পদ্ধতি ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিসমূহও মূলতঃ ক্রীড়াভিত্তিক।

১০। **ব্যক্তিগত কর্মনির্ভর পদ্ধতি**

শিক্ষার্থীরা কিছুটা বড় হয়ে উঠলে Dalton পদ্ধতি বা অনুরূপ ব্যক্তির স্বকর্মনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়।

১১। **সৃজনমূলক কর্মনির্ভর পদ্ধতি (Creative Work Method)**

এই পদ্ধতিতে সৃজনমূলক কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

১২। **সমস্যামূলক পদ্ধতি**

এই পদ্ধতিতে সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এই সমস্যা মানসিক বা বস্তুজগৎসম্পর্কিত উভয় প্রকারেরই হতে পারে।

নিয়মানুবর্তিতা ও শাস্তিবিধান

দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি

যেখানেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে সেখানেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। এদের অনুপস্থিতিতে যে সব কর্মের উপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাদের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, সমাজজীবন বিধ্বস্ত হয়। তবে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার রূপ ও প্রকৃতি সামাজিক আদর্শের (অর্থাৎ জীবনদর্শনের) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মৌলিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগের পূর্বে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হত, নিয়মপালন ও শান্তিরক্ষা করতে তাকে বাধ্য করা হত। এর কারণ স্পষ্ট। অগণতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ মানুষের উপর কোন শ্রদ্ধাই থাকে না তাই তার মতামতের উপরও কোন গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না। গণতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়ের ফলে কিন্তু অন্যান্য অনেক ধারণার মত নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। সমস্ত ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধাভাবের উদ্ভবের ফলে বলপূর্বক নিয়মপালন ও শান্তিরক্ষার উপর এখন আর জোর দেওয়া হয় না। এখন ব্যক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত নিয়মপালন ও শান্তিরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইতিপূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয়-জীবনে বাইরের সমাজ-জীবন প্রতিফলিত হয়। তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ছিল বাধ্যতামূলক ও বাহ্যিক এবং যুগানুযায়ী রূপান্তরের ফলে গণতান্ত্রিক যুগে এগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আভ্যন্তরীণ।

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা (Discipline and Order)

আধুনিক কালের অনেক শিক্ষাবিদ্ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে নিয়মানুবর্তিতা হল আভ্যন্তরীণ, কিন্তু শৃঙ্খলা হল বাহ্যিক। নিয়মানুবর্তিতার ফল সুদূরপ্রসারী, কিন্তু শৃঙ্খলার ফল সাময়িক।

তাঁদের এই মত যুক্তিসহ। সত্যই শৃঙ্খলা বলতে বোঝায় বাইরের আচরণগত সঙ্গতিকে এবং নিয়মানুবর্তিতা বলতে বোঝায় মনের সেই আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে যেখানে সে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত। একথাও সত্য যে, মনের স্থায়ী আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে নিয়মানুবর্তিতার ফল ও প্রভাব সুদূর-প্রসারী এবং বাহ্যিক আচরণের বিশেষ অবস্থা হিসাবে শৃঙ্খলার ফল সাময়িক। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কেননা বহিরাচরণের সঙ্গতির সাথে সাথে অনেক সময়ে চরম আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত থাকতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নিয়মানুবর্তিতা সব সময়ে আভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থাকে বোঝালেও অগণতান্ত্রিক সমাজে তার প্রধান উৎস থাকে বাইরে (অপরের বাধ্যতামূলক পরিচালনায়) এবং গণতান্ত্রিক সমাজে তার প্রধান উৎস থাকে মনের ভেতরে (মনের স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণে)। আরও বলা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতাসঞ্জাত শৃঙ্খলা ও অগণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতাসঞ্জাত শৃঙ্খলার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি কখনও এড়ায় না। অগণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার মধ্যে একটা শুষ্ক প্রাণহীনতা প্রকট হয়ে উঠে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে আনন্দপূর্ণ প্রাণোচ্ছাসের সংযত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাধীনতা

অগণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং সেখানে নিয়মানুবর্তিতা ছিল বাধ্যতামূলক বা স্বাধীনতাবিরোধী। পক্ষান্তরে গণ-তান্ত্রিক সমাজ হল ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সেখানের নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করে। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির মঙ্গল স্মরণ করে নিয়ম-কানুন প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই সব পালন করে। সুতরাং সেখানে নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরঞ্চ গণতন্ত্রে এই দুটি হল পরস্পরের প্রতিপূরক ধারণা। সেখানে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মানুবর্তিতার এবং নিয়মানুবর্তিতার জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার। অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তির ও অন্যান্য সকলের

স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মানুবর্তিতার এবং প্রাণবন্ত নিয়মানুবর্তিতার জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন নিয়মনির্ধারণ ও নির্বাচনের ক্ষমতা।

নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা

নিয়মানুবর্তিতার সংগে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়, কেননা নিয়মানু-বর্তিতা হল সুগঠিত ও সংহত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য হল সুষ্ঠু ও সংহত ব্যক্তিত্ব গঠন। অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা হল নৈতিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সমাজে নিয়মানুবর্তিতা যেমন বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি নৈতিক শিক্ষাও বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি। সমাজের জীবনাদর্শ সমাজের সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে। অগণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব হল কর্তৃত্বভীত ও নিয়মানুবর্তিতা হল বাধ্যতামূলক এবং গণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব হল স্বনিয়ন্ত্রিত এবং স্বাধীনচিন্তা ও কর্মপরায়ণ এবং নিয়মানুবর্তিতা হল স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার তত্ত্বাবলী

গণতান্ত্রিক সমাজে সুষ্ঠু নৈতিক শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত তত্ত্বাবলীর উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

১। নীতিশিক্ষা হল মূলতঃ সামাজিকতা শিক্ষা। অর্থাৎ সমাজবহির্ভূত অবস্থায় কোন নীতিগত প্রশ্ন উঠে না।

২। মানব-জীবনের সমস্ত কিছুই নীতির আওতায় পড়ে। অর্থাৎ নীতির ক্ষেত্র জীবনের কোন বিশেষ দিকে সীমিত নয়।

৩। নীতিশিক্ষার লক্ষ্য হল মঙ্গলময় সামাজিক পরিবেশে মঙ্গলময় মানব-ব্যক্তিত্বের গঠন।

৪। এইরূপ ব্যক্তিত্ব-গঠনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

৫। নীতিশিক্ষায়ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্থান রয়েছে। অর্থাৎ মঙ্গলময় ব্যক্তিত্বের একটি সাধারণ আদর্শ থাকলেও ব্যক্তিভেদে তার প্রকাশ হয় ভিন্ন।

৬। নীতিশিক্ষার আশু লক্ষ্য হবে যোগ্য নৈতিক জ্ঞানদান করা, নৈতিক মনোভাব তৈরী করা এবং নৈতিক অভ্যাসসমূহ গঠন করা।

৭। নৈতিক শিক্ষায় বিদ্যালয়-সমাজের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলময় সামাজিক জীবনের যোগ্য আদর্শ, মনোভাব ও অভ্যাস বিদ্যালয়-সমাজে যোগ্য জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই শিশুরা শিখবে। সুতরাং বাইরের সমাজ-জীবনের এটি হবে একটি পরিশুদ্ধ রূপ। তবে বাইরের সমাজ-জীবনের সমস্ত প্রাণবন্ত ধারার সমাবেশ এর মধ্যে হওয়া উচিত। বাইরের জীবনের সঙ্গে এইরূপ যোগ না থাকলে এখানে মঠসুলভ এক কৃত্রিম ও প্রাণহীন জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

৮। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার কাজ চলবে, যদিও নীতিশিক্ষার জন্য বিশেষ পাঠের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

৯। নীতিশিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নয়। সমাজের সমস্ত কিছুর প্রভাবই পড়ে মানব-ব্যক্তিত্বের উপর। সুতরাং বিদ্যালয়কে এই দিক দিয়ে বিশেষ অবহিত হতে হবে।

গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার তত্ত্বাবলী

আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজের মঙ্গল স্মরণ করে নিয়মগঠন ও পালন করে। এইরূপ নিয়ম গঠন ও পালন স্পষ্টতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-control) ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা বলতে বোঝায় মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অবস্থায় এই আত্মনিয়ন্ত্রণকে সার্থক হতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাংগ ও সংহত বিকাশের প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে যে, সার্থক নিয়মানুবর্তিতা সার্থক নৈতিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নৈতিক শিক্ষার তত্ত্বগুলি নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার বেলাতেও প্রযোজ্য। উপরের নীতিশিক্ষার তত্ত্বাবলীর সঙ্গে নিম্নের তত্ত্বাবলীকে যোগ করে দিলে বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতাশিক্ষা সার্থক রূপলাভ করবে, এমনি আশা করা যায়।

১। শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়-জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বসময়ে এমন সব অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে যার মধ্যে সদাচরণের বিকাশ সহজ হয়ে উঠবে।

২। আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য করে তোলে এমন সব অভ্যাস ও নৈপুণ্য শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত ভাল করে আয়ত্ত করিয়ে দিতে হবে।

৩। শ্রেণীকক্ষে বা বাইরে সর্বসময়ে শিক্ষকদের সেই সব কর্মের উপর

বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে যেগুলি সামাজিক জীবনযাপন ও শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৪। আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাইরের কর্তৃত্বের ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিতে হবে।

৫। মাঝে মাঝে গোলমাল হলেও উদ্দেশ্যপূর্ণ আত্মসক্রিয়তাকে শিক্ষকদের সর্বসময়ে সমর্থন করতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, শক্তি ইত্যাদির দিকে চেয়ে বিদ্যালয়ের কর্মাবলী নির্বাচিত করতে হবে।

৭। শিক্ষার্থীদের সমবেত ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

৮। নিয়মানুবর্তিতাশিক্ষা শুধু দমনমূলক হবে না। তার শেষ লক্ষ্য হবে আত্মনিয়ন্ত্রণ।

৯। সদাচরণের মাপকাঠি সহসা খুব উন্নীত করা উচিত নয়।

১০। নিয়মপালনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষার খুব প্রয়োজন রয়েছে।

১১। পিতা-মাতার মধ্যে এবং বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

১২। শিশু যেন কোন অবস্থাতেই না মনে করে তাকে কেউ ভালবাসে না। শিশুর মানসিক নিরাপত্তাবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

১৩। যেখানে পরিবেশের প্রভাবে শিশুর আচরণিক ত্রুটির উদ্ভব হয়, সেখানে শিশুর উপর অযথা চাপ না দিয়ে পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করবার প্রচেষ্টা করা উচিত।

শৃঙ্খলারক্ষার তত্ত্বাবলী

আমরা দেখেছি যে, শৃঙ্খলারক্ষা নির্ভর করে নিয়মানুবর্তিতার উপর এবং নিয়মানুবর্তিতা নির্ভর করে নৈতিক বিকাশের উপর। সুতরাং নৈতিক বিকাশ ও নিয়মানুবর্তিতাসম্পর্কিত তত্ত্বাবলী পরোক্ষভাবে শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বেরও উল্লেখ করা যায় যেগুলি অনুসরণ করলে শৃঙ্খলারক্ষা সহজ হয়ে পড়ে। নিম্নে শৃঙ্খলারক্ষাসম্পর্কিত বিশেষ তত্ত্বাবলীর উল্লেখ করা হল।

১। শিক্ষকদের দেখাতে হবে যে, তাঁরা শিক্ষার্থীদের নিকটে পূর্ণ শৃঙ্খলারক্ষা আশা করেন।

২। শিক্ষার্থীদের নামগুলি জানতে হবে এবং নাম ধরে ডাকতে হবে।

৩। নির্দেশ (direction) ও আদেশ (command) সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে এবং সেই নির্দেশ ও আদেশ মানা হবে এমনি আশা প্রকাশ করতে হবে।

৪। প্রত্যেক দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫। শ্রেণীকক্ষের পরিচালনাকার্য সহজ করে তুলতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের কর্মব্যস্ত রাখতে হবে।

৭। শিক্ষককে নিজের প্রক্ষোভসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

৮। শাস্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারীকে অনুসন্ধান করে বার করতে হবে।

৯। ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তিবিধান করা উচিত নয়।

১০। ভীতিপ্রদর্শন করলেই তার লিখিত বিবরণ রাখা উচিত এবং পরে সেই ভীতি প্রদর্শন যথাসম্ভব কম করে দেওয়া উচিত।

নিয়মানুবর্তিতাসম্পর্কিত সমস্যাসমূহ

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রকারের নিয়মানুবর্তিতাসম্পর্কিত ত্রুটি দেখা যায়। এই ত্রুটিগুলির গুরুত্ব এক প্রকারের নয় এবং এদের নিরাকরণের পন্থাও এক প্রকারের নয়। নিম্নে সাধারণ কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করা হল ঃ

১। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি।

২। শ্লথতা।

৩। বিদ্যালয় থেকে পালান।

৪। শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠবহির্ভূত বস্তু সম্বন্ধে লেখা।

৫। ফিস্ ফিস্ করা।

৬। অন্যমনস্কতা।

৭। সাধারণ নিয়মাবলী ভঙ্গ করা।

৮। আদেশ অমান্য করা।

৯। অস্থিরতা।

১০। অপবিত্র বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার।

১১। অহেতুক ভীতি।

১২। ইচ্ছা করে কর্মে ত্রুটি করা।

১৩। বদ্ মেজাজ।

১৪। জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া।

১৫। জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলা।

১৬। মার-ধোর করা।

১৭। নৈতিক অবনতি।

আচরণগত এক একটি ত্রুটির নানা প্রকারের কারণ থাকে। সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটি হল বংশধারা-উদ্ভূত, আবার কোনটি হল পরিবেশ-সঞ্জাত। উৎপত্তির এই জটিলতার জন্য ত্রুটিগুলির জন্য সাধারণ কোন ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনস্তাত্ত্বিকরা আচরণগত ত্রুটির কারণ নির্ণয়, প্রতিষেধ ও নিরাকরণের জন্য যে সব সাধারণ ব্যবহারিক নির্দেশ (practical suggestion) দিয়েছেন সেইগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকলে ঐ সমস্ত ত্রুটিকে আয়ত্তে আনা কিছুটা সহজসাধ্য হতে পারে। নিম্নে মনস্তাত্ত্বিকদের সেই সব সাধারণ নির্দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল ঃ

আচরণগত ত্রুটির কারণসমূহ

আচরণগত ত্রুটির কারণসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (১) জীববিদ্যাসম্পর্কিত কারণসমূহ, (২) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত কারণসমূহ, (৩) সামাজিক কারণসমূহ ও (৪) অবস্থার আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ।

১। জীববিদ্যাসম্পর্কিত কারণসমূহ

অনেক আচরণগত ত্রুটির কারণ শুধু দৈহিক হতে পারে। চোখ খারাপ, কানে কম শোনা, সাধারণ দুর্বলতা, গ্রন্থিগত গোলমাল (glandular disturbances) ইত্যাদি নানাপ্রকারের আচরণিক ত্রুটির মূলে থাকতে পারে :

২। ব্যক্তিত্বসম্পর্কিত কারণসমূহ

ব্যক্তিত্বসম্পর্কিত ত্রুটির জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আচরণিক ত্রুটি দেখা যায়। উগ্র স্বার্থবোধ, মানসিক শক্তির অভাব, মানসিক অপরিণতি,

খারাপ ব্যবহারের অনুকরণ, অত্যধিক আত্মসচেতনতা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় আচরণগত ত্রুটির উদ্ভব হয়।

৩। সামাজিক কারণসমূহ

বাইরের সামাজিক জীবনে এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তার প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণে ত্রুটির উদ্ভব হয়। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মিথ্যা, শাঠ্য, নির্দয়তা, জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি শিশুদের নমনীয় ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ কুপ্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়েও ঐ জাতীয় ত্রুটির উদ্ভব হলে শিশুর আচরণিক বিকৃতি ঘটে।

(৪) শিখন-অবস্থার মধ্যে নিহিত কারণসমূহ

শিক্ষকের ব্যবহার, কর্মসূচি, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের পূর্বপ্রস্তুতি, শ্রেণী-কক্ষের অবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের ব্যবহার খারাপ হলে, কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের শক্তি, রুচি ও প্রবণতা নিরপেক্ষ হলে, শিক্ষণ-পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত হলে, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি না থাকলে এবং শ্রেণীকক্ষের ত্রুটি থাকলে শিক্ষার্থীদের আচরণে ত্রুটির উদ্ভব হতে পারে।

প্রতিষেধক উপায়সমূহ

শিক্ষার্থীদের আচরণিক ত্রুটির প্রতিষেধকরূপে নিম্নের উপায়গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতা

শিক্ষক যদি ছাত্রদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন এবং তাঁর যদি প্রক্ষোভগত স্থৈর্য, মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে বেশীর ভাগ ছাত্র আচরণগত ত্রুটিমুক্ত হবে।

(২) যোগ্য পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি

পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বয়স, ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হলে শিক্ষার্থীদের আচরণগত ত্রুটি অনেকটা কম হবে।

(৩) সুসাধ্য লক্ষ্য

পাঠের লক্ষ্য যদি ছাত্রদের সাধারণ চেষ্টা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলেও কম ত্রুটির উদ্ভব হবে।

(৪) শিক্ষকের উদ্দীপনা

শিক্ষক যদি পাঠদানে উৎসাহী হন তাহলে ছাত্ররাও সচরাচর উৎসাহী হয়ে উঠে এবং তখন আচরণগত ত্রুটিও কম ঘটে।

(৫) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস

শিক্ষকের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তিনি যদি ছাত্রদের সর্ববিষয়ে বিশ্বাস করেন, তাহলে ছাত্ররা খারাপ আচরণে কম প্রবৃত্ত হবে।

(৬) বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শাসনে ছাত্রসহযোগিতা

বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শাসন ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা করতে দিলে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়মভঙ্গে কম উৎসাহ বোধ করবে।

(৭) সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিদ্যালয়ে যেমন সহযোগিতামূলক ব্যবহারের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবহারের সুযোগ থাকাও প্রয়োজন, কেননা তার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের সুযোগ কিছুটা মেলে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দলগত ও নিজের সঙ্গে যতটা হয় ততটাই ভাল। নিজের সমশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে সবসময়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সদ্ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হওয়া উচিত।

(৮) শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা

ছাত্রদের আচরণের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাব সর্বজয়ী হয় না এই কারণে যে, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব এই বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী হয়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা এখনও এই বিষয়ে পরিবারের প্রভাব (অন্ততঃ শৈশবে) অনেক বেশী কার্যকরী। সুতরাং অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের নিবিড় সংযোগ থাকা প্রয়োজন।

(৯) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে সংযোগ

শিক্ষাদানের সমস্ত প্রভাবশীল সংস্থার সঙ্গেও ব্যাপক সংযোগ থাকা প্রয়োজন, কেননা এককভাবে কিম্বা শুধু অভিভাবকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও বিদ্যালয়ের সাধ্য নেই আজকের শিক্ষার্থীদের আচরনকে শিষ্টাচারের পরিধির মধ্যে সীমিত রাখার। সরকার, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন, রেডিও, ক্রীড়ামূলক সংস্থা ইত্যাদির বিপুল প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া ভিন্ন কোন উপায় নেই। বলা বাহুল্য, এই সব সংস্থার প্রভাব শিক্ষার্থীদের বয়স বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশী কার্যকরী হয়।

শাস্তিবিধান

শাস্তিবিধান-সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ

ত্রুটি নিরাকরণের জন্য বিদ্যালয়ে নানা প্রকারের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সব ছাত্রের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থা সমান কার্যকরী হয় না, আবার সব শিক্ষক সমান দক্ষতার সঙ্গে একই কৌশলকে ব্যবহার করতে পারেন না। তথাপি শাস্তিবিধান সম্পর্কে এমন কতকগুলি তত্ত্বের উল্লেখ করা যায় যেগুলিকে মনে রাখলে শাস্তিবিধানের কৌশলগুলিকে বিশেষ কার্যকারিতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলির উল্লেখ করা হল ঃ

১। ছাত্ররা শাস্তিবিধানের কারণ যেন বুঝতে পারে।

২। নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। শিক্ষককে যুক্তিবাদী হতে হবে।

৪। যথাসম্ভব গোপনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। শিক্ষককে ক্রুদ্ধ হলে চলবে না।

৬। অপরাধীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

৭। শাস্তির ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখতে হবে।

৮। একজনের জন্য সকলকে শাস্তি দান করা ঠিক নয়।

৯। শাস্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকলে চলবে না।

১০। শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে।

১১। অপরাধীকে যতশীঘ্র সম্ভব সাদরে পুনঃগ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১২। শাস্তিবিধান ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা চাওয়া উচিত।

১৩। শিক্ষকদের মধ্যে মতৈক্য প্রয়োজন।

১৪। প্রয়োজনমত অভিভাবকদের সমর্থন প্রয়োজন।

১৫। গৃহীত ব্যবস্থার আশু ফল অপেক্ষা দূরের ফলের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইতিবাচক।

১৭। শিক্ষার্থীদের অপরাধকে সাধারণতঃ স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার ফল না মনে করে অভিযোজন-সম্পর্কিত ত্রুটির বহির্লক্ষণ বলে মনে করা উচিত।

১৮। যেখানে অপরাধ স্পষ্টতঃ পরিবেশের প্রভাবে ঘটে সেখানে বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে অপরাধীকে দেখতে হবে এবং তাই শাস্তিবিধান ও তার প্রকাশ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হতে হবে।

শিক্ষকের যদি ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে এবং তিনি যদি কল্পনাশক্তিপ্রবণ (imaginative) হন তাহলে উপরোক্ত তত্ত্বগুলির প্রয়োগে বিশেষ সুফল হওয়া সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকারের শাস্তিবিধানের মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আচরণগত ত্রুটির জন্য নানাপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। নিম্নে শাস্তিদানের কতকগুলি সাধারণ পদ্ধতির মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হল।

(১) ক্ষমা চাওয়া

অপরের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা উদ্রেক করা বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। সেইজন্য অপরের অধিকার খর্ব করলে শিক্ষার্থীদের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখতে হবে ক্ষমা চাওয়া যেন আন্তরিক হয়, অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়া যেন কোন প্রকারে শুধু মৌখিক ভাষায় পর্যবসিত না হয়।

(২) স্থান পরিবর্তন

অপরাধী শিক্ষার্থী যদি বোঝে যে তার আচরণ সংশোধনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাহলেই কেবল সুফল আশা করা যায়।

(৩) অধিকার খর্ব

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা আছে। তবে দেখতে হবে যেন অধিকারহরণ কোনরূপে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায়।

(৪) বিদ্যালয়ে আটক

অন্য ছাত্ররা যখন বিদ্যালয়ের বাইরে যায় তখন কোন কোন ত্রুটির জন্য অপরাধী ছাত্রকে বিদ্যালয়ে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে দেখতে

হবে সে সময়ে কিছু কাজ যেন দেওয়া হয় এবং সেই কাজ যেন অপরাধী ছাত্রের উপকারে আসে।

(৫) অগ্রাহ্য করা

অপরাধী ছাত্রের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা (তার অপরাধকে নয়) এক প্রকারের শাস্তিবিধান।

(৬) ব্যক্তিগত আলোচনা

আচরণিক পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা ভাল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হল এইটি। অপরাধী ছাত্রের সঙ্গে তার ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং শিক্ষকের মনোভাব সম্বন্ধে তাকে পূর্ণভাবে সচেতন করা হল এই পদ্ধতির মূল কথা।

(৭) ভৎর্সনা করা

সব সময়ে ভৎর্সনা করা খুব খারাপ। তবে কখনও কখনও বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভৎর্সনা খুব কার্যকরী হয়।

৮। লজ্জা দেওয়া

ছোট ছেলেদের বেলায় এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়, কিন্তু বড়দের বেলায় এতে কোন ফল হয় না কিম্বা ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তবে বড়দের বেলায় অন্য ছাত্রদের বিরূপতা ও নিন্দার উদ্রেককরণ বিশেষ কার্যকরী হয়।

৯। প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রেরণ

এই পদ্ধতির ব্যবহার সহজে করা উচিত নয়, কেননা ছাত্ররা তাহলে শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তবে প্রকৃত সাহায্যের প্রয়োজন হলে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য চাওয়া উচিত।

১০। অভিভাবকদের জানান

এই পদ্ধতিরও ব্যবহার সহজে করা উচিত নয় তবে প্রয়োজন হলে করা উচিত এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করলে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয়।

১১। দৈহিক শাস্তি

এই ব্যবস্থা খুব হিসাব করে গ্রহণ করলে কার্যকরী হয়। তবে এর ব্যবহার না করাই ভাল, কেননা সঠিকভাবে একে প্রয়োগ করা খুব কঠিন এবং দৈহিক কষ্টদান মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়।

পুরস্কার প্রদান

শাস্তিবিধানের কথা উঠলেই পুরস্কার প্রদানের কথা উঠে, কেননা মন্দ কাজের জন্য যেমন সাধারণতঃ শাস্তিদান করা হয়, তেমনি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। বস্তুরূপে (material object) বা অবস্তুরূপে সাধারণতঃ পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের বিরুদ্ধে শিক্ষার উচ্চতর আদর্শের দিক থেকে নানা প্রকারের আপত্তি করা হয়ে থাকে। তবে যেহেতু বাইরের জগতে পুরস্কারের প্রচলন যথেষ্ট, সেইহেতু বিদ্যালয়েও তার প্রচলন বন্ধ হয় নি, যদিও বর্তমানে বস্তু অপেক্ষা অ-বস্তুরূপেই তার প্রকাশ বেশী ঘটছে। পুরস্কারের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ নিম্নের যুক্তি কয়টি উপস্থাপিত করা হয়েছে :

১। পুরস্কারদানের দ্বারা হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করা হয়।

২। উচ্চ উদ্দেশ্যের স্থানে নিম্নপ্রকারের উদ্দেশ্যকে স্থাপন করা হয়।

৩। জন্মগত উচ্চাংগের গুণাবলীকে পুরস্কৃত করা হয়।

৪। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে।

উপরের যুক্তিগুলি অনেকাংশে সমীচীন হলেও নিম্নের তত্ত্বগুলির কথা ভাল করে স্মরণ রাখলে পুরস্কারের কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায় :

১। পুরস্কার দূরের ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ পুরস্কার সহজে দেওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র ধারাবাহিক প্রয়াসের ফলরূপে এর প্রকাশ হওয়া উচিত।

২। দেখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে যেন পুরস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুরা কাজ না করে। অর্থাৎ পুরস্কার অতর্কিতভাবে আসা উচিত।

৩। সাধারণ আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেই পুরস্কার দেওয়া উচিত।

৪। উচ্চ নীতিগত বিষয়ে পুরস্কারের ব্যবহার করা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে ফলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে।

৫। সার্থক চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মানসিক গুণাবলীর জন্য কখনও পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। এই দিক থেকে A. Q. এর উপর নির্ভর করে পুরস্কারপ্রদানের কথা উঠে।

৬। মূল্যবান বস্তুমূলক পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়।

৭। অবস্তুমূলক পুরস্কারের উপর জোর দেওয়া উচিত।

৮। যেখানে সম্ভব দলগত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

৯। শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তরানুযায়ী পুরস্কারের প্রকৃতি বদলান উচিত।

১০। বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার কর্মের জন্যই পুরস্কার প্রদান করা উচিত। তার ফলে প্রায় সমস্ত শিক্ষার্থীই কোন না কোন বিষয়ে পুরস্কৃত হবে।

দার্শনিক মতবাদসমূহ ও নিয়মানুবর্তিতা

নরম্যান্ ম্যাক্‌ম্যুন্ (Norman Macmunn) ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহকে তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন : (১) অবদমন-মূলক (repressive). (২) ব্যক্তিত্বের প্রভাবমূলক (impressionistic) ও (৩) বহিঃপ্রকাশমূলক (expressionistic)। নিম্নে এই তিন শ্রেণীর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(১) অবদমনমূলক

অবদমনবাদীরা সর্বসময়ে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার দাবী করেন এবং এই শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শাস্তিবিধানে সর্বসময়ে বিশেষ তৎপর হন।

(২) ব্যক্তিত্বের প্রভাবমূলক পদ্ধতি

শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর যে সব শিক্ষাবিদ্ গুরুত্ব অর্পণ করেন তাঁদের মতে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান অস্ত্র হওয়া উচিত শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। এঁদের মতে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বারা এবং তাঁর নৈতিক উপদেশ ও উদ্ভাবিত ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষক বিদ্যালয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন।

(৩) বহিঃপ্রকাশমূলক পদ্ধতি

যে সব শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেন তাঁদের মতে শিশুপ্রকৃতির বাধাহীন প্রকাশের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এঁরা মনে করেন যে, শিশুর আদিম প্রকৃতি হল সৎ এবং তাই তার বল্গাহীন বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উপরে তিনটি শ্রেণীর পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অবদমনমূলক পদ্ধতিগুলি প্রায় সর্বাংশে বর্জনীয়, কেননা এগুলি নৃশংস, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির বিরোধী ও ভয়ের মতন সৃজনবিরোধী প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের

প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত নয়, কেননা উন্নত ধরণের ব্যক্তিত্বের শিক্ষক খুব বেশী নেই এবং শিশুদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তারও তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে শিশুর আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের বল্গাহীন বিকাশও কাম্য হতে পারে না, কেননা সমাজবদ্ধ মানুষকে কিছুটা (এবং আজকের দিনে অনেকটা) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করতেই হবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অবশ্যই প্রধানতঃ স্বাধীনতানির্ভর হওয়া উচিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের পরিমিত প্রভাব এবং অতি সামান্য হলেও কিছুটা অবদমনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা দেখেছি যে সমস্ত সমস্যাই হল মূলতঃ দার্শনিক সমস্যা এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মত উপস্থাপিত করেছে। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বিষয়েও বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছে। নিম্নে এই সব মতের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(১) ভাববাদ

প্রাক্ আধুনিক ভাববাদ দেহের চেয়ে মন ও আত্মার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করত বলে দমনমূলক মতবাদের সমর্থক ছিল। আধুনিক ভাববাদ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর বেশী জোর দেয়, কিন্তু এখানেও মন ও সঞ্চিত মানসিক সংস্কৃতি শিক্ষকের প্রভাবের মাধ্যমে প্রাধান্যলাভ করে। রূপান্তরের পরেও ভাববাদের মৌল প্রেরণা এইভাবে অক্ষুণ্ণ রয়ে যায়।

২। প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতিবাদীরা প্রকাশমূলক পদ্ধতিসমূহের সমর্থক, কেননা তাঁরা শিশুর আদিম প্রকৃতির পবিত্রতার উপর বিশেষভাবে আস্থাশীল। তাঁরা বহিঃপ্রকৃতির (nature) পক্ষপাতহীন শাস্তিদানের দৃঢ় সমর্থক, মানুষের শাস্তিবিধানে তাঁদের আস্থা নেই।

৩। প্রয়োগবাদ

প্রয়োগবাদীশ্রেষ্ঠ ডিউইর মতে সামাজিক পরিবেশে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আগ্রহসঞ্চারক কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। শিক্ষকের প্রভাব এখানে

মূলতঃ পরোক্ষভাবে কাজ করে। সার্থক পরিবেশ-পরিচালনার মাধ্যমেই এখানে শিক্ষক শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেন। স্পষ্টতঃ এই মতবাদ অনুসারে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তি হল শিশুর স্বাধীনতা, আত্মসক্রিয়তা ও আগ্রহ এবং সামাজিক পরিবেশ। একটু পূর্বেই বহিঃ-প্রকাশমূলক পদ্ধতিসমূহের আলোচনার সময়ে আমরা ভাববাদী ও প্রকৃতিবাদী মতের মূল্য নিরূপণ করেছি। সুতরাং এখানে শুধু প্রয়োগবাদী মতের মূল্য-নিরূপণ প্রয়াসে কিছু মন্তব্য করা হবে। ব্যক্তি ও সমাজ এবং স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা এই সবেরই দাবী স্বীকার করার জন্য প্রয়োগবাদীদের মত আজকাল সর্বাধিক প্রচলিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এই মতে খুব বেশী সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দমনমূলক পদ্ধতি ও প্রয়াসকে একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব খুব যুক্তিসঙ্গত নয়।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষার স্বরূপ ও উপকারিতা

উত্তম শিক্ষক, উত্তম উপকরণ, প্রাসাদোপম বিদ্যালয়ের বাড়ী, উত্তম বিষয়বস্তু ও শিক্ষণপদ্ধতি সব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না সেগুলির দ্বারা শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত স্বাস্থ্য যোগ্যভাবে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধিক শিক্ষা নিরর্থক, এমন কি ক্ষতিকারকও হয়ে পড়ে, যদি না সেই শিক্ষার ধারক ও বাহক (শিশু) দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত দিক দিয়ে সুরক্ষিত হয়। সেইজন্য দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের মূল্য সর্বাধিক।

বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভাল বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। তাই সমস্ত শিক্ষকই হলেন একদিক দিয়ে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের শিক্ষক। তবে সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই আজকাল দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সুস্থ ও সবল দেহ ও মন গঠন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযোগী জ্ঞান এবং যোগ্য মনোভাব ও অভ্যাস গঠনের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ১। ব্যক্তি ও ২। পরিবেশের নানা প্রভাব। স্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করতে হলে বিদ্যালয়ে এই দুই শ্রেণীর উপাদানের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, বর্তমানকালে স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য দুইকেই স্থান দেওয়া হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থার পিছনে যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা দুয়েরই সমর্থন রয়েছে, কেননা দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের একের স্বাস্থ্য অপরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যেমন মানসিক ও প্রক্ষোভগত বিপত্তির জন্য নানাপ্রকারের দৈহিক ত্রুটির উদ্ভব হতে পারে তেমনি দৈহিক ত্রুটির জন্য মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিপত্তিও ঘটতে পারে। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের এই নিবিড় সম্পর্কের কথা মনে রেখে নিম্নে আমরা উভয়ের পৃথক আলোচনা করব, কেননা ঐরূপ আলোচনার মাধ্যমেই উভয়ের দিকে যোগ্য লক্ষ্য রাখা এবং উভয়ের প্রকৃতির উপর যোগ্য আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা

দৈহিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়কে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা, নানাপ্রকারের স্বাস্থ্যপ্রদ কর্মাবলীর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত উপযোগী মনোভাব ও অভ্যাসগঠন ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নে সংক্ষেপে এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(১) দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা (Physical Health Services)

বর্তমানে দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিভাগ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে সহযোগিতা করে নানাপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি নানাপ্রকারের হয় এবং সংখ্যাও হয় বহু। যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল উত্তম গৃহ ও উপকরণ, আলো-বাতাসের ভাল ব্যবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্যকর অবস্থার ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, দ্বিপ্রহরে জলপান ও আহারের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(২) স্বাস্থ্যপ্রদ কর্মাবলীর ব্যবস্থা

দেহের শক্তি-সামর্থ্য এবং মানসিক রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে দৈহিক চর্চার ব্যবস্থা করা যায় তার দ্বারা সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করা এবং ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেহচর্চার জন্য নানাপ্রকারের বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা খুব বেশী করে করা হত, কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত না হলেও বেশী জোর দেওয়া হয় স্বতঃস্ফূর্ত খেলা, সংগঠিত খেলাধূলা, সন্তরণ, ছন্দোময় অঙ্গসঞ্চালন এবং গণনৃত্য-গীত ইত্যাদির উপর। বর্তমানে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, সূর্যালোকে ও মুক্ত স্থানে দেহচর্চার উপরও খুব বেশী জোর দেওয়া হয়। যাদের দেহ দুর্বল বা যারা দৈহিক ত্রুটিযুক্ত তাদের জন্য উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত দেহচর্চার ব্যবস্থাও করা হয়।

(৩) স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানদান

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে। উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে সমস্ত সাধু ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এই

জ্ঞান স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হবে এবং তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য দুই বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞান সন্নিবেশিত হবে।

(৪) স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যোগ্য মনোভাব গঠন

প্রক্ষোভজনিত উদ্দীপন ব্যতীত শুধু জ্ঞান মোটেই কার্যকরী হয় না। তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যোগ্য মনোভাব গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্যকে ভালবাসতে এবং অস্বাস্থ্যকে ঘৃণা করতে শিক্ষাদান করতে হবে।

(৫) স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যোগ্য অভ্যাস সৃষ্টি

বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্যকর নৈপুণ্য ও অভ্যাস সৃষ্টিও স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। এই অভ্যাসগঠনের জন্য যোগ্য জ্ঞানদান ও সেই জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থাও উত্তমরূপে করতে হবে। এই প্রয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে করতে হবে। এই বিষয়ে গৃহের সঙ্গে সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

যৌনশিক্ষা

যৌনশিক্ষা দৈহিক স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্গত। যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের কর্তব্য কি এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ এখনও রয়েছে। তবে যদি প্রকৃতিগতভাবে এবং শিক্ষার দিক থেকে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীরা যদি এই শিক্ষালাভের জন্য সম্যক্‌ভাবে মানসিক প্রস্তুতি (mental readiness) লাভ করে থাকে তাহলে বিদ্যালয় যৌনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই সর্ত দুটি রক্ষা করা সাধারণতঃ কঠিন হয়ে উঠে বলে জীববিদ্যাপাঠের মাধ্যমে জীবনের আরম্ভ ও বৃদ্ধির বিষয়ে যে শিক্ষা বর্তমানে দেওয়া হয় তাই যৌনশিক্ষার জন্যও উপযোগী বলে মনে করা হয়। যৌন আচরণগত ত্রুটি নিরাকরণের জন্য উত্তমরূপে শিক্ষিত ও প্রক্ষোভগত স্থৈর্যসম্বলিত শিক্ষকের প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা

ছেলেরা যখন বিদ্যালয়ে প্রথমে আসে তখন কতকগুলি প্রক্ষোভনির্ভর আচরণিক অভ্যাস সঙ্গে নিয়ে আসে। এই অভ্যাসগুলির মধ্যে কতকগুলি

ক্ষতিকারকও হতে পারে, যেমন, অত্যধিক লজ্জা, ভয়, আবেগ এবং সংঘর্ষপ্রিয়তা ইত্যাদি। ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলির শোধনের জন্য বিচক্ষণ পরিচালনার প্রয়োজন। যে সব শিশু ক্ষতিকারক অভ্যাস নিয়ে আসে না তাদেরও বিদ্যালয়ের নূতন জীবনের সঙ্গে সম্যক্ অভিযোজনের জন্য সুষ্ঠু-পরিচালনা প্রয়োজন। বিদ্যালয়-জীবনের নিম্নতম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীর সাহায্য প্রয়োজন। শিশুদের যদি ভালভাবে আত্ম-জ্ঞান (self-understanding) দান করা হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত আচরণিক ত্রুটি অনেকটা এড়ান যায়। বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্য হল আত্ম-জ্ঞানের উপরেই নির্ভরশীল। এরই ভিত্তির উপর সুষম, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে তুলতে পারে প্রধানতঃ নিজের দোষ-ত্রুটির স্বরূপ জেনে এবং তাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে দূরীভূত করার প্রচেষ্টা করে। প্রক্ষোভ-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখান খুব অল্প বয়স থেকেই যায় এবং শেখান উচিতও, কেননা অতি শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের গঠন সুরু হয়ে যায় এবং অতি শৈশবের ভুল-ত্রুটির ফল বহুকাল পরেও অনুভূত হয়। বিখ্যাত মানসিক স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ জে, জে, বি, মর্গ্যানের মতে বেশীর ভাগ সামাজিক অভ্যুত্থান প্রক্ষোভজনিত শিশুত্বের ('emotional infantilism') জন্যেই সংঘটিত হয়। সামাজিক জীবনের এই অতি-মনস্তাত্ত্বিক সংব্যাখ্যান গ্রহণ না করেও একথা মেনে নেওয়া যায় যে, প্রক্ষোভের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক এবং এই শিক্ষা এযাবৎ খুবই অনাদৃত হয়ে এসেছে। মর্গ্যান ঠিকই বলেছেন যে, সমাজ এযাবৎকাল নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করেছে, নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থাও করেছে, কিন্তু নৈতিক আদর্শানুযায়ী বাঁচবার জন্য যোগ্য প্রক্ষোভগত শিক্ষা দেয়নি।

মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই বর্তমানে স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে। দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকই হলেন শিক্ষক, কেননা প্রত্যেক শিক্ষকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করা। তবে এখানেও বিশেষ শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা। সুস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা গঠন করতে হলে বিশেষভাবে

দেখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা যেন কোন অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশল আয়ত্ত না করে বসে। অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশলগুলির মধ্যে দিবাস্বপ্ন, অযৌক্তিক ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি, পরকে ছোট করে বা পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা, নিজের অবাঞ্ছিত কর্মের ব্যাখ্যার জন্য সদ্‌যুক্তিসমূহের অবতারণা, অতীতের সাফল্যের কথা ভেবে বর্তমানের দুরবস্থার কথা ভোলবার চেষ্টা, নিজের মনের জোর বজায় রাখবার জন্য অত্যধিক এবং অযৌক্তিক লড়াই বা তর্ক করা, অবাঞ্ছিত কিন্তু বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মবোধ (identification) ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়।

দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদানই যথেষ্ট নয়, মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ বিদ্যালয় জীবনে থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে বিচক্ষণ পরিচালকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের এমন সব কর্মে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত যেগুলির মাধ্যমে তারা ভাল খেলোয়াড়ের মনোভাব, অপরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, বাঞ্ছিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণ, অপরের জন্য চিন্তা ও সুবিবেচনা, আত্মশ্রদ্ধা, জয়-পরাজয়কে ধীরভাবে গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী সহজেই অর্জন করতে পারে।

যৌন শিক্ষা

দৈহিক স্বাস্থ্যশিক্ষায় যেমন যৌনশিক্ষার স্থান আছে, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষায়ও যৌনশিক্ষার স্থান আছে, কেননা যৌন বিষয়ের দৈহিক দিকের মত মানসিক দিকও আছে। যৌনসম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত পরিণত শিশু ও কিশোরদের অবহিত করে তোলা যায়। যৌনশিক্ষার এই দিকে পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক, উত্তম প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণের স্বরূপ, বিবাহিত জীবনের জন্য যোগ্য প্রস্তুতির স্বরূপ, বালক-বালিকাদের পারস্পরিক মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতায় বড়দের তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশা ও কাজ করার প্রচুর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ফলে তারা পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে ও কাজ করতে শেখে।

এটা সহজেই বোধ্য যে, এই মেলামেশার সুযোগ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী

স্বভাবতঃই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। কিন্তু প্রায় সর্ব অবস্থাতেই কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই নীতিগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের কাজে যেসব শিক্ষক ব্যাপৃত থাকবেন তাঁদের প্রক্ষোভগত স্থৈর্য ও উপযোগী বিশেষ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

(২) বিদ্যালয়ের অভ্যাসসমূহ যাতে গৃহে ও চারপাশের সমাজে সঞ্চারিত হয় তার প্রতি অবহিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গৃহ ও চারপাশের সমাজের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা।

(৩) যতদূর প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষাদানের সঙ্গে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) উত্তম চারিত্রিক গুণরাজির বিকাশের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ থাকা উচিত।

(৫) প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বিকাশ নানা প্রকারের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সাধিত করা প্রয়োজন।

(৬) শিশুদের বয়স, চাহিদা, রুচি, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নির্ধারিত করা উচিত।

(৭) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের কার্য সংহত হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-শিক্ষার পরোক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষকেরই সচেতনভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৮) সুস্থ দৈহিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশের জন্য সুস্থ জীবনদর্শন নির্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

(৯) স্বাস্থ্যশিক্ষা আদৌ কেতাবী হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ের কেতাবী শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার স্বরূপ

প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত জ্ঞান ও অভ্যাসকে এই স্তরে আরও বর্ধিত ও

দেখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা যেন কোন অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশল আয়ত্ত না করে বসে। অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশলগুলির মধ্যে দিবাস্বপ্ন, অযৌক্তিক ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি, পরকে ছোট করে বা পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা, নিজের অবাঞ্ছিত কর্মের ব্যাখ্যার জন্য সদ্যুক্তিসমূহের অবতারণা, অতীতের সাফল্যের কথা ভেবে বর্তমানের দুরবস্থার কথা ভোলবার চেষ্টা, নিজের মনের জোর বজায় রাখবার জন্য অত্যধিক এবং অযৌক্তিক লড়াই বা তর্ক করা, অবাঞ্ছিত কিন্তু বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মবোধ (identification) ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়।

দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদানই যথেষ্ট নয়, মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ বিদ্যালয় জীবনে থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে বিচক্ষণ পরিচালকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের এমন সব কর্মে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত যেগুলির মাধ্যমে তারা ভাল খেলোয়াড়ের মনোভাব, অপরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, বাঞ্ছিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণ, অপরের জন্য চিন্তা ও সুবিবেচনা, আত্মশ্রদ্ধা, জয়-পরাজয়কে ধীরভাবে গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী সহজেই অর্জন করতে পারে।

যৌন শিক্ষা

দৈহিক স্বাস্থ্যশিক্ষায় যেমন যৌনশিক্ষার স্থান আছে, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষায়ও যৌনশিক্ষার স্থান আছে, কেননা যৌন বিষয়ের দৈহিক দিকের মত মানসিক দিকও আছে। যৌনসম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত পরিণত শিশু ও কিশোরদের অবহিত করে তোলা যায়। যৌনশিক্ষার এই দিকে পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক, উত্তম প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণের স্বরূপ, বিবাহিত জীবনের জন্য যোগ্য প্রস্তুতির স্বরূপ, বালক-বালিকাদের পারস্পরিক মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতায় বড়দের তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশা ও কাজ করার প্রচুর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ফলে তারা পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে ও কাজ করতে শেখে।

এটা সহজেই বোধ্য যে, এই মেলামেশার সুযোগ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী

স্বভাবতঃই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। কিন্তু প্রায় সর্ব অবস্থাতেই কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই নীতিগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের কাজে যেসব শিক্ষক ব্যাপৃত থাকবেন তাঁদের প্রক্ষোভগত স্থৈর্য ও উপযোগী বিশেষ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

(২) বিদ্যালয়ের অভ্যাসসমূহ যাতে গৃহে ও চারপাশের সমাজে সঞ্চারিত হয় তার প্রতি অবহিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গৃহ ও চারপাশের সমাজের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা।

(৩) যতদূর প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষাদানের সঙ্গে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) উত্তম চারিত্রিক গুণরাজির বিকাশের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ থাকা উচিত।

(৫) প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বিকাশ নানা প্রকারের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সাধিত করা প্রয়োজন।

(৬) শিশুদের বয়স, চাহিদা, রুচি, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নির্ধারিত করা উচিত।

(৭) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের কার্য সংহত হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-শিক্ষার পরোক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষকেরই সচেতনভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৮) সুস্থ দৈহিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশের জন্য সুস্থ জীবনদর্শন নির্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

(৯) স্বাস্থ্যশিক্ষা আদৌ কেতাবী হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ের কেতাবী শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার স্বরূপ

প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত জ্ঞান ও অভ্যাসকে এই স্তরে আরও বর্ধিত ও

বিকশিত করে তুলতে হবে। স্বভাবতঃই বিষয়বস্তু হবে ব্যাপকতর এবং ব্যবহারিক দিকও শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত শক্তিপ্রবণতা ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সর্বদিকের বর্ধিত শক্তির সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষার্থীদের উপর অধিকতর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রে এই স্তরের শিক্ষার জন্য যে সব বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বিশেষ লক্ষণীয়। কেননা মোটামুটিভাবে সেগুলিকে সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়ই গ্রহণ করতে পারে ঃ

(১) স্বাস্থ্যশিক্ষায় শুধু ব্যক্তিগত জীবনের স্থান থাকবে না, দলগত ও সামাজিক জীবনেরও স্থান তাতে যথাযোগ্যভাবে থাকবে।

(২) স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়বস্তু বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। অর্থাৎ তাতে ভুল লৌকিক ধারণা ও কুসংস্কারের স্থান থাকবে না।

(৩) স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষায় আবৃত্তি পদ্ধতির (recitation) উপর বেশী নির্ভর করা উচিত নয়।

(৪) স্বাস্থ্যশিক্ষার সাফল্যের পরিমাপ জ্ঞান, প্রচেষ্টা ও আচরণ এই তিন দিক থেকেই করতে হবে।

স্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচী

অনেকটা প্রতিভূ স্থানীয় (representative) বলে নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

কর্মের একক সমূহ (Units of work)

(ক) তোমার ব্যক্তিগত তালিকা

	কর্মের এককের জন্য নির্ধারিত সময়ের মোটামুটি হিসাব
(১) স্বাস্থ্যসম্পর্কিত অবস্থা	৫
(২) ব্যক্তিগত আকৃতি	৭

	কর্মের এককের জন্য নির্ধারিত সময়ের মোটামুটি হিসাব
(খ) তোমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য	
(১) খাদ্য ও পুষ্টি	১৫
(২) দৈহিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা	৮
(৩) বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদন	৮
(৪) দাঁতের স্বাস্থ্য	৫
(৫) বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি	৭
(৬) সুরা, তামাক ও নিদ্রার ঔষধসমূহ	৫
(৭) মানসিক স্বাস্থ্য	২০
(গ) তোমার বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা	
(১) স্বাস্থ্যপ্রদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ—আলো, উত্তাপ ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা	৬
(২) গৃহে স্বাস্থ্য, শিশুদের যত্ন ও রোগীদের সেবা	১৫
(৩) সমাজে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ	১৫
(৪) ব্যাধির প্রতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ	১৫
(ঘ) নিরাপত্তা ও তোমার গৃহ, বিদ্যালয় এবং সমাজে প্রাথমিক সাহায্য	
(১) নিরাপত্তা	১৫
(২) প্রাথমিক সাহায্য	২০

স্বাস্থ্য শিক্ষার ইতিহাস

মানুষ খুব আদিম অবস্থা থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। আদিম সমাজে মানুষ দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা-প্রকারের নিয়মপালন করত। প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে যেমন, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ, চীনদেশ, মিশর ইত্যাদিতে দৈহিক স্বাস্থ্যের আদর্শ বিপুলভাবে প্রভাবশীল ছিল এবং নানাপ্রকারের ব্যবহারিক কর্মের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ আত্মপ্রকাশ করত। আদিম সমাজ ও প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে দৈহিক স্বাস্থ্যের

উপর গুরুত্ব প্রদান করা হত এই কারণে যে, পূর্বে জীবনধারণের অপরিহার্য কার্যাবলীর জন্য দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ছিল।

শিল্পবিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্র ও শহরের প্রসারের ফলে বাইরের ক্ষেত-খামারের দৈহিক কাজের স্থানে ক্রমে গৃহাভ্যন্তরের মানসিক কর্মের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশী ঘটল। এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দৈহিক শক্তি ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অনুভূত হতে লাগল। আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদ্‌দের পুরোধাদিগের মধ্যে তাই দেখা যায় শিশুদের দৈহিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবার অবিরত প্রচেষ্টা। প্রথম দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে দেহগঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে ক্রমেই দৈহিক স্বাস্থ্যচর্চার লক্ষ্য সমগ্র শিশুর উপর পড়তে লাগল এবং দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে শক্ত-সমর্থ মানুষ তৈরী করার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবকিছুকেই স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাই আজকের স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দুয়েরই স্থান সমানভাবে করা হয়েছে।

উপসংহার

শিক্ষার অনেক লক্ষ্য আছে, কিন্তু তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যসম্পর্কিত। বস্তুতঃ অন্য সব প্রকারের লক্ষ্যই সহজসাধ্য হবে যদি এই স্বাস্থ্যসম্পর্কিত লক্ষ্যটি সিদ্ধ হয়। যেহেতু ব্যাপক ও উত্তমরূপে নির্ধারিত স্বাস্থ্যশিক্ষাসম্পর্কিত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, সেইহেতু জাতির প্রত্যেকটি শিশুর জন্য নিম্নমত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত।

(১) চোখ, কান ও দাঁতের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রেখে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ব্যাপক দৈহিক পরীক্ষার প্রয়োজন।

(২) দৈহিক পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় সমস্ত সংশোধনমূলক ও রক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(৩) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এমন শিক্ষাদান করতে হবে যাতে করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাঞ্ছিত অভ্যাসসমূহ, মনোভাব ও ভালমন্দবোধ গড়ে উঠতে পারে।

(৪) খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদান এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ও জলযোগের ব্যবস্থা।

(৫) খেলা ও দেহচর্চার এমন সব বন্দোবস্ত করা যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় দৈহিক কর্মের ব্যবস্থা হয় ও উত্তম পেশীগত নৈপুণ্যের বিকাশ সম্ভব হয়।

(৬) অবসর বিনোদনের জন্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ কার্যধারার ব্যবস্থা করা যার প্রভাব বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনেও অনুভূত হবে।

(৭) বিদ্যালয়, গৃহ, স্থানীয় সমাজ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও রাষ্ট্রের উচিত যতদূর সম্ভব প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থ্যসংরক্ষণ একযোগে করা।

(৭) প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার (WHO) সংগে যোগ্য সংযোগ সাধন প্রয়োজন। জগতের সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে, তথ্য, তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কৌশলাদির জ্ঞান বিনিময়ের ব্যবস্থা স্থাপন।

শিক্ষায় পরিচালনা

ভূমিকা

শিক্ষায় পরিচালনা, ধারণা ও কর্ম হিসাবে, অপরিণত ও অগোছালো-ভাবে বহুদিন ধরে চলে আসছে। তবে সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্ম হয়েছে ১৯০৮ সালে। Boston Vocation Bureau-র (আমেরিকার একটি সংস্থা) মাধ্যমেই এই প্রকাশ ঘটেছে এবং এর কর্মক্ষেত্র প্রথমে পেশার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এর অনুপ্রবেশ ঘটে, কিন্তু পেশাসম্পর্কিত সাহায্যদান এখানেও প্রথমে লক্ষ্য ছিল। পরবর্তী কালে জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরিচালনা-আন্দোলনের সমর্থকও আছেন, আবার বিরুদ্ধবাদীও আছেন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে আজকাল সমস্ত বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌ই পরিচালনার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য 'guidance' শব্দটির পরিবর্তে 'personnel work', কিংবা 'counseling' শব্দ দুটির ব্যবহার পছন্দ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরিচালনা আন্দোলনের সমর্থকরাও সকলে এর কর্মপরিধি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একমত নন।

পরিচালনার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা

খুব ব্যাপক অর্থে পরিচালনা প্রায় শিক্ষার মতই পরিব্যাপ্ত। যখনই কোন ব্যক্তিকে কিছু শিখতে সাহায্য করা হয়, তখনই পরিচালনার উদ্ভব হয়। তবে পরিচালনা ও শিক্ষা ঠিক সমার্থক নয়, কেননা শিক্ষা আত্মশিক্ষারও রূপ নিতে পারে, কিন্তু পরিচালনা বলতে সবসময়েই পৃথক পরিচালকের উপস্থিতিকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে শ্রেণীকক্ষে বা তার বাইরে ব্যবহৃত যে-কোন কৌশল বা পদ্ধতিকে পরিচালনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকারের কর্মই পরিচালনার সুযোগ দান করে। সুতরাং বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যক্তিরই পরিচালনার মূল্য সম্বন্ধে সম্যক্‌ অবহিত হওয়া উচিত এবং সব সময়েই প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত থাকা

উচিত। এই অর্থে শিক্ষকরা, উচ্চতর পরিচালকরা (administrators), তত্ত্বাবধায়করা (supervisors), বিষয়বস্তু নির্মাতারা এবং পরিচালনাকার্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সকলেই হলেন পরিচালক।

পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা

সার্থক শিখনের জন্য বাল্যে পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু অন্য আর একদিক থেকেও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের জীবনধারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আধুনিক জীবনের জটিলতা ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য শিশুর জীবনে সংগতিবিধানের এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলির জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির। সাধারণতঃ এই বিশেষ পরিচালনাকেই পরিচালনার একমাত্র রূপ বলে মনে করা হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, পরিচালনার প্রয়োজন একটিমাত্র ক্ষেত্রে অনুভূত হলেও ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের কথাই সর্বদা স্মরণ রাখতে হয়, কেননা, ব্যক্তির সত্তা হল বাস্তবে অবিভাজ্য এবং তাই একদিকের সমস্যা সমাধান অন্যান্য দিকের উপরও নির্ভর করে। সাধারণ পরিচালনার প্রয়োজন বিদ্যালয়ে সর্ব সময়েই হয়, তবে বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজনও খুব কম হয় না। শুধু বড় বড় সমস্যাসম্পর্কেই পরিচালনার প্রয়োজন হয় না। বাইরের দিক থেকে দেখতে অতি নগণ্য সমস্যা সমাধানের জন্যও বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়, কেননা, বাহ্যতঃ নগণ্য অনেক সমস্যাই ব্যক্তির অন্তর্জীবনের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। পরিচালনা-সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহ নানা আকারে উপস্থিত হয় এবং সমস্যাসমাধানের উপায়ও নানা প্রকারের হয়। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বিশেষ সমস্যার জন্য বিশেষ সমাধানের প্রয়োজন হয় এবং তাই পরিচালনার পদ্ধতির জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়মাবলীর শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়।

Lloyd Jones বলেন, সার্থক পরিচালনা তিনটি ক.জ করতে পারে— (১) ব্যক্তিকে বিশেষ প্রকারের তথ্য সরবরাহ করতে পারে, (২) ব্যক্তিকে এমনভাবে আত্মজ্ঞান ও সাহস দিতে পারে যার দ্বারা সে নিজ শক্তিসমূহের ও পরিবেশের সম্ভাবনাসমূহের যোগ্য ব্যবহার করতে পারে এবং (৩)

পরিচালনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

পরিচালনার কার্য সম্বন্ধে A. J. Jones বলেন, "পরিচালনা বল্লেই প্রশ্ন উঠে অপরের দ্বারা প্রদত্ত সাহায্যের; পরিচালনার কাজ হল ব্যক্তিকে কোথায় সে যেতে চায়, কি সে করতে চায়, কিংবা কেমন করে সে সব-চেয়ে ভালভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করা; পরিচালনা তার জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সাহায্য করে।"

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা

প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনা

বাড়ী থেকে সুরু করে নার্সারী কিংবা কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুকেই কতকগুলি মৌলিক অভ্যাস ও মনোভাব গঠনে সাহায্য করা প্রয়োজন। এদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে পরিচালনা পরোক্ষভাবে চলবে। সুদৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে এবং তাদের সঙ্কীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত আচরণে উৎসাহিত করে তাদের পরিচালিত করতে হবে। বড় ছেলেদের মত বা বয়স্কদের মত এদের জীবনে সচেতনভাবে সমস্যা উপস্থিত থাকে না, কেননা এই সময়টা হল পরনির্ভর-শীলতার সময় এবং তাই শিশুরা খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই বড়দের কাছ থেকে সাহায্য আশা করে। তবে পরবর্তী জীবনের অনেক সমস্যা-সমাধানের ভিত্তি এখনই স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ পরবর্তী কালের বহু আচরণিক সমস্যার মূলসূত্র এই সময়ের পরিচালনার মধ্যেই নিহিত থাকে।

প্রাথমিক স্তরে পরিচালনা

এই স্তরের শিশুরা উত্তম স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অভ্যাস, জগৎ সম্বন্ধে উন্নতর জ্ঞান, লেখা-পড়ার মাধ্যমে প্রকাশের শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে যদি তাদের প্রাত্যহিক জীবন স্নেহপ্রবণ ও সুশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের আচ্ছাদিত জীবন থেকে এসে অনেক শিশুই আচরণিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তখন প্রয়োজন হয় শিক্ষকের দক্ষতা এবং আগ্রহ-উদ্রেককারী ক্রমিক

ভাবে বিন্যস্ত কর্মাবলীর ব্যবস্থা। এগুলিই তখন পরিচালনার মাধ্যম রূপে কাজ করে। প্রাথমিক স্তরের শেষে উচ্চ বিদ্যালয়ে গমনের সময়ে শিশুদের পাঠক্রম-নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচালিত করার প্রয়োজন হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে পরিচালনা

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার সময়ে যাতে আচরণিক সমস্যার উদ্ভব না হয় তার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক পরিচালনার। প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালকদের মধ্যে তাই সংযোগের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে পরিচালনায় গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং কারণ খুব স্পষ্ট। কেননা, যৌবনোদ্গমের সময় হল সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংক্ষোভের সময়। এই সময়ে সহসা দৈহিক পরিবর্তনের জন্য শিশুর মানসিক জগতে নূতন সমস্যাসমূহের উদ্ভব হয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমে বিষয়সমূহের অবতারণার জন্য বিষয় নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়, পেশাগত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে এবং বয়স্ক অবস্থার জন্য সামাজিক ও নাগরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই সব কারণে আচরণিক অভিযোজনগত বহু সমস্যা দেখা দেয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য দক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। তবে শৈশবে ও প্রাক্-বয়ঃসন্ধির সময়ের পরিচালনা সার্থকভাবে সংসাধিত হলে বয়ঃসন্ধিকালের পরিচালনা-কার্য অনেকটা সহজসাধ্য হয়।

মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের আত্মজ্ঞানলাভের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনার লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ের পরবর্তী কালে শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপরিচালনা। যে আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্ভব হয়, সেই আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের তথ্য :

১। নিজ সাধারণ ও বিশেষ শক্তি নিচয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান।

২। অবসর বিনোদন ও পেশাসম্পর্কিত নিজ অভ্যাস ও অনুরাগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

৩। দৈহিক শক্তিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান।

৪। আর্থিক সম্ভাবনা ও ত্রুটি সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫। মানসিক অভ্যাস ও সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

৬। সুবলয়িত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান।

মাধ্যমিক স্তরের পরিচালনা সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর ভবিষ্যতের পেশা বা শিক্ষাসম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করা মোটেই উচিত নয়, কেননা, অনমনীয় লক্ষ্যনির্ধারণ বিজ্ঞজনোচিত নয়। ভবিষ্যতের নিজ ও জাগতিক সম্ভাবনাসমূহকে বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করা কোন মতেই কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

মহাবিদ্যালয়ের স্তরের পরিচালনা

মহাবিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রদের পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐ জাতীয় সমস্যাগুলি থেকে পৃথক ধরণের। এই স্তরের ছাত্ররা যৌনসম্পর্কজনিত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং পাঠক্রম নির্বাচন ও নূতন পরিবেশের সহিত অভিযোজন সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়। পড়াশুনার চাপের জন্য বা একসঙ্গে অনেক প্রকারের কাজে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য ছেলেদের এই সময়ে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির উদ্ভব হতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের মত এই স্তরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকারের পরিচালনার প্রয়োজন। স্বভাবতঃই এই স্তরের পরিচালনাসম্পর্কিত কর্মসূচী ছাত্রদের সমস্যাবলীর পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই রচিত হওয়া উচিত। পরিচালনাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের ছাত্রদের অভিযোজন সম্পর্কিত ক্ষুদ্রতম ত্রুটির লক্ষণের প্রকাশের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সমস্যার উদ্ভবের প্রথম স্তরেই সাহায্যদানের চেষ্টা করতে হবে।

পরিচালনা সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী

(ক) সাংগঠনিক তত্ত্বাবলী

পরিচালনাকার্যের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য বিচক্ষণ সাংগঠনিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। নিম্নের সাংগঠনিক তত্ত্বাবলীকে অনুসরণ করলে পরিকল্পনাকার্যের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়।

১। পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত কার্য সংহতভাবে সম্পন্ন করা উচিত।

২। পরিচালনাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের সমগ্র কর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত।

৩। যোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পর্কিত গুণাবলী সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই পরিচালক হওয়া উচিত।

৪। পরিচালকদের উচিত যে সমস্ত সংস্থা পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত তাদের সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

৫। পরিচালনা সম্পর্কিত সাহায্য শুধুমাত্র অভিযোজন প্রক্রিয়ায় ত্রুটিযুক্ত (maladjusted) ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত নয়। যেই ঐ প্রকার সাহায্য চাইবে তাকেই সাহায্য দেওয়া উচিত।

৬। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কর্মীদের প্রত্যেককেই পরিচালনা সম্পর্কে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

৭। বিশেষ সমস্যাসমাধানের ভার বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

৮। পরিচালনাকার্যের জন্য বিশেষ প্রকারের সংগঠন প্রয়োজন। তবে, এই সংগঠন বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবে।

(খ) পরিচালনাকার্য সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাকার্য চালাতে হলে কতকগুলি তত্ত্ব অনুসরণ করা উচিত। নিম্নে সেই তত্ত্বাবলীর উল্লেখ করা হল ঃ

১। সব সময়ে শিশুর সামগ্রিক সত্ত্বাকে মনে রেখে পরিকল্পনাকার্য সম্পন্ন করতে হবে।

২। যে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তার সম্বন্ধে যত তথ্য আহরণ করা সম্ভব তা সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে সর্বদা মনে রেখে পরিচালনা-কার্য চালাতে হবে।

৪। ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিবর্তনশীলতার জন্য তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পরিচালনাগত সাহায্যদান করতে হবে।

৫। পেশা ও উচ্চ স্তরের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সঠিক তথ্য অবিরত

সরবরাহ করতে হবে, কেননা তা না হলে ভবিষ্যতের কর্মধারা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে উঠে।

৬। ছেলেরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি বা আগে পেশা নির্বাচন না করে তা দেখতে হবে।

৭। ভবিষ্যতের পরিকল্পনাসমূহকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

পরিচালনাকার্যে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রচলিত কৌশল, প্রক্রিয়া এবং উপকরণ

(ক) (১) ব্যক্তিগত পরিচালনার কৌশল

এই কৌশলটি খুব অভিজ্ঞ, বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রক্ষোভগত সংগতি বিশিষ্ট (rich in emotional resources) ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এঁদের শুধু বিজ্ঞতা ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থাকলেই অবশ্য চলবে না, পরিচালিত ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের পরিচয় খুব নিবিড় হওয়া উচিত। অভিযোজন সম্পর্কে বিশেষভাবে ত্রুটিযুক্তদের বেলায় এই কৌশলটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

(২) দলগত পরিচালনার কৌশল

ব্যক্তিগত পরিচালনা খুব কার্যকরী হলেও অর্থ ও সময় সংক্ষেপের জন্য কতক বিষয়ে দলগত পরিচালনার কৌশল প্রযুক্ত হয় এবং অপরিহার্যও হয়ে উঠে। তবে সঙ্ঘের পরিবেশেও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদার কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে এবং দলগত সমাবেশের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত আলোচনার ব্যবস্থাও করতে হবে।

খুব ব্যাপক অর্থে বিদ্যালয়ের সমস্ত দলগত কর্মের মধ্যেই এই কৌশল-প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং বিশেষ অর্থে এই কৌশল কোন বিশেষ ক্ষেত্রের অভিযোজনের বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন, অনেক আমেরিকান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বেই ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন করা হয় এবং নূতন ছাত্রদের পুরাতনদের পূর্বেই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে আহ্বান করা হয় নূতন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। পেশা সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে এই কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং

ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্যও এই কৌশল প্রযুক্ত হয় প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে।

(খ) পরিচালনার উপকরণ

ধারাবাহিক বিবরণপত্র (cumulative record card)

ছাত্রদের বর্তমানের আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মনোভাব, আগ্রহ, এবং শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, কিন্তু পরিচালনার সার্থক পরিণতির জন্য ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রকারের তথ্যের সমাবেশ প্রয়োজন। যে কোন সমস্যা-সমাধানের জন্য ছাত্রদের জীবনের সামগ্রিক চিত্রের প্রয়োজন, তাই দরকার হয় এইরূপ সর্বপ্রকার তথ্যের ধারাবাহিক সমাবেশের। ধারাবাহিক তথ্য নানাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে ভারতবর্ষে বিবরণপত্রের রূপেই এর প্রকাশ বর্তমানে প্রায়ই ঘটে। কিন্তু যেভাবেই এই তথ্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হোক না কেন তাদের খুবই নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। কোন ছাত্রের সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণদান করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(১) অভিন্ন প্রতিপন্ন করার জন্য তথ্য :
- (ক) নাম।
- (খ) বয়স।
- (গ) জন্মস্থান।

(২) বর্তমান বিদ্যালয়ে প্রবেশের তারিখ।

(৩) ছোট ফটো।

(৪) পারিবারিক বিবরণ।

(৫) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ।

(৬) পূর্বের বিদ্যালয়ের কর্মাবলীর হিসাব।

(৭) পূর্বের বিদ্যালয়ে দৃষ্ট লক্ষ্যণীয় মনোভাব, বহিরাচরণ ইত্যাদি।

(৮) পূর্বের নূতন ধরণের পরীক্ষার (new-type test) ফল।

(৯) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ধারাবাহিক ফল।

(১০) কর্মের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ফল।

(১১) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পাঠসম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বিবরণ।

(১২) দলগত কার্য ও সেবা সম্পর্কিত কার্যের ধারাবাহিক বিবরণ।

(১৩) ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শিক্ষকদের মন্তব্যসমূহ।

(১৪) ভবিষ্যতের পরিকল্পনাসহ শেষ পরীক্ষার ফল। বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরোক্ত তথ্যগুলি পূর্ণভাবে এবং যাথার্থ্যের সহিত লিপিবদ্ধ হলে পরিচালনাকার্যে প্রচুর সুবিধা হয়।

(২) কেস স্টাডি (case study)

ধারাবাহিক বিবরণপত্রের 'কেস স্টাডি' হল একটি বিস্তৃততর ও গভীরতর রূপ। গুরুতর অভিযোজন-সম্পর্কিত ত্রুটির ক্ষেত্রেই কেস স্টাডি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেস স্টাডি যদি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় তাহলে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল কোন একটি ছাত্রের জীবনধারার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ঘটান। এতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করা হয়।

(১) বিবেচ্য সমস্যার পূর্ণ বিবরণ।

(২) পারিবারিক সম্পর্কসমূহের ও সামগ্রিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ অনুধাবনের ফল।

(৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ও ব্যক্তিগত ইতিহাস।

(৪) বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত নূতন পরীক্ষার ফলাফল।

(৫) অন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ।

(৬) পরিচালকদের সুপারিশ।

পরিচালকের গুণাবলী

সাধারণভাবে সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ প্রকারের মনোভাব অর্জন করতে হবে এবং এক বিশেষ প্রকারের শিল্প ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। পরিচালকদের এই মনোভাবটি গড়ে তুলতে হবে যে, ব্যক্তির সত্ত্বার মূল্য বিষয়বস্তু, ঐতিহ্য ও কৃত্রিম মাপকাঠির চেয়ে অনেক বেশী। পরিচালনা একটি শিল্পকর্ম। তাই এই শিল্পের মর্মকথা তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। শিল্পহিসাবে পরিচালনার মূল কথা হল সংবেদনশীল অনুধাবন, বাক্যের দক্ষতার দ্বারা অপরকে আত্মজ্ঞানদান, শক্তিপূর্ণ প্ররোচনা (persuasion) এবং পরোক্ষ ইংগিত। পরিচালনা একটি বিজ্ঞানও বটে। শিল্পকর্ম হিসাবে পরিচালনার সার্থকতা বিশেষ করে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করার উপর নির্ভর করে।

এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োগক্ষেত্র ও তাদের ত্রুটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

পরিচালনাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

(১) শিক্ষকগণ ও পরিচালনা

পরিচালনাকার্যে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্গণ একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াই হল পরিচালনা। সুতরাং তাদের মতে শিক্ষকদের স্থান সমগ্র পরিচালনাকার্যের মধ্যস্থলে। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, অভিযোজনগত বিশেষ ত্রুটির ব্যাপারেই পরিচালনা উদ্ভব হয়। এদের মতে শিক্ষকদের কাজ হল শুধু দেখা কখন ঐ বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। বেশীর ভাগ শিক্ষাবিদ্ অবশ্য মধ্যপন্থী মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে পরিচালনাকার্যে শিক্ষকের স্থান নিশ্চয়ই আছে। তবে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনও রয়েছে।

শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত হতে পারেন। বস্তুতঃ শিক্ষাদানকার্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে পরিচালনায় অংশগ্রহণ শিক্ষকদের পক্ষে অপরিহার্য। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের অভ্যাস উন্নততর করে তুলতে পারেন, সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পারেন, জয় ও সাময়িক পরাজয়ের মূল্যবান অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য করতে পারেন, নেতা ও অনুসরণকারীর (follower) যোগ্য অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজ নিজ গুণ ও দোষ সম্বন্ধে অবহিত করে তুলতে পারেন। শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক ছাত্রসমাবেশে (assembly), সঙ্ঘ ও সেবাদলের কার্যে, শিক্ষণীয় স্থান ও বস্তু পরিদর্শনের সময়ে, নূতন পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে পরিচয়মূলক কর্মসূচীতে (orientation programme) এবং শ্রেণীগত বা দলগত উপদেশদান ব্যাপারে পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত হতে পারেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষক উপরোক্ত কর্মাবলী ছাড়া আরও নানা প্রকার কর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করতে পারেন, যেমন, ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, পাঠের অভ্যাস, ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যাসমাধানে শিক্ষার্থীদের সাহায্যদান করতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপরিকল্পনায় যোগদান করতে পারেন, বিশেষ ছাত্রের বিষয়ে মন্ত্রণাসভায় অংশগ্রহণ করতে

পারেন, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন এবং ছোট ছোট ছাত্রদলকে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিশেষ সাহায্যদান করতে পারেন।

(২) বিশেষজ্ঞগণ ও পরিচালনার বিশেষ সংস্থাসমূহ

(ক) বিশেষজ্ঞগণ

শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধনের পথে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি নেতার তত্ত্বাবধানে পরিচালনাকার্য সম্পাদিত হওয়া উচিত। তিনি পরিচালনাকার্যে ব্যাপৃত সমস্ত ব্যক্তির বিচিত্র প্রয়োজনকে সংহত করে তুলবেন এবং বিশেষ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করবেন। তারপর প্রয়োজন নানাপ্রকারের বিশেষজ্ঞদের যেমন, সুশ্রূষাকারিণীদের, ডাক্তারের, দন্ত-বিশেষজ্ঞের, মনস্তত্ত্ববিদের, মনোচিকিৎসকের, পেশাগত উপদেশদানকারীর (vocational counselor) এবং গৃহ পরিদর্শকের (home visitor)। এই বিশেষজ্ঞদের কার্য অতীব প্রয়োজনীয় হলেও এদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়া উচিত, কেননা শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ও পরিচালনা-কার্যের সংহতির জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

অভিযোজন সম্পর্কিত সমস্যা বিদ্যালয়ে উদ্ভূত হলেও তার সমাধান সমাজ ও বিদ্যালয় দুইয়েরই দায়িত্ব এবং দুয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা সম্ভব। পরিচালনাকার্যে পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কিত সংস্থা, সামাজিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সংস্থা, শিশুমঙ্গল সম্পর্কিত সংস্থা, শিশুপরিচালনার কেন্দ্র (child guidance clinic) ইত্যাদি সমাজের অন্যান্য সংস্থাসমূহের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিক্ষা যেমন সমাজ ও বিদ্যালয়ের যৌথ দায়িত্ব, শিশুর পরিচালনাও তেমনি উভয়ের যৌথ দায়িত্ব।

এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিচালনাসম্পর্কিত সমস্যা বিপুলাকারে দেখা দেয়, কিন্তু সমস্যা-সমাধানের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা মোটেই আশানুরূপ হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলতঃ অপরিকল্পিত জীবনের জন্য এবং মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ

ও রাষ্ট্র চালিত হওয়ার জন্য জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর বিপুল চাপ পড়ে, ফলে তাদের অভিযোজন সম্পর্কিত সমস্যা হয়ে পড়ে জটিল ও বহুবিস্তীর্ণ। উপযোগী ব্যবস্থার স্বল্পতার কারণ হল এই যে, ঐ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন প্রয়োজন, যে কার্য ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, এমনকি বোধ হয়, উপস্থিতিতেও মোটেই সম্ভব নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হলে এই সমস্যা নূতন রূপলাভ করবে এবং তার প্রকৃত সমাধানও সহজসাধ্য এবং অপরিহার্য হয়ে পড়বে। সুতরাং পরিচালনার সমস্যা হল মূলতঃ সামাজিক (sociological), বিদ্যালয়গত (pedagogical) নয়। বস্তুতঃ শিক্ষাজগতের সমস্ত মৌল সমস্যাই হল মূলতঃ সামাজিক। সমাজগত পরিবর্তন ভিন্ন শুধু বিদ্যালয়ে ঐ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষাদানকারীকে বা শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহান্বিত সমস্ত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমাজতাত্ত্বিক, বিশেষ করে রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ্‌, হতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল-প্রমুখ জগতের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাকে রাজনীতির অঙ্গ বলেই মনে করতেন।

পরীক্ষা

পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কতকগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিশুদের ব্যক্তিত্বের বহুমুখী পরিবর্তন আনা। এই পরিবর্তন আসে জ্ঞানে, নৈপুণ্যে, অভ্যাসে, মনোভাবে, অনুভূতিতে, ধারণায় এবং আদর্শ ইত্যাদিতে। পরীক্ষার প্রয়োজন হয় বাঞ্ছিত পরিবর্তনের পরিমাপের জন্য। সুতরাং পরীক্ষার কোন স্বাধীন সত্তা বা উপযোগিতা নেই। পরীক্ষা হল শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি অংশ-বিশেষ, যার কাজ হল শিক্ষাদানক্রিয়ার সার্থকতা নিরূপণ করা।

পরীক্ষার ইতিহাস

মানবীয় ও বিশ্বের সব জিনিসের যেমন ইতিহাস আছে, পরীক্ষারও তেমনি ইতিহাস আছে। পরিবর্তিত অবস্থাসমূহের পটভূমিতে শিক্ষার ধারণা ও প্রকৃতি যেমন বদলিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষারও ধারণা ও প্রকৃতি বদলিয়েছে। স্থানাভাবের জন্য নিম্নে অতি সংক্ষেপে পরীক্ষার ইতিহাস বর্ণিত হল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাথমিক যুগে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারই (judgment) পরীক্ষার কাজ করত। অর্থাৎ শিক্ষক নিজের সহজ বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে দেখতেন শিক্ষা সার্থক হচ্ছে কিনা এবং সার্থকতার পরিমাণও নির্ধারণ করতেন। পরে বাঁধা-ধরা পরীক্ষার (formal examination) উদ্ভব হল এবং ধীরে ধীরে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত হল। এই পরীক্ষার প্রধান হাতিয়ার হল রচনা। ক্রমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতির প্রসারের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) পরিমাপ পদ্ধতির অন্বেষণ সুরু হল এবং জন্ম নিল 'নূতন ধরণের পরীক্ষা' (new-type test) বা 'নৈর্ব্যক্তিক (objective) পরীক্ষা'। বৈজ্ঞানিক পরিমাপ-আন্দোলনের আবির্ভাবের প্রথম স্তরে বুদ্ধি ও অর্জিত শক্তির পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা উদ্ভাবনই ছিল পরীক্ষকদের প্রধান কাজ। এর পরের স্তরে দেখা দিল

'গাণিতিক পরিমাপের' (measurement) ধারণা। এই স্তরে পরীক্ষকদের প্রধান কাজ ছিল পরীক্ষার ফলের ব্যবহার, সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য উপযোগী উপায়ের (tools) উদ্ভাবন, এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের (statistics) ব্যাপক ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-আন্দোলনের তৃতীয় স্তরে জন্ম নিয়েছে 'মূল্যায়নের' (evaluation) ধারণার। এই স্তরে জোর দেওয়া হয় শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের উপর এবং সেই উদ্দেশ্যে বহুপ্রকার পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

দর্শন ও পরীক্ষা

সমাজের জীবনধারার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় দার্শনিক রূপান্তর এবং সেই দার্শনিক রূপান্তর বিসর্পিত মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষাক্রিয়া হল দর্শনের সক্রিয় দিক। সুতরাং দার্শনিক পরিবর্তন শিক্ষা ক্ষেত্রে খুব সহজে ও পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক একটি দর্শনের প্রভাবে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য এবং পরীক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য (শিক্ষার অন্যান্য দিকের মত) এক এক প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে। ভাববাদী দর্শন পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিকের পরিমাপের উপর গুরুত্ব অর্পন করে এবং পরিমাপের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ হিসাবে রচনাকে ব্যবহার করে, কেননা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরিমাপ রচনার দ্বারাই প্রধানতঃ সুষ্ঠুভাবে সম্ভব। ভাববাদীরা বস্তুজগতের চেয়ে মনোজগতের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন বলেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপেক্ষা ব্যক্তিনির্ভর রচনার ব্যবহার বেশী পছন্দ করেন। আধুনিক বস্তুবাদ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্ভূত (প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)। স্বভাবতঃই এই দর্শনের নিকটে মানব মনের অপেক্ষা বস্তুজগতের মূল্য বেশী। তাই এই দর্শন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সমর্থক। এই দর্শনেরই প্রভাবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার' ও 'গাণিতিক পরিমাপের' ধারণার উদ্ভব হয়েছে। অতি আধুনিক দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল—প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদ বিজ্ঞানসমর্থক হলেও জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের' (natural sciences) পরিমাপ পদ্ধতির অনুকরণে শুধু নৈর্ব্যক্তিক, ধরা-বাঁধা গণিতনির্ভর পরিমাপ পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারে সম্মত নয়।

এর দৃষ্টি স্থাণু ও বিশ্লেষণমূলক নয়, তাই পরীক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাবে জন্ম নিয়েছে 'মূল্যায়নের' ধারণা ও আন্দোলন। এই মূল্যায়ন নিত্যপরিবর্তনশীল মানব-ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিমাপপ্রয়াসী এবং পরিমাপের হাতিয়ার হিসাবে সর্বপ্রকার পরিমাপযন্ত্রের—ব্যক্তিনির্ভর ও নৈর্ব্যক্তিক—ব্যবহারের সমর্থক।

রচনামূলক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মূল্যায়ন

(ক) রচনামূলক পরীক্ষার প্রকৃতি

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বড় বড় এবং জটিল প্রশ্নের উত্তর কিছুটা দীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে দিতে হয়। স্বভাবতঃই এই জাতীয় পরীক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্নের সংখ্যা থাকে অল্প এবং এক একটি প্রশ্নের জন্য অনেকটা সময় দিতে হয়।

পূর্বে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার স্থান ছিল ব্যাপক। এখন সেই প্রাধান্য বজায় না থাকলেও এর অন্তর্ধান ঘটে নি। এর কারণ হল প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ, দেখা গিয়েছে যে, এই পরীক্ষার দ্বারা এমন-কতকগুলি বস্তুর সুষ্ঠু পরিমাপ সম্ভব হয় যা অন্য কোন পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা-পদ্ধতি হিসাবে এর ত্রুটি দূরীকরণের জন্য চেষ্টাও অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আর একটি কারণ হল পুরাতন সামাজিক ও দার্শনিক শক্তিনিচয়ের উপস্থিতি।

১৯০০ সালের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হতেই এই পদ্ধতির সমালোচনা সুরু হয়েছে। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম নাম-করা সমালোচক হলেন ইংলণ্ডের এজওয়ার্থ (Edgeworth)। এর পরে আরও অনেকেই এর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ষ্টার্চ (Starch) ও এলিয়ট এবং হার্টগ (Hartog) ও রোড্‌স্ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। সমালোচকরা সাধারণতঃ রচনা-পদ্ধতির মাধ্যমে একই উত্তরের উপর বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বরের তুলনা করে এই পদ্ধতির ত্রুটি নির্দেশ করেছেন।

রচনা পদ্ধতির ত্রুটি

এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল দুটি। কিন্তু আরও কয়েকটি ছোট ছোট ত্রুটিও আছে। প্রথম ত্রুটি দুটি হল : (১) প্রশ্নের সংখ্যাল্পতা (limited sampling) ও (২) নম্বরের ব্যক্তিনির্ভরশীলতা (subjectivity of

scoring)। অল্প সংখ্যক প্রশ্নের দ্বারা সমগ্র পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে সাফল্য নির্ণয় করা কঠিন। ষ্টার্চ, এলিয়ট, থর্ণডাইক, এলস্, ষ্টলনেকার, হার্টগ ও ব্যাগার্ড প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ এই পরীক্ষায় দত্ত নম্বরের পরিবর্তনশীলতা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য রচনার নম্বর পরিবর্তনশীল হয়ঃ

(১) ছাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার অতীতের সাফল্য-অসাফল্য নম্বরকে প্রভাবিত করে।

(২) পরীক্ষকের উপর নানাপ্রকারের বাইরের প্রভাব কাজ করে যেমন, হাতের লেখা, ভাষা, উত্তরের দৈর্ঘ্য, অব্যবহিত পূর্বে পঠিত উত্তর, উত্তরের সংগঠন ইত্যাদি।

(৩) অন্যান্য বাইরের প্রভাবও কাজ করে যেমন, ছাত্রের চেষ্টার লক্ষণ, উন্নতি, শিক্ষক ও পাঠ্যসূচীর প্রতি মনোভাব ইত্যাদি।

(৪) কোন কোন পরীক্ষক স্বভাবতঃই বেশী বা কম নম্বর দেন।

(৫) অন্যান্য সমস্ত লোকের মত পরীক্ষকেরও বিচারশক্তি পরিবর্তনশীল দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

(৬) প্রশ্নের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা।

(৭) উত্তরের বিভিন্ন ত্রুটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা।

(৮) ছাত্রের উত্তরদানের পদ্ধতিও নম্বরদানকে জটিল করে তোলে যেমন ঃ

(ক) নানা রকমের অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণা।

(খ) অকল্পিত দিকে উত্তরের গতি।

(গ) ধোঁকা দেওয়া।

রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হল এই যে, উত্তরের যথার্থ পরিমাপ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

রচনাপদ্ধতির ত্রুটি সংশোধন

রচনাপদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত হলেও তার কতকগুলি স্বাভাবিক উপকারিতা রয়েছে। উপকারিতাগুলিকে সুরক্ষিত করতে হলে রচনাপদ্ধতির বিশুদ্ধীকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বিশুদ্ধীকরণের জন্য নানা-প্রকারের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) প্রশ্নের গঠন ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু (test content) সম্পর্কিত প্রস্তাব-সমূহ ও (২) নম্বরদান সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ। গ্রীণ ও তাঁর সহযোগীদের মতে চারটি সর্ত পালন করলে এই পরীক্ষা দোষমুক্ত হতে পারে।

(১) পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য ছাত্র ও শিক্ষক দুয়েরই ভালভাবে জানা উচিত।

এই পরীক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত চিন্তা, যুক্তি ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তির উপর। বিষয়গুলি আগ্রহ-উদ্দীপক ও সমস্যামূলক হওয়া উচিত।

(২) নির্ধারিত উদ্দেশ্যানুযায়ী পরীক্ষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

(৩) প্রশ্ন-উদ্ভাবনে যথেষ্ট সময় দেওয়া উচিত। উত্তর পরীক্ষা করতে যত সময় লাগে অন্ততঃ ততটা সময় প্রশ্ন-উদ্ভাবনে দেওয়া উচিত।

(৪) সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসরণের দ্বারা নম্বরদানে বাইরের প্রভাবকে দূরে রাখতে হবে।

এঁদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, প্রশ্নের উত্তরগুলি দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, প্রশ্নগুলির উত্তর-সম্পর্কিত নির্দেশ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবং প্রশ্নগুলি উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিসমূহের পরীক্ষার উপযোগী হবে। এঁদের মতের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌দের এই বিষয়-সংক্রান্ত মতগুলি অনুধাবন করলে নিম্নের নির্দেশগুলি দেওয়া যায়। সব নির্দেশগুলিই বিষয়বস্তু-নির্বাচন ও উত্তম প্রশ্ন-রচনা সম্পর্কিত।

(১) পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ভালভাবে বোঝা উচিত।

(২) পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তু নির্ধারিত উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

(৩) প্রস্তুতির জন্য যোগ্য সময়ের প্রয়োজন।

(৪) স্বাধীন কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করা উচিত।

(৫) উপস্থাপিত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত নূতনত্ব থাকা প্রয়োজন।

(৬) সব প্রশ্ন সমানভাবে কঠিন হওয়া উচিত কিম্বা প্রশ্নগুলিকে সহজ থেকে কঠিন এই ধারায় সাজান উচিত।

(৭) মন্‌রো, কার্টার ও ওয়াইড্‌ম্যানের মত পরীক্ষাবিদ্‌দের মত অনুসরণ

করে প্রশ্ন রচনা করা উচিত। এঁরা অনেক প্রকারের উন্নত ধরণের পরীক্ষার উদ্ভাবন করেছেন।

(৮) দলগতভাবে প্রশ্ন রচনা করা উচিত।

(৯) ছোট উত্তর হয় এমন প্রশ্ন বাছা উচিত।

(১০) উচ্চাঙ্গের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের উপযুক্ত প্রশ্ন তৈয়ারী করা উচিত।

(১১) প্রশ্নগুলির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নম্বরদানের উন্নতির জন্যও অনেক প্রকারের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নের প্রস্তাবগুলি হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) যত্নের সঙ্গে প্রশ্নগঠন ও প্রশ্নের বিশ্লেষিত উপাদানগুলির জন্য সঠিক নম্বর নির্ধারণ।

(২) নম্বরদানের পূর্বে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্ধারণ।

(৩) প্রশ্নগঠনকারীর দ্বারা উত্তর পরীক্ষা।

(৪) ছাত্রের নামের পরিবর্তে নম্বর নেওয়া।

(৫) নম্বরদানের সময়ে ভাষা ও রচনাশিল্পগত গুণাবলীকে উপেক্ষা করা।

(৬) সমস্ত উত্তরপত্রের একই উত্তর পর পর দেখা।

(৭) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরসমূহকে ৫ থেকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে নম্বর দেওয়া (যেমন অতি উত্তম, মধ্যম উত্তম, উত্তম ইত্যাদি)। এর বেশী ভাগ করলে নম্বরদান ঠিক বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে না।

রচনা পদ্ধতির গুণাবলী

পরিশুদ্ধ হলে রচনাপদ্ধতির পরীক্ষায় নিম্নলিখিত সদ্‌গুণাবলী দেখা যায় ঃ

(১) একে সহজে গঠন ও প্রয়োগ করা যায়।

(২) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়সমূহের সঙ্গে এর সঙ্গতি থাকে।

(৩) উচ্চাঙ্গের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির পরিমাপ এর দ্বারা সম্ভব হয়।

(৪) এর মধ্য দিয়ে সহজে প্রকাশ পায় ঃ

(ক) সংগঠনের ক্ষমতা।

(খ) সম্পর্কস্থাপনের ক্ষমতা।

(গ) বিষয়সমূহের গুরুত্ব বিচারের ক্ষমতা।

(ঘ) সিদ্ধান্তে পৌছানর ক্ষমতা।

(ঙ) অনেকগুলি ভাবের সংযত ও ধারাবাহিক প্রকাশের ক্ষমতা।

(চ) শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও ভালমন্দ বোধের বিচারের ক্ষমতা।

(ছ) আলোচনার ভাবগত মৌলিক ভিত্তিগুলি।

(জ) দীর্ঘবস্তুর অল্প পরিসরে সারাংশদানের ক্ষমতা।

অনেকে বলেন, রচনামূলক পরীক্ষার দ্বারা নিম্নলিখিত উপকারগুলি সাধিত হয়, কিন্তু সেই উক্তির সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই।

(১) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার স্বাধীনতা থাকে।

(২) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষার দ্বারা লিখিত ভাষায় চর্চা হয় এবং ভাষা শিক্ষার উন্নতি হয়।

(৩) ব্যাপক পুনরালোচনায় উপযোগী মনোভাব গড়ে উঠে।

রচনাপদ্ধতির পরীক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

রচনামূলক পরীক্ষাকে সংশোধিত করলে এর দ্বারা এমন কতকগুলি লক্ষ্য সাধিত হয় (যেগুলির উল্লেখ উপরে করা হয়েছে) যেগুলি অন্য প্রকারের পরীক্ষার দ্বারা সাধিত হয় না। এই কারণে এর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সমস্ত বিচক্ষণ শিক্ষাবিদই আজ একমত।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মূল্যায়ন

বলা হয়েছে যে, রচনাপদ্ধতির পরীক্ষা পূর্বে পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল এবং এও বলা হয়েছে যে, এই রচনাপদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল দুটি : (১) এর দ্বারা নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সবটাকে পরীক্ষা করা যায় না এবং (২) এই পরীক্ষা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় অর্থাৎ উত্তর পরীক্ষায় পরীক্ষকদের নম্বরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এই ত্রুটি দুটি দূর করবার জন্য একদিকে চেষ্টা হয়েছে রচনা পরীক্ষার উন্নতি সাধনের এবং অন্য দিকে চেষ্টা হয়েছে নূতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা উদ্ভাবনের। এই নূতন ধরণের পরীক্ষায় শ্রেণীভেদ আছে। নিম্নে কয়েকটি শ্রেণীর নূতন পরীক্ষার আলোচনা করা হল ও উদাহরণ দেওয়া হল।

নূতন পরীক্ষার শ্রেণীভেদ ও উদাহরণ

নূতন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সাধারণতঃ ছোট ছোট উত্তর চাওয়া হয়। এই

পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকারকে দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণী হল মানুষের মনে-করার (recall) শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং অন্যটি হল মানুষের পূর্বপরিচিত বস্তুকে চেনার শক্তির (power of recognition) উপর নির্ভরশীল। নিম্নে এই দুই শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার আলোচনা করা হল।

(ক) মনে-করার শক্তির উপর নির্ভরশীল নূতন পরীক্ষাসমূহ

এই শ্রেণীর পরীক্ষাও আবার দুই প্রকারের হয়। এক প্রকারের পরীক্ষা সরাসরি মনে করতে নির্দেশ দেয় এবং অন্য প্রকারের পরীক্ষা বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ করতে বলে।

(অ) সরাসরি মনে করা

এই প্রকারের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসার রূপে, বক্তব্যের রূপে ও উদ্দীপক শব্দের (stimulus word) রূপে দেখা দিতে পারে। যেমন,

(১) ভারতবর্ষের রাজধানী কি ?

(২) কালিদাসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তকের নাম কর।

(৩) বৈজ্ঞানিকের নাম — বিখ্যাত আবিষ্কার
নিউটন — ( )

এই প্রকারের পরীক্ষার গুণাবলী হল নিম্নরূপ :

(১) আন্দাজ করা (guessing) নিয়ন্ত্রিত হয়।

(২) একটি দিকেই চিন্তার ধারা চলে।

(৩) স্থান সংক্ষেপ করা যায়।

(৪) সহজে তৈরী করা যায়।

(৫) অল্প সময়ে অনেক বেশী বিষয় পরীক্ষার পরিধির মধ্যে আনা যায়।

এই পরীক্ষার ত্রুটিগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) সব সময়ে উত্তর আগে থাকতে নির্ধারণ করা যায় না।

(২) উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষায় অসমর্থ।

(আ) বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ

এই প্রকারের পরীক্ষার উদাহরণ হল : রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব——কবি বলে তাঁকে——বলা হয়।

এই প্রকারের পরীক্ষার দোষগুণ প্রায় প্রথম প্রকারেরই মতন। তবে

সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের একটি জটিল ধারণার প্রকাশকে এর দ্বারা অনেকটা সার্থকতার সঙ্গে পরীক্ষা করা যায়। এইভাবে ব্যবহার করলে এই প্রকারের পরীক্ষার দ্বারা উচ্চাঙ্গের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহেরও কিছুটা পরীক্ষা হয়ে যায়।

(খ) চেনার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নূতন্ পরীক্ষাসমূহ

অনেকগুলি উত্তরের মধ্যে নির্ভুল উত্তরটি চিনে নেওয়ার শক্তির উপর নির্ভর করে চার প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে সেই চার প্রকারের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) অনেকগুলির মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন। উদাহরণ :—ষড়বাহুক্ষেত্র

(অ) ষড়বাহু নামক স্থান।

(আ) বৃদ্ধা ডাইনীর পুত্রের স্থান।

(ই) নোংরামির জায়গা।

(ঈ) ছয়টি বাহুবিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র। টিক (√) দিয়ে দেখাতে হয় কোন্‌টি ঠিক উত্তর।

(২) **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় (true-false test)**

কলিকাতা শহর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন শহর।

টিক (√) দিয়ে সত্য, চিক্ (×) দিয়ে মিথ্যা দেখাতে হয়।

৩। **জোড় মেলান**

(১) নিউটন—	(১) রাসায়নিক
(২) হেমিঙ্গওয়ে—	(২) জীববিজ্ঞানী
(৩) ডারউইন—	(৩) পদার্থবিজ্ঞানী
(৪) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক—	(৪) ঔপন্যাসিক
(৫) মেণ্ডেলিফ—	(৫) জ্যোতির্বিদ্যা

বাম দিকের নম্বর দেওয়া ব্যক্তি, বস্তু বা কর্ম ইত্যাদির সহিত ডান দিকের সম্পর্কিত নম্বর দেওয়া ব্যক্তি, বা কর্ম ইত্যাদিকে যুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৪) **উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষা**

স্মিথ ও অন্যান্যেরা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন

উদ্ভাবন করেছেন। অধ্যাপক জর্ডানের মতে নূতন তথ্যের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা ও নূতন অবস্থায় পূর্বজ্ঞাত তত্ত্বপ্রয়োগের ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নগুলি বিশেষ উপযোগী।

(গ) **অন্যান্য পরীক্ষা**

আরও কয়েক প্রকারের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলিতে সাদৃশ্যদর্শন, শ্রেণীকরণ, পুনর্বিন্যাসকরণ এবং কারণের ফলদর্শন ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এইগুলির বেশীর ভাগ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় কাজে লাগে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুণাবলী

নৈর্ব্যক্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর (short answer) পরীক্ষার অনেক প্রকারের গুণ আছে। নিম্নে সেই গুণাবলীর কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

(ক) এই পরীক্ষা যে জিনিস পরীক্ষা করতে চায় সে জিনিসই পরিমাপ করতে পারে। অর্থাৎ এই পরীক্ষা সঠিক (valid)।

(খ) এই পরীক্ষার পরিমাপের ফল নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ পুনঃপুনঃ প্রয়োগে এই পরীক্ষায় প্রায় একই ফল পাওয়া যায়।

(গ) এই পরীক্ষা ব্যক্তিনিরপেক্ষ অর্থাৎ এই পরীক্ষার ফল পরীক্ষা-কারীর দেহ ও মনের প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে না।

(ঘ) এই পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া খুব সহজ। উত্তরগুলির নির্ভুলতা নির্ণয় করা খুব সহজ বলে এই পরীক্ষায় নম্বরদান করা খুব সহজ।

(ঙ) এই পরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ করা যায়। ছাপান প্রশ্নপত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ মত উত্তর দিতে হয় বলে এর প্রয়োগ খুব সহজসাধ্য।

(চ) প্রয়োগে ও নম্বরদানে কম সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়।

(ছ) এই পরীক্ষার ফলগুলি সহজে তুলনীয়। নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য বলে এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করা যায়।

(জ) আদর্শীকৃত (standardised) নূতন পরীক্ষায় উপযোগী 'গড় পরিমাপ' (norm) থাকে। এই গড় পরিমাপ সাধারণতঃ বয়স বা শ্রেণীর সম্পর্কে নির্ধারিত হয়।

(ঝ) প্রশ্নগুলি সহজ থেকে কঠিনে সাজান থাকে বলে সকলেই কিছু কিছু উত্তর করতে পারে এবং তাই কেউ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারায় না।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দোষসমূহ

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুণ অনেক আছে, কিন্তু দোষও অনেক আছে। নিম্নে দোষগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

(১) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয় এমনকি বিশেষজ্ঞদের হাতেও এর ফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।

(২) বিশেষ করে কোন বিশেষ পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এর ফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়।

(৩) এই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনেক বেশী সময় ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়।

(৪) বেপরোয়া আন্দাজ ফলকে ভ্রমাত্মক করে তুলতে পারে। যদিও এমন বেপরোয়া আন্দাজের প্রয়োগ প্রায়ই ঘটে না।

(৫) লেখাপড়ার প্রয়োজন এই পরীক্ষাতেও রয়েছে। লিখতে কম হলেও, পড়তে হয় অনেক বেশী। সুতরাং পঠনব্যাপারে ত্রুটি থাকলে এই পরীক্ষার ফল দোষযুক্ত হয়ে উঠবে।

(৬) এই পরীক্ষায় সাধারণতঃ নিম্নস্তরের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপ সম্ভব হয়।

(৭) এই পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক নয়। প্রত্যেক লিখিত পরীক্ষায় তিনটি স্তর থাকে : (১) প্রশ্ন গঠন, (২) প্রশ্নের উত্তর দান, ও (৩) উত্তরের মূল্যায়ন। নূতন পরীক্ষায় ব্যক্তি-নির্ভরশীলতা তৃতীয় স্তর থেকে দূরীভূত হলেও আর দুটি স্তরে দেখা দেয়। প্রশ্নের গঠন ও উত্তর নির্ধারণে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। পরীক্ষাতত্ত্ববিদ্ পুলিয়াস্ (Pullias) এই দোষটি খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন।

(৮) এই পরীক্ষার খরচও খুব বেশী।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপপ্রয়োগ

ভাল করে না বুঝলে এই পরীক্ষার দ্বারা প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি নিম্নমতভাবে ঘটে :

(১) শিক্ষকেরা গড় পরিমাপকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

(২) শিক্ষকদের যোগ্যতার বিচারেও এই পরীক্ষাকে প্রয়োগ করা হয়।

(৩) একটি পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে চরম বিচার করা হয়।

(৪) দৈহিক অবস্থা ও আগ্রহ ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে শুধু পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার শ্রেণীভেদ

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে আদর্শীকৃত কিম্বা অনিয়মিত (informal) এই দুই রূপে দেখা যায়। অনিয়মিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সাধারণতঃ শিক্ষকরাই প্রস্তুত করেন। কিন্তু আদর্শীকৃত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা কোন বিশেষ বিদ্যালয় বা শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হয় না। তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) নৈর্ব্যক্তিকতা,

(২) ব্যাপক প্রতিভূত্ব (wide sampling) ও

(৩) গড়পরিমাপ

এর নৈর্ব্যক্তিকতার কারণসমূহ হল :

(১) শিক্ষার্থীদের দ্বারা লেখার খুব কম ব্যবহার

(২) নির্ধারিত নির্দেশ ও সময়সীমা ও

(৩) উত্তরের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সুবিধা।

এই প্রকারের পরীক্ষায় প্রশ্নের ব্যাপক প্রতিভূত্ব এইজন্য সম্ভব হয় যে, প্রতি মিনিটে ২টি কিম্বা ৩টি থেকে ৯টি কিম্বা ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। সুতরাং বিষয়বস্তুর প্রায় প্রতিটি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়।

গড় পরিমাপ হল বিভিন্ন শ্রেণী বা বয়সের শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য গড় ফল বা নম্বর। এই গড় পরিমাপের জন্য বিশেষ শিক্ষার্থী বা বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে বৃহৎ দলের ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশেষ ব্যক্তির ফলের সঙ্গে অন্য বিশেষ ব্যক্তির ফলের এবং বিশেষ দলের ফলের সঙ্গে অন্য বিশেষ দলের ফলেরও তুলনা করা যায়।

অনিয়মিত নূতন পরীক্ষা ও আদর্শীকৃত নূতন পরীক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য

হল এই যে, প্রথমটির দ্বারা বিশেষ শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসম্পর্কিত কাজ ভালভাবে চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী, বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়-তন্ত্রের (system of schools) মধ্যে তুলনা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের কারণ হল এই যে, অনিয়মিত পরীক্ষায় শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন গঠন করা যায়, কিন্তু আদর্শীকৃত পরীক্ষায় বিশেষ শ্রেণী বা বয়সের শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই প্রশ্ন রচিত হয়। এই পার্থক্যের জন্য এই দুটি পরীক্ষাকে এক করে দেখলে ভুল করা হবে। একের দ্বারা যে কাজ সম্ভব অপরের দ্বারা সে কাজ সম্ভব নয়।

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শীকৃত পরীক্ষার প্রকাশসমূহ

অনিয়মিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দ্বারা শুধু অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য ইত্যাদির পরিমাপ উত্তমরূপে সম্ভব হয়, কিন্তু আদর্শীকৃত পরীক্ষার দ্বারা অন্য অনেক প্রকারের পরিমাপ সম্ভব এবং করাও হয়ে থাকে। আদর্শীকৃত পরীক্ষাকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) সাধারণ শক্তির পরীক্ষা, (২) বিশেষ প্রবণতার পরীক্ষা, (৩) অর্জিত জ্ঞান, নৈপুণ্য ও উচ্চাঙ্গের মানসিক ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কিত পরীক্ষা, (৪) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আদর্শীকৃত পদ্ধতি-সমূহ এবং (৫) অভ্যাস (practice, drill) সম্পর্কিত পরীক্ষাসমূহ।

সাধারণ শক্তির পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীদের সাধারণ শিখণক্ষমতা বা নূতন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়।

বিশেষ প্রবণতার পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (যেমন সঙ্গীত, গণিত ইত্যাদি) ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য ইত্যাদির পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অতীতের প্রচেষ্টার ফলের পরিমাপ করা হয়। ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনে এই ফলের জ্ঞান বিশেষ কার্যকরী হয়।

আদর্শীকৃত পরীক্ষা এবং প্রশ্নতালিকাসমূহের (inventories) ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তিত্বের অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপ সম্ভব হয়। মানুষের জীবনে ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাবের জন্য এই পরীক্ষা ও প্রশ্নতালিকাসমূহের মূল্য খুব বেশী।

অভ্যাস সম্পর্কিত পরীক্ষাসমূহের দ্বারা পাঠপরিচালনার বিশেষ সুবিধা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের সীমা

মানুষের শক্তি, অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য, প্রবণতা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কতকগুলি দিক নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায়। অনেকে মনে করেন যে, মানব-ব্যক্তিত্বের ঐ দিকগুলিই হল অন্যান্য দিকের অপেক্ষা বেশী মূল্যবান। কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়, কেননা মানব-ব্যক্তিত্বের যে সব দিককে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায় না সেসবের অনেকগুলিই হল প্রথমের দিকগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। বস্তুতঃ নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের বাইরে অনেক কিছুই রয়ে যায়। উত্তম শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন এবং সেই মূল্যায়ন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সমস্ত শিক্ষা ও প্রচেষ্টার পরেও কোন ব্যক্তি শিশুর চরিত্রের সমস্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির বেশী বুঝতে সমর্থ হয় না। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সীমারেখার কথা বিশেষ-ভাবে মনে রেখে, রহস্যময় মানব-ব্যক্তিত্বের রহস্যরাজির কথা স্মরণ করে এবং প্রয়োগবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমেরিকার প্রগতিশীল পরীক্ষকেরা পরীক্ষাজগতে মূল্যায়নের (evaluation) আন্দোলন সুরু করেছেন। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পার হয়ে অন্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। নিম্নে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

মূল্যায়নের প্রকৃতি

রাইটষ্টোন্, কুইলেন ও হান্না এবং আরও অনেক প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে কুইলেন ও হান্নার বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলে নিম্নে সেই বিশ্লেষণের পরিচয় দেওয়া হল :

(১) মূল্যায়ন হল একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সমস্ত শিখন ও শিক্ষণের এটি হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(২) মূল্যায়ন সমগ্র মানব-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই সমগ্র মানব-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইহা তথ্য সঞ্চয় করে।

(৩) অন্যান্য শিশুর সঙ্গে তুলনায় শিক্ষার্থীর অবস্থা কি তার চেয়ে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সংঘটিত বৃদ্ধি ও বিকাশের আসল পরিচয় কি তা জানতে চায়।

(৪) মূল্যায়ন প্রকৃতিতে বিবরণাত্মক ও পরিমাপগত দুই-ই।

(৫) মূল্যায়ন হল পিতামাতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি সমবেত প্রক্রিয়া।

(৬) মুল্যায়ন শিশুর আচরণ সম্বন্ধে সমস্ত প্রকারের তথ্য সমস্ত প্রকারের উপায়ের দ্বারা সংগ্রহ করে।

এর সঙ্গে রাইটষ্টোনের একটি উক্তিও যোগ করে দেওয়া যায়। রাইটষ্টোন্ বলেন, মূল্যায়ন নানা প্রকারের উপায় দ্বারা লব্ধ আচরণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহকে সংহত করে এবং ব্যাখ্যা করে ব্যক্তির একটি সামগ্রিক চিত্র গঠন করতে চায়। তাঁর মতে এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি 'সর্বব্যাপক ক্রমবর্ধমান নথির' (comprehensive cumulative record) মূল্য খুব বেশী।

মূল্যায়নের আন্দোলনের মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা যায়ঃ

মানব-ব্যক্তিত্বের সংহতি, সমগ্রতা, পরিবর্তনশীলতা, জটিলতা এবং নিছক নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূল্যায়ন আন্দোলন পরীক্ষার জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে। কিন্তু মূল্যায়ন-আন্দোলন যদি নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের পরিধির বিস্তারে কোন প্রকারের বাধা সৃষ্টি করে তাহলে বিশেষ দুঃখের কারণ হবে, কেননা মনোজগতে নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের উদ্ভব মানব-মনীষার একটা বিরাট জয়ের সূচনা করেছে এবং সেই জয় স্থাণু নয়, তার পরিধি অবিরত বাড়তেই থাকবে।

উত্তম পরীক্ষার লক্ষণসমূহ

নানাপ্রকারের পরীক্ষার আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক মূল্যায়নের জন্য যোগ্য মাপকাঠির প্রয়োজন। যে নীতিগুলির সাহায্যে পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন করা হয়েছে সেই নীতিগুলির উল্লেখ নিম্নে করা হলঃ

(১) সঠিকতা (Validity)

যে কোন পরীক্ষাকে সার্থক হতে গেলে পরীক্ষার মাধ্যমে যে বস্তুকে পরিমাপ করতে চাওয়া হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা চাই। সঠিকতা চার প্রকারের হয়ঃ (১) বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সঠিকতা (curricular validity)

(২) পরিসংখ্যানগত সঠিকতা (statistical validity), (৩) মনোবিদ্যা ও যুক্তিগত সঠিকতা (psychological and logical validity) এবং (৪) উপাদানগত সঠিকতা (factorial validity)।

(২) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করলে একই পরীক্ষার ফল একই প্রকারের হওয়া উচিত। পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য না হলে সঠিক হয় না। সুতরাং নির্ভরযোগ্যতা হল সঠিকতার একটি দিক।

(৩) নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

পরীক্ষা যতদূর সম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষ হলেই ভাল হয়, কেননা ব্যক্তিনির্ভর হলে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য হয় না। সুতরাং নৈর্ব্যক্তিকতা নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

(৪) সহজবোধ্যতা (Understandability)

সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।

(৫) পরিমিত খরচ ও সময় (Economy of time and money)

পরীক্ষার ব্যয় অপরিমিত হলে চলবে না। অন্যদিক থেকে ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যয়ও অল্প হওয়া চাই। ছাত্র ও শিক্ষকের সময়ের পরিমিত ব্যয়েরও প্রয়োজন রয়েছে।

(৬) ভাষার একার্থতা (Unequivocality)

পরীক্ষার প্রশ্নে ব্যবহৃত ভাষা দ্ব্যর্থবোধক হলে মোটেই চলবে না।

(৭) যথেষ্টতা (Adequacy)

পরীক্ষার অন্তর্গত প্রশ্নগুলি সংখ্যায় যথেষ্ট হওয়া চাই। বিষয়বস্তুর সর্বদিক পরীক্ষার পরিধির অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন।

নৈর্ব্যক্তিকতা ও যথেষ্টতা হল নির্ভরযোগ্যতার দুটি দিক।

(৮) প্রয়োগসম্পর্কিত সুবিধা (Administrability)

উত্তম পরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ করা যায় এবং নম্বর দান করাও সহজ হয়।

(৯) ব্যাখ্যা ও তুলনার সুবিধা (Interpretation and Comparability)

দত্ত নম্বরগুলিকে (scores) গড়-পরিমাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ফলে একজনের বা একদলের নম্বরের সঙ্গে অপর জনের বা অপরদলের নম্বরের তুলনা করা সম্ভব হয়।

(১০) প্রয়োজনীয়তা (Utility)

শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শ ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে পরীক্ষা সার্থক হওয়া প্রয়োজন।

(১১) কারনোদ্ঘাটনের যোগ্যতা (Diagnostic validity)

পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ত্রুটিসমূহের কারনোদ্ঘাটনের যোগ্যতা ভাল পরীক্ষার থাকা প্রয়োজন।

(১২) আগ্রহোদ্দীপকতা (Face-validity and Interest)

পরীক্ষার প্রশ্নগুলির আগ্রহ উদ্দীপনের ক্ষমতা থাকা চাই। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করলে খুব কার্যকর হবে না। তাদের একসঙ্গে প্রয়োগ করে কোন বিশেষ পরীক্ষার সার্থকতা যাচাই করা প্রয়োজন।

পরীক্ষার সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ

কোন পরীক্ষার সার্থকতা বিচারের জন্য উপরোক্ত সমস্ত নীতিকে প্রয়োগ করা হলেও সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত, কেননা, এই দুটিই হল সর্বাপেক্ষা মৌল নীতি। সঠিকতা ও নির্ভর-যোগ্যতা নিরূপণের জন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা ও পরিসংখ্যানবিদেরা অনেক প্রকারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(ক) সঠিকতা (Validity) নিরূপণ

আমরা দেখেছি যে, সঠিকতা চার প্রকারের হয়। এই চার প্রকারের সঠিকতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল বিষয়গত সঠিকতা। বিষয়গত সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়:

(১) প্রথম পদ্ধতি—পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচীকে ব্যবহার করে পরীক্ষার ফল নির্ধারণ করা।

২। **দ্বিতীয় পদ্ধতি**—বিশেষজ্ঞদের বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদলের নির্দেশ-গুলির উপযুক্ত ব্যবহার করা।

৩। **তৃতীয় পদ্ধতি**—স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ণয় করা। এই লক্ষ্যগুলির নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

পরিসংখ্যানগত সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণতঃ সংযোগ নির্ধারণ পদ্ধতি (method of correlation) ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ পরীক্ষার ফলের সঙ্গে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির সংযোগ নির্ধারণ করা হয়।

১। শিক্ষকের দেওয়া নম্বর।

২। বিচক্ষণ বিচারকদের পরিমাপ (rating)।

৩। ভবিষ্যতের ফলের পরিমাপসমূহ। (এইটির প্রশ্ন উঠে ভবিষ্যৎমুখী (prognostic) এবং প্রবণতা (aptitude) পরিমাপ-সম্পর্কিত পরীক্ষা-সমূহের বেলায়।)

অন্যান্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিরও ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির দ্বারা বিভিন্ন পটভূমির (back-ground) এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যাসম্মত সঠিকতা নির্ণয় করা প্রয়োজন হয় জটিল প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের জন্য।

উপাদানগত বিশ্লেষণের (factorial analysis) উপর নির্ভর করে উপাদানগত সঠিকতা নির্ণয় করা হয়। জটিল প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের জন্য পরীক্ষার এইরূপ সঠিকতা নির্ণয়েরও প্রয়োজন হয়।

নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ

নির্ভরযোগ্যতার দুটি দিক হল নৈর্ব্যক্তিকতা ও যথেষ্টতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিজেই হল সঠিকতার একটি দিক। সুতরাং সঠিকতার নীতি হল নির্ভর-যোগ্যতার রীতি অপেক্ষা অধিকতর মৌল (basic)।

নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনটি পদ্ধতি সাধারণতঃ অবলম্বন করা হয়ঃ

১। পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (test-retest method)।

২। সমান্তরাল রূপসমূহের পদ্ধতি (parallel forms method)।

৩। অর্ধখণ্ডিত পদ্ধতি (split-half method)।

৪। যৌক্তিক সমতার পদ্ধতি (method of rational equivalence)।

(এই পদ্ধতিগুলির বিশদ আলোচনা পরিসংখ্যানের পুস্তকসমূহের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কে Garrett, Guilford, Mcall প্রভৃতির পুস্তক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।)

পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কয়েকটি বস্তুর উপরে নির্ভরশীল। এইগুলিকে নির্ভরযোগ্যতার উপাদানসমূহ (reliability factors) বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ করা হল:

১। পরীক্ষার্থীর দেহ মনের অবস্থা।

২। পরীক্ষার্থীর পরিবেশ।

৩। পরীক্ষকের দেহ-মনের অবস্থা ও গুণাবলী।

৪। নম্বরদানের পদ্ধতি।

৫। পরীক্ষাপত্রের দীর্ঘতা।

৬। পরীক্ষার্থীদের বিস্তার (range of the subjects)।

৭। প্রশ্নগুলির কাঠিন্য।

৮। প্রশ্নগুলির স্বাধীন সত্তা।

৯। লেখার পরিমাণ।

১০। গতি।

আদর্শীকৃত পরীক্ষার গঠন-পদ্ধতি

আদর্শীকৃত পরীক্ষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তার গঠন-পদ্ধতির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় প্রয়োজন। যে কয়টি ধাপের মধ্য দিয়ে এইরূপ পরীক্ষার গঠনে সাধারণতঃ অগ্রসর হতে হয় নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

(১) **প্রথম ধাপ**—প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণের।

(২) **দ্বিতীয় ধাপ**—নির্ণীত লক্ষ্যের রূপায়ণের জন্য যোগ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন (test content) এবং প্রশ্ন গঠন।

(৩) **তৃতীয় ধাপ**—প্রতিভূস্থানীয় (representative) ছাত্রদলের উপর প্রয়োগ।

(৪) **চতুর্থ ধাপ**—প্রশ্ন নির্বাচন। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য দুটি—পরীক্ষাটির সঠিকতা এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য উপযোগিতা নির্ণয়।

(৫) **পঞ্চম ধাপ**—পরীক্ষাটির পরিবর্তিত রূপ নির্ধারণ।

(৬) **ষষ্ঠ ধাপ**—নির্বাচিত প্রশ্নগুলির উপর পুনরায় নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগের কথা কেউ কেউ বলেন।

(৭) **সপ্তম ধাপ**—ত্রিশটি ছাত্রের (১৫টি ভাল এবং ১৫টি সাধারণ ছাত্র) উপর সময় নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ।

(৮) **অষ্টম ধাপ**—যে পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষাটির সৃষ্টি তাদের শতকরা দুই ভাগের (অন্ততঃ এক ভাগের) উপর প্রয়োগ।

(৯) **নবম ধাপ**—নানাপ্রকারের গড় পরিমাপ (norm) গঠন।

(১০) **দশম ধাপ**—প্রয়োগের সাহায্যকারী পুস্তিকা গঠন।

(১১) **একাদশ ধাপ**—ব্যাপক ব্যবহারের জন্য মুদ্রণ।

(১২) **দ্বাদশ ধাপ**—ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষার বিশুদ্ধীকরণ এবং মাঝে মাঝে গড়পরিমাপের পরিবর্তন।

আদর্শীকৃত নূতন ধরণের পরীক্ষার উপকারিতা

(১) **শিক্ষণের সুবিধাসমূহ**—(ক) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিশ্লেষণের সুবিধা। (খ) শ্রেণীগত বিশ্লেষণের সুবিধা। (গ) পরিচালনা সম্পর্কিত সুবিধা।

(২) **বিদ্যালয়-পরিচালনাসম্পর্কিত সুবিধাসমূহ**—(ক) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকরণে সুবিধা। (খ) দলগত তুলনায় সুবিধা। (গ) শিখন ও শিক্ষণের উৎকর্ষ বিচারের সুবিধা।

(৩) **বৈজ্ঞানিক সুবিধা**—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত সুবিধা।

(৪) **সামাজিক সুবিধা**—এই জাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে সমাজের পক্ষে বিশেষ বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সহজ হয়। অভিভাবকরাও খানিকটা সঠিকভাবে জানতে পারেন তাঁদের শিশুদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ফলাফল।

আদর্শীকৃত পরীক্ষার ত্রুটি

সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষার যে-সব ত্রুটির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেগুলি

আদর্শীকৃত পরীক্ষার বিষয়েও প্রযোজ্য, কেননা আদর্শীকৃত পরীক্ষাও এক প্রকারের সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা। তার উপর সাধারণভাবে গঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ ছাত্র, শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে প্রয়োগের জন্য এই পরীক্ষা খুব উপযোগী নয়।

পরীক্ষার প্রকারভেদ

কয়েক প্রকারের পরীক্ষার সংগে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি, যেমন, রচনামূলক পরীক্ষা, অনিয়মিত নূতন ধরণের পরীক্ষা, ও আদর্শীকৃত নূতন ধরণের পরীক্ষা। এগুলির মধ্যে পার্থক্য হল গঠনগত। মাধ্যমের দিক থেকে পরীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, মৌখিক ও লিখিত। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার প্রচলনই খুব বেশী। তবে চাকরীর জন্য নির্ধারিত কোন কোন পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষারও প্রয়োগ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এমন কতকগুলি বস্তুর পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয় যেগুলির পরিমাপ লিখিত পরীক্ষার দ্বারা নেওয়া সম্ভব নয় যেমন, ব্যক্তিত্ব, শিষ্টাচার, নির্ভীকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বলার ক্ষমতা, উচ্চারণ শুদ্ধি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রচনামূলক পরীক্ষা ও নূতন সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা হল লিখিত পরীক্ষার দুটি বিশেষ প্রকার।

পরিচালকদের দিক থেকে পরীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বাহ্যিক পরীক্ষা। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বিদ্যালয়ের নিজ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। বাহ্যিক পরীক্ষা বাইরের পরিচালকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় যেমন, ইউনিভারসিটি, বোর্ড, কমিটি, ইত্যাদি। শিক্ষণের দিক থেকে বাহ্যিক পরীক্ষার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপকারিতা অনেক বেশী, কেননা এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শক্তি, প্রবণতা, শিখন-পদ্ধতি, অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। বাহ্যিক পরীক্ষায় সুবিধা হল তুলনামূলক আলোচনার। এক শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের ফলের সঙ্গে অন্য শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের ফলের তুলনার সুবিধা বাহ্যিক পরীক্ষার অনেক বেশী। কিন্তু সাধারণভাবে গঠিত হয় বলে শিক্ষণের দিক থেকে বাহ্যিক পরীক্ষা খুব কার্যকরী হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন ছাত্র, শ্রেণী, ও বিদ্যালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এই পরীক্ষায় অবহেলিত হয়। বাহ্যিক

পরীক্ষার এই বৃহৎ ত্রুটির জন্য অনেকে বাহ্যিক পরীক্ষার অবসান ঘটাতে চান। কিন্তু সমাজের দিক থেকে এর কিছু সুবিধা আছে বলে (অর্থাৎ একটা সাধারণ পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শ্রেণী, ও বিদ্যালয়ের ফলকে দেখা যায় বলে) এর অবসান ঘটান এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও না।

উপরে আমরা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরীক্ষার ভাল সম্ভাবনাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানতঃ আলোচনা চালিয়েছি। কিন্তু এগুলি যদি খারাপ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক বেড়ে যায় এবং ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ বিপর্যয় ঘটে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উভয় পরীক্ষাই নিতান্ত বিকৃত রূপ ধারণ করেছে এবং ফলে ক্ষতিও প্রভূত পরিমাণে ঘটছে। ক্ষতিকারক এই পরীক্ষাব্যবস্থার বিশুদ্ধীকরণের জন্য প্রচেষ্টা অবশ্য করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তনই হয় নি। নিম্নে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বিশুদ্ধীকরণের উপায়সমূহ আলোচিত হল।

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি

(১) বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় বাহ্যিক পরীক্ষার প্রভাবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, কেননা বাহ্যিক পরীক্ষায় পাশ করাই হল সামাজিক দিক থেকে পরম সম্মানের বস্তু। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার রূপ ও প্রকৃতি বাহ্যিক পরীক্ষার দ্বারা ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পরীক্ষার শিক্ষণ-সম্পর্কিত গুণাবলী অন্তর্হিত হয়েছে।

(২) এদেশের সমস্ত পরীক্ষা এখনও প্রধানতঃ রচনামূলক। সুতরাং সাধারণ রচনামূলক পরীক্ষার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি এগুলির মধ্যে বর্তমান।

(৩) রচনামূলক পরীক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য যে সব প্রচেষ্টা প্রগতিশীল দেশসমূহে হচ্ছে, সেই সব এখানে অনুপস্থিত থাকায় এখানের পরীক্ষা-ব্যবস্থা আদিম অবৈজ্ঞানিক স্তরেই রয়ে গেছে।

(৪) বাহ্যিক পরীক্ষার পরীক্ষকেরা অনেক সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার স্তরের কর্মে লিপ্ত না থাকায় প্রশ্নপত্র রচনা বা উত্তর পরীক্ষা অত্যন্ত ত্রুটির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) বহুকাল বিদেশীশাসিত ও জমিদার নিপীড়িত জাতির সাধারণ

নিষ্ঠুরতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে কঠিন প্রশ্ন রচনা ও কম নম্বরদানের মাধ্যমে।

(৬) পরীক্ষকদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিশেষ শিক্ষাদান করা হয় না।

(৭) দেশের সাধারণ চারিত্রিক অবনতির ফলে পরীক্ষকেরা সাধারণতঃ পরীক্ষাকার্যকে অর্থোপার্জনের অন্যতম পথ মাত্র মনে করেন এবং অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গেই পরীক্ষাকার্য সমাধা করেন।

(৮) অর্থনৈতিক কারণেই প্রধানতঃ সমাজের সাংস্কৃতিক দ্রুত অবনতি ঘটায় ছাত্রদের অনুষ্ঠানের (achievement) মান ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। এর ফলে পরীক্ষাকার্য এক দুঃসহ কর্তব্যে পরিণত হচ্ছে। ফলে এ ক্ষেত্রেও অনুষ্ঠানের মান ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

(৯) বিদ্যালয়ের শিক্ষণের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে উপনীত হওয়ায় ছাত্রদের অনুষ্ঠানের কোন উন্নতি ঘটছে না এবং সেইজন্য পরীক্ষার মানেরও ক্রমাবনতি ঘটছে।

(১০) এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা অবাঞ্ছিতভাবে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং তাই নূতন সহযোগিতাভিত্তিক সমাজগঠনের বিরোধী শক্তিরূপে কাজ করে।

(১১) বৌদ্ধিক দিকের আংশিক ও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পরিমাপ ভিন্ন শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্য সম্পাদনের কোন হিসাবই এই পরীক্ষা দেয় না। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে এই পরীক্ষা শিক্ষাক্রিয়াকে বহুলাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে বিপথগামী করে তুলেছে। প্রাণরস নিষ্কাশণের এক বিরাট কার্যকরী যন্ত্র হিসাবে এই পরীক্ষা সার্থকভাবে কাজ করে।

(১২) ত্রুটিযুক্ত প্রশ্ন রচনার দ্বারা সমগ্র বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে তোলে।

(১৩) বেছে বেছে প্রশ্ন তৈরী করা ও মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব অর্পণ করে।

(১৪) পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সুযোগ এই পরীক্ষা নষ্ট করে দেয়।

(১৫) উদ্দীপক হিসাবে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিযুক্ত। শিক্ষার প্রতি প্রয়োজনীয় আসক্তি সৃষ্টি হয় না এবং ফলে অনেক শিক্ষার্থী শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে।

(১৬) বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুর প্রতি বীতরাগ এই পরীক্ষা অনেক সময়ে সৃষ্টি করে।

(১৭) যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তি-সমূহের বিকাশ ব্যাহত করে।

(১৮) ভাল রচনাভঙ্গির (style) চর্চা হয় না।

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিনিরাকরণের উপায়সমূহ

(১) যে-কোন পরীক্ষাব্যবস্থার কর্মপরিকল্পনার প্রথম কথা হল উদ্দেশ্য নিরূপণ। প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(২) এই উদ্দেশ্যগুলিকে বিভিন্ন আচরণিক উপাদানের (যেমন শক্তি, প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদি) ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

(৩) উদেশ্যগুঁলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হলে পর যোগ্য পরিমাপ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হচ্ছে কিনা দেখতে গেলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও কৌশলগুলির প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রয়োজন:

(ক) আদর্শীকৃত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন।

(খ) শিক্ষককৃত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন।

(গ) পরিশুদ্ধ রচনা-পদ্ধতির ব্যবহার।

(ঘ) সুবিন্যস্ত পর্যবেক্ষণ।

(ঙ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন তালিকা (diagnostic inventory)

(চ) কেস ষ্টাডি (বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ পরীক্ষা)

(ছ) তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার হিসাব (anecdotal records)।

(জ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন (rating and evaluation by pupils)।

(ঝ) ব্যক্তিত্ব ও প্রক্ষোভগত অভিযোজনের পরীক্ষা।

(ঞ) শিক্ষকদের দ্বারা ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্র (rating scale for use by teachers)

(ট) কথোপকথন ও দেখা করা (conversation and interview)।

(ঠ) 'প্রোজেক্টিভ' কৌশলসমূহ (projective techniques)।

(ড) মনোভাব পরিমাপের বিভিন্ন প্রচেষ্টা।

(ঢ) ইচ্ছা, ভাললাগা, মন্দলাগা, প্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপের বিভিন্ন প্রচেষ্টা।

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রভাব কমিয়ে দেওয়া। একমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন এই কথা মনে রাখা।

(৫) বাহ্যিক পরীক্ষা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর অনেক বেশী গুরুত্ব অর্পণ।

(৬) দলগত পরীক্ষা অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরীক্ষা যে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় এ কথা মনে রেখে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করা।

(৭) সম্ভাব্য বিকাশ ঘটছে কিনা দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অঙ্কের (A. Q.) যোগ্য ব্যবহার।

(৮) যে-কোনপ্রকারের প্রশ্নের ব্যবহার করা হউক না কেন, দেখতে হবে যে, প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলি যেন (১) প্রয়োজনীয় বস্তুসম্পর্কিত হয়, (২) দ্ব্যর্থবোধক না হয়, (৩) ভাল করে শেখান বস্তুসম্পর্কিত হয়, (৪) পশ্চাৎপদ ছেলেদের কিছুটা সাফল্যের সুযোগ দেয় এবং (৫) ভাল ছেলেদের কিছুটা সাফল্যের সুযোগ দেয়। প্রশ্নগুলি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, নম্বরদান যেন যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হয়।

(৯) বাহ্যিক পরীক্ষাসমূহ থাকলে সেগুলির সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমান উচিত।

(১০) ধারাবাহিক নথিপত্র (cumulative records) রাখা কর্তব্য এবং ধারাবাহিক নথির সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত কার্ড (cumulative record card) রাখাও কর্তব্য।

(১১) সমস্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় প্রদান অর্থাৎ প্রয়োজন মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ।

(উপরের আলোচনায় এমন অনেক বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রয়োজনানুরূপ বিশদ ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া সম্ভব নয় বলে পাঠকদের শিক্ষাসম্পর্কিত মনোস্তত্ত্বের পুস্তক এবং পরীক্ষা-সম্পর্কিত বিশেষ পুস্তক পাঠ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে)।

শিক্ষা ও সমাজ

শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজের অস্তিত্ব, বিকাশ ও পরিবর্তন শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং শিক্ষারও অস্তিত্ব, বিকাশ ও পরিবর্তন সমাজের সঙ্গে জড়িত। বস্তুতঃ একের সঙ্গে অপরের প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়তই চলছে। বহু বন্ধন ও বহু গ্রন্থিযুক্ত হল তাদের সম্পর্ক। নিম্নে এই সম্পর্কের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হল।

শিক্ষা সমাজনির্ভর

(১) শিক্ষার উদ্ভবস্থল সমাজ

মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে।

(২) শিক্ষা সমাজেই সম্ভব

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে। এবং তা হতে বাধ্য, কেননা শিক্ষাক্রিয়ার সংজ্ঞার মধ্যেই সমাজের উপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হল উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মানবের দ্বারা মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনের প্রক্রিয়া। তাই যদি হয় তাহলে শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি অপরিহার্য এবং এরা দুপক্ষ থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

(৩) সামাজিক সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা হল শিক্ষার মাধ্যম

দেখা গেল, শিক্ষার উদ্ভব হয় সমাজে এবং তার অস্তিত্বের জন্য সামাজিক সম্পর্কের প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমও কিন্তু সামাজিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা। সামাজিক পরিবেশে সঞ্চিত ও নূতন সামাজিক অভিজ্ঞতা পরিবেশনের মাধ্যমেই মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন করা হয়।

(৪) সমাজাদর্শের দ্বারা শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়

শিক্ষাক্রিয়ার মাধ্যমই শুধু সামাজিক নয়, সামাজিক আদর্শের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজের যা আদর্শ শিক্ষারও তাই আদর্শ এবং

শিক্ষার আদর্শের দ্বারা, আমরা পূর্বেই দেখেছি, শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন, পরীক্ষা, পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং সমাজের আদর্শের প্রভাব শিক্ষাক্রিয়ার সর্বদিক ও সর্বস্তরে প্রকট হয়ে উঠে।

(৫) সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তন সূচিত হয়

যেহেতু সামাজিক আদর্শের দ্বারা শিক্ষাক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, সেইহেতু সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সমাজাদর্শ পরিবর্তিত হলে শিক্ষাক্রিয়ারও পরিবর্তন সুরু হয়। বস্তুতঃ পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাক্রিয়াও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমাজ শিক্ষানির্ভর

(১) সমাজের অস্তিত্ব শিক্ষার উপর নির্ভরশীল

দৈহিক দিক থেকে বংশধারার সাহায্যে সমাজ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু নূতন মানুষের সৃষ্টি হলেই সমাজ বাঁচতে পারে না। সমাজের মানসিক প্রবহমানতা বজায় রাখারও প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য চাই নবজাতকদের মধ্যে তার বাঁচার ও চিন্তার পদ্ধতিসমূহের সঞ্চালন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চালন অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষাকে সমাজজীবনের একটি মৌল স্তম্ভ বলে গ্রহণ করা হয়।

(২) শিক্ষা সমাজ-পরিচালনার অস্ত্র

সমাজসংহতির জন্য সমাজের সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বদাই অনুভূত হয়। এই আচরণ নিয়ন্ত্রণ দুই ভাবে সংঘটিত হতে পারে—(১) ভিতরের দিক থেকে, ও (২) বাইরের দিক থেকে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণই হল মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, সেইহেতু আচরণ নিয়ন্ত্রণের সাহায্যকারী প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার মূল্য অসীম, কেননা শিক্ষার দ্বারাই সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হতে পারে।

(৩) শিক্ষা সমাজ-পরিবর্তন ও সমাজ-প্রগতির হাতিয়ার

সমাজ-প্রক্রিয়ার মৌল শক্তি হল উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও তাদের প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি গঠন ও তাদের প্রয়োগ-সম্পর্কিত জ্ঞান বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ লাভ করে। এই জ্ঞানের পরিবর্তন হলে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও প্রয়োগের কৌশলের পরিবর্তন হয় এবং

এগুলির পরিবর্তন হলে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। এই সামাজিক সম্পর্কের আবার পরিবর্তন হলে সমাজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হয়, কেননা সবকিছুই তখন পরিবর্তিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধ্য হয়।

উৎপাদনের যন্ত্রপাতিগঠনের ও তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হলে সেই জ্ঞান সঞ্চালিত করার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের নূতন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হলে জীবনের বিভিন্ন দিকে নূতন চিন্তার প্রয়োজন হয় এবং সেই চিন্তার প্রসারের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজের নূতন বিন্যাস সংঘটিত হলে ও নূতন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হলে নবজাতকদের নূতনাদর্শে শিক্ষাদান করারও প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষা হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি মৌল শক্তি। উপরের বিশ্লেষণকে আরও এক ধাপ পেছিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাই হল সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান মৌল শক্তি, কেননা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিবর্তন পূর্ব শিক্ষার উপর নির্ভর করেই উদ্ভূত হয়। কোন নূতন উদ্ভাবনই সম্পূর্ণভাবে পুরাতন শিক্ষার প্রভাব নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং নূতন জ্ঞান শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত সামাজিকভাবে কার্যকরী হতে পারে না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আজকের দিনে নূতন পরিবর্তনের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করে সমাজপরিবর্তনে শিক্ষার প্রভাবকে আরও বর্ধিত করার প্রয়াস প্রগতিশীল শিক্ষকরাকরছেন।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, উপরে সমাজ-পরিবর্তনের যে রূপরেখা অংকিত করা হল তা ঐ পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত সাধারণ ও সরলীকৃত রূপ। বাস্তবক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের ধারা অনেক বেশী জটিল। তথাপি এই সরলীকৃত সাধারণ চিত্রকে উপস্থাপিত করা হল এই কারণে যে, সমাজ-পরিবর্তনের অতি জটিল ধারাকে এর সাহায্যে অনেকটা সহজে বোধগম্য করা সম্ভব।

রাজনীতি ও শিক্ষা

(১) গণতন্ত্র ও শিক্ষা

যদিও শিক্ষা সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রেই চলতে পারে এবং চলে, তথাপি গণ-

তন্ত্রের সংগে শিক্ষার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা নিবিড়। প্রকৃত গণতন্ত্র চায় ব্যক্তি-জীবনের ও সমাজ-জীবনের পূর্ণ বিকাশ। স্পষ্টতঃ এই বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রিয়ার ব্যাপক ও সার্থক বিস্তার। পক্ষান্তরে, শিক্ষারও অব্যাহত বিকাশের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের, কেননা একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ঐ রূপ অব্যাহত বিকাশ সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক জীবন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ।

(২) অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শিক্ষা

অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও শিক্ষানির্ভর, কেননা সেখানেও রাষ্ট্র-পরিচালকদের আদর্শানুযায়ী নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেই শিক্ষা ভিন্ন রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না। আবার শিক্ষাও সেখানে রাষ্ট্রনির্ভর, কেননা রাষ্ট্র-পরিচালকদের নির্দেশেই প্রধানতঃ শিক্ষা সেখানে পরিচালিত হয়। তবে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে না। একদিকে সেই শিক্ষা সর্বজনব্যাপী হয় না। অন্যদিকে শাসক ও শাসিতের শিক্ষায় গুণগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। আবার এমনকি শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষাও এই সব রাষ্ট্রে পূর্ণতা লাভ করে না, কেননা শোষকরূপী শাসকদের শিক্ষা বহুলাংশে অলংকরণ ও উপভোগের শিক্ষায় পর্যবসিত হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রে জন-সাধারণের শিক্ষা যে অপূর্ণাঙ্গ ও দাসজনোচিত হয়, সে কথা ত' সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণের শিক্ষা এখানে মুক্তির জন্য নয়, বন্ধনকে কায়েম করবার জন্যই এই শিক্ষা পরিচালিত হয়।

(৩) শিক্ষাজগতের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (Academic freedom and the State)

শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনার সময়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেটি হল শিক্ষাজগতের স্বাধীনতার সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে প্রধানতঃ তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন, শিক্ষাক্রিয়ার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন, কেননা রাষ্ট্রের প্রভাবে পরিচালিত শিক্ষা কখনও ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সমাজের প্রগতিসাধন করতে পারে না। আর একদল বলেন, শিক্ষাক্রিয়া কখনও রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না এবং রাষ্ট্র কখনও তার মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থী শিক্ষাক্রিয়াকে চলতে দিতে পারে

না। সুতরাং শিক্ষাক্রিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতালে উচিত। তৃতীয় দল বলেন, শিক্ষাক্রিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব না হলেও রাষ্ট্রের প্রভাব যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, কেননা তা না হলে ব্যক্তির বিকাশ অব্যাহতভাবে সাধিত হবে না।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সমস্যাটির সমাধান রাষ্ট্রের প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হতে পারে না। রাষ্ট্র যদি প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক হয় তাহলে রাষ্ট্রের সংগে সমতালেই শিক্ষার চলা উচিত। কিন্তু অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত। তবে তা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়, কেননা অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষাকে আত্মপ্রভাবমুক্ত করে কখনও আত্ম-বিলুপ্তির পথ সুগম করতে পারে না। এখানে বলা প্রয়োজন, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাজগতের প্রগতিশীল শক্তিগুলির উচিত রাষ্ট্রের সাধারণ প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে শিক্ষার ও রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম করা।

উপরে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার উচিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতালে চলা এবং পূর্বে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও শিক্ষার উদ্দেশ্য একই। কিন্তু তথাপি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেশ্যনির্ণয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের উচিত নয় শিক্ষাক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা। শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষাবিদ্‌দের নেতৃত্ব ও পরিচালনা অকুণ্ঠভাবে মেনে নেওয়া।

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা

সমাজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রাষ্ট্রনীতি বস্তুতঃ অর্থনীতিরই প্রতিফলন। তাই শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বলতে আসলে অর্থনীতিরই প্রভাবকে বোঝায়। সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তিশালী দলগুলির স্বার্থেই তাদের নেতাদের নেতৃত্বে সাধারণতঃ রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয়। এমনিভাবে অর্থনীতির প্রভাব রাষ্ট্রের মাধ্যমে শিক্ষার উপর পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সরাসরিই শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম কথা হল এই যে, বাঁচার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন না হলে কোন সমাজেই শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থের পরিমাণও শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের অর্থ নৈতিক

শ্রেণীবিন্যাস সরাসরিভাবে শিক্ষার রূপান্তর ঘটায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী থাকলে ধনী শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষা পৃথক রূপ নেয়। (অবশ্য ধনী ও দরিদ্রশ্রেণী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।) শিক্ষাতাত্ত্বিকদের তত্ত্বকথাও সাধারণতঃ এই শ্রেণীবিন্যাসের ও শ্রেণীগত শিক্ষার সমর্থনে রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের শিক্ষাদর্শনের নাম করা যায়। (অবশ্য ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এইরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি মেলে।) তৃতীয়তঃ, সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক ক্রিয়ার প্রকৃতি শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষাতত্ত্বের সর্বদিকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন কৃষিনির্ভর সমাজের শিক্ষা এক প্রকার হয়, হস্তচালিত কারুশিল্পনির্ভর সমাজের শিক্ষার রূপ একপ্রকার হয় এবং যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যনির্ভর সমাজের শিক্ষার রূপও আর এক প্রকারের হয়।

সমাজের বিভিন্ন শিক্ষাদানকারী সংস্থাসমূহ

আমরা দেখেছি যে, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনকেই শিক্ষা বলা হয়। আমরা এও দেখেছি যে, শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার প্রগতিসাধনই হল তার প্রধান কাজ। শিক্ষাদানের জন্য সমাজসৃষ্ট সংস্থা কিন্তু একটি বা এক প্রকারের নেই। সমাজের নানাপ্রকারের সংস্থাই পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও মিলিত-ভাবে শিক্ষাদানকার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ই হল শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় সংস্থা। অন্য বহু প্রকারের সামাজিক সংস্থা শিক্ষাদানকার্যে লিপ্ত হলেও কেবল মাত্র বিদ্যালয়েরই একমাত্র কর্ম হল শিক্ষাদান করা। শিক্ষাদানকারী অন্য সংস্থাগুলির মুখ্য কর্ম নানা প্রকারের থাকে। সুতরাং শিক্ষাদানকার্যে তারা পরোক্ষভাবে এবং প্রায় প্রসঙ্গতঃ লিপ্ত হয়। নিম্নে বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

পরোক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ক) পরিবার

পরোক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবারই হল সর্বপ্রধান। তবে পূর্বের ন্যায় বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য আর নেই।

পূর্বে পরিবারের মাধ্যমেই শিশু দৈহিক, বৌদ্ধিক, ধর্মীয়, নীতিগত, সৌন্দর্য-গত, বৃত্তিগত ও সামাজিক শিক্ষালাভ করত, কিন্তু যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার, ব্যক্তিস্বাধীনতা বোধের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য পূর্বের একান্নবর্তী বহুকর্মবিশিষ্ট পরিবারের অস্তিত্ব সমস্ত অগ্রসর দেশেই লুপ্তপ্রায়। এখন স্বামী, স্ত্রী ও দু-চারটি পুত্রকন্যাকে নিয়েই পরিবার গঠিত হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জীবিকার্জনের জন্য গৃহপরিবেশের বাইরে অনেকটা সময় কাটাচ্ছেন। থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধূলা, ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার অবিরত প্রসার, জীবন বীমার ব্যাপ্তি, ছোটোখাটো বিভিন্ন প্রকারের সভাসমিতির উদ্ভব, হোটেল-রেস্তোরাঁ ইত্যাদি আহারের সাধারণ স্থানের ক্রমবিস্তার ইত্যাদির জন্য পরিবারের অনেক কর্মই এখন কমে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের পক্ষে শিশুদের শিক্ষাভার গ্রহণও পরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভার অনেক কমিয়ে দিচ্ছে। যদিও এই সমস্ত কারণে শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে অর্থাৎ তার শিক্ষায় পরিবারের দান অনেকটা কমে যাচ্ছে, তথাপি সেই দান এখনও নগণ্য নয়। মৌলিক অভ্যাসগুলির আয়ত্তের বিষয়ে, শিশুর সামাজিকতার ও নৈতিক বিকাশ বিষয়ে এবং তার প্রক্ষোভ-জীবনের সুষম পরিণতি বিষয়ে পরিবারের দান এখনও অপরিসীম। শিশুর পারিবারিক শিক্ষা এখনও তার সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিরূপে কাজ করে এবং সেই ভিত্তি দুর্বল হলে স্বভাবতঃই উপরের কাঠামোও দুর্বল হয়ে পড়ে।

(খ) ধর্ম

অদৃশ্য অপার্থিব শক্তির সঙ্গে বোঝা-পড়া করাই হল ঐতিহাসিক ধর্মসমূহের মূল কথা। মানুষ যতদিন নিজের ভাগ্যের উপর বিশেষ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে নি, ততদিন সে খুব বেশী ধর্মনির্ভর ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে তার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এখন ধর্মের প্রভাব তার জীবনে অনেকটা সীমিত হয়েছে এবং ক্রমশই তা কমে যাচ্ছে। মানুষ যখন ধর্মনির্ভর ছিল তখন সমগ্র জীবনের মত তার শিক্ষাও ধর্মভিত্তিক ছিল। বর্তমানে ধর্মভাবের সংকোচনের ফলে ধর্মের সেই সর্বব্যাপী প্রভাব আর নেই। তবুও সমাজের অনগ্রসর অংশের মধ্যে এবং অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে ধর্মের প্রভাব আজও কম নয়। স্বভাবতঃ এই সব অংশের ও জাতির শিক্ষায় ধর্মের প্রভাব এখনও বেশ কিছুটা

প্রবল। সুতরাং এখনও কোন সমাজের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে গেলে ধর্মের প্রভাবের আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে উঠে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধর্মের প্রভাব মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা প্রক্ষোভ ও প্রেষণার দিকের উপর অনেক বেশী অনুভূত হয়।

(গ) রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের প্রভাব জীবনে ও শিক্ষায় ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত অগ্রসর দেশেই রাষ্ট্র এখন কম-বেশী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেও সরাসরি অনেক শিক্ষামূলক প্রয়াসে লিপ্ত হয়। সুতরাং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের হিসেব করলে একথা বলা যায় যে, শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রই এখন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল। রাষ্ট্রীয় আদর্শ শিক্ষাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে; ঐ শিক্ষাদর্শ অনুসারে শিক্ষাকার্য চালিত হয়; রাষ্ট্রীয় অর্থ-সাহায্য, বিভিন্ন কমিশন-কমিটি ও পরিদর্শকগণের মাধ্যমে শিক্ষাকার্য নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার প্রকাশ ও বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রীয় প্রভাব এমনি বহুভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিকীর্ণ হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, পার্লামেণ্টবিশিষ্ট গণতন্ত্রের বাহিরে বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত।

(ঘ) সংবাদপত্র

সংবাদ পরিবেশন, সংবাদ নির্বাচন ও সংবাদ সংব্যাখ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে সংবাদপত্র ব্যক্তি ও সমাজের আচরণের (ব্যাপক অর্থে) উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে সংবাদ-পত্রের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাবের জন্য সংবাদপত্রকে পূর্বে রাষ্ট্রের 'চতুর্থ অঙ্গ' (Fourth Estate) বলা হত। সংবাদপত্রের এই ব্যাপক প্রভাবের জন্য সমাজের প্রভাবশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকদলসমূহ একে কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টা করে। কুক্ষিগত সংবাদপত্রের কুপ্রভাব বিকিরণকারী প্রভাব শিক্ষাজগতের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা।

(ঙ) যুব সংগঠন

শিশুর শিক্ষার উপর যুবসংগঠনের প্রভাব অসীম। বর্তমানে নানা-প্রকারের যুব সংগঠন এদেশেও গঠিত হয়েছে। যুব সংগঠনগুলির মাধ্যমে

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এই সব সংগঠন সাধারণতঃ ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, নূতন অভিজ্ঞতা, ও মানসিক সংস্কৃতি সম্পর্কীয় হয়ে থাকে। এই সংগঠনগুলির প্রভাব যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করেই অনেক আধুনিক রাষ্ট্র নানাভাবে এদের উপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সংস্থাগুলিও শিক্ষাজগতের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম, কেননা সাধারণতঃ এগুলি সুপথে পরিচালিত হয় না।

(চ) চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি

এই সব সামাজিক সংস্থাকে কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ শিক্ষার নিষ্ক্রিয় মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ, তাঁদের মতে, এদের প্রভাব সাধারণতঃ একমুখী হয়। অর্থাৎ এরা প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু প্রভাবিত হয় না। এই সব সমাজতত্ত্ববিদের মত কিন্তু যুক্তিসহ মনে হয় না, কেননা শুধু প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু প্রভাবিত হয় না এই-রকম সামাজিক শক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। সমস্ত সামাজিক শক্তিই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও পরস্পরের উপর প্রভাবশীল। তবে একথা ঠিক যে, সকলের প্রভাব সমানভাবে বিকীর্ণ হয় না বা অন্যদের সমানভাবে প্রভাবিত করে না।

(১) চলচ্চিত্র

এই সব পরোক্ষ মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রই এতাবৎ বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ চলচ্চিত্র একসঙ্গে বহু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয় এবং তার উপকরণের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যও প্রায় সীমাহীন। বেশীর ভাগ দেশে অসৎভাবে মানুষের যৌনচেতনাকে উদ্রিক্ত করে চলচ্চিত্র বর্তমানে তার প্রভাবকে বিশেষভাবে প্রসারিত করেছে এবং তজ্জন্য এই প্রভাব শিশুর শিক্ষার উপরে, বিশেষকরে কৈশোরের শিক্ষার উপরে, এক বৃহৎ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও চলচ্চিত্রের এই দিককার অসৎ প্রভাবের সমালোচনা শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিই অবিরত করে থাকেন তথাপি বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি এই কারণে যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চালকরা বিত্তশালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সমশ্রেণীভুক্ত ও পৃষ্ঠপোষক এবং নৈতিক দিক থেকেও তাদের সমপর্যায়ভুক্ত।

(২) বেতার

শিশুর শিক্ষায় বেতারের প্রভাবও বিপুল হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে এখনও বেতারের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগান হয় নি বলে ইদানীং বহুপ্রচলিত হলেও এদেশের শিক্ষায় বেতার তেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের ভাষণ দেশের দূরতম অংশেও প্রেরণ করে বেতার জাতির মানসিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং যোগ্য ব্যবস্থায় করেও। যে সব দেশে আক্ষরিক জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের প্রসার এখনও সর্বব্যাপী হয়নি সেই সব দেশে বেতারের সম্ভাবনা রয়েছে সর্বাধিক।

(৩) টেলিভিশন

আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশে টেলিভিশন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং মানুষের মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। বেতারের অপেক্ষা এর আবেদন স্বভাবতঃই বেশী, কেননা এখানে আবেদন শুধু কানের দ্বারে নয় চোখের দ্বারেও। শিক্ষার আয়ুধ হিসাবে এর ভবিষ্যৎ বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। অনুন্নত দেশগুলিতে এর প্রসার বেতারের মত অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর্থিক কারণে তা ঘটে উঠছে না।

(ছ) বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা

এখানে 'সামাজিক' কথাটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক দেশে এই রকম সংকীর্ণ অর্থের সামাজিক সংস্থা অনেক দেখা যায় যাদের কাজ হল সাধারণ সামাজিক মানবীয় সম্পর্কের উন্নতিসাধন। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তার উন্নতি বিধান করে এবং সমাজদেহের ক্ষত অপসারণে সাহায্য করে এই সব সামাজিক সংস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয়।

বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক (মানসিক) সংস্থাও প্রত্যেক দেশে থাকে। নাটক, সংগীত ও নৃত্যাদির মাধ্যমে এগুলিও প্রভূত শিক্ষাদান করে।

(জ) স্থানীয় সমাজ

বৃহত্তর মানবীয় ও জাতীয় সমাজের প্রভাব স্থানীয় সমাজের মাধ্যমেই প্রধানতঃ মানুষের উপর বিকীর্ণ হয়। স্থানীয় সমাজের বহুবিচিত্র জীবনধারাই বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবশীল হয়। এইজন্যই আধুনিক কালে সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই স্থানীয় সমাজের

সংগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় করে তোলবার চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন, পরীক্ষা ও পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছুই প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় শিক্ষায় এখনও এই সব জিনিস নিতান্ত তত্ত্বের বস্তু। তবে বিশ্বপ্রগতির জোয়ারের টানে ভারতকেও এদিকে এগোতে হবে।

(ঝ) লাইব্রেরী, মিউজিয়ম ইত্যাদি

লাইব্রেরী ও মিউজিয়মকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বলা যায়, কেননা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদান। অগ্রসর দেশসমূহে এদের শিক্ষামূলক অবদান প্রচুর। সংখ্যা ও ব্যাপ্তির স্বল্পতার জন্য এরা এখনও ভারতবর্ষে তেমন প্রভাবশীল হয়ে উঠেনি, যদিও জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য এদের বিস্তৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।

(ঞ) রাজনৈতিক দলসমূহ

পুস্তিকাপ্রকাশ, সভা আহ্বান, 'পোষ্টার' ও বিজ্ঞপ্তি বিতরণ, মিছিল গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমান কালে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুশিক্ষামূলক হয় না, তথাপি এই রাজনীতি-নির্ভর যুগে এদের ভূমিকা অপরিহার্য এবং ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করবে।

(ট) রঙ্গমঞ্চ

জনসাধারণের মানসিক বিকাশের উপর যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির প্রভাব বহুকাল ধরেই বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে এসেছে। তবে এই ব্যাপ্ত সমাজ-চেতনার যুগে এদের প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে এমনি আশা করা যায়।

(ঠ) বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ

পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ চিরকালই মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানকালে এই সংস্থাগুলি তাদের প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার ফলে ঐ প্রভাব স্বভাবতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ড) পৌরপ্রতিষ্ঠানসমূহ

নানাপ্রকারের নির্দেশ দান করে, বহুপ্রকারের কার্য করে, পুস্তিকা প্রকাশ করে, প্রচারপত্র বিলি করে, এইসব প্রতিষ্ঠান প্রভূত শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির প্রভাবও যুগপ্রভাবে ক্রমবর্ধমান।

শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়

(ক) বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিবর্তন

বিদ্যালয়ের উৎপত্তি বিষয়ে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে কল্পনার স্থান অনেকটাই রয়েছে। তথাপি উদ্ঘাটিত তথ্যের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নে বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল।

আদিম সমাজে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক কোন সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব তত প্রকট নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এখানে প্রধানতঃ পরিবারের উপরই শিক্ষাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। কোন কোন আদিম সামাজিক দলে কিন্তু কতকগুলি লোকের হাতে সমাজের রীতিনীতি ও আদর্শ-নির্ধারণের ভার অনেকটা অর্পিত হয়েছিল। এঁরা ছিলেন সমাজ-নেতা এবং প্রবীণ ব্যক্তি। পুরোহিতের ও শিক্ষকের কাজও তাঁদের খানিকটা করতে হত। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য নবাগতদের বিশেষ শিক্ষাও দেওয়া হত। কোন কোন আদিম দলে আবার কতকগুলি ছোট ছোট দল বিভিন্ন পেশায় ও কারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল যেমন, বাড়ী তৈরী, অস্ত্র তৈরী, পোষাক তৈরী ও ধাতুর কাজ ইত্যাদিতে। এই দলগুলিও নবাগতদের দলে গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও গুপ্ত জ্ঞান দান করত, অর্থাৎ শিক্ষা দিত। অনেক আদিম দলে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়ে বিশেষ উৎসবাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের সমাজের পূর্ণসভ্য করে নেওয়া হোত। এই উপনয়নকল্প উৎসবকে শিক্ষাদানের একটি ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা যায়, কেননা এইসব উৎসবের মাধ্যমে কিশোরদের অনেক গুপ্ত জ্ঞানদান ও নৈপুণ্য শিক্ষাদান করা হোত। সুতরাং দেখা গেল যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে আদিম সমাজে বিদ্যাদানের জন্য কোন পৃথক সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিত এবং শিশুরা বয়স্কদের অনুকরণ করে ও পারিবারিক কর্মে অংশগ্রহণ করে নানাপ্রকারের শিক্ষালাভের মাধ্যমে সমাজের পূর্ণাংগ সভ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করত।

মানব-সমাজে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল তখনই যখন লিখিত সাহিত্যের

উদ্ভব হয়েছিল এবং লেখা ও পড়া শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়গুলি পুরোহিত কিম্বা লেখা-পড়া জানা লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হোত। ইজিপ্টে মন্দির ও রাজসভার সংগে যুক্ত হয়ে প্রথম বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ইহুদীরা ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে এসে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। ইহুদীদের দেশে শিক্ষা সব সময়েই ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত।

আদিম ও প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে উপসংহারে বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্যই পরিচালিত হোত। বিরলতার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার ঐ সমাজে প্রভূত মূল্য ছিল। সমাজজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকের উন্নতির জন্য ঐ সময়ে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণের শিক্ষা কিন্তু বিদ্যালয়ের আবির্ভাবের পরেও বিদ্যালয় ভিন্ন সমাজের অন্য সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হোত। প্রাচীন ইজিপ্টে ও মধ্যপ্রাচ্যে জনসাধারণের শিক্ষা আদিম সমাজের মতই চলত। অনুকরণ ও পরিবারের প্রাত্যহিক কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সর্বদিকের শিক্ষা গ্রহণ করত। প্রাচীন ভারত ও চীন দেশের শিক্ষাও মোটামুটি ঐ একইভাবে পরিচালিত হোত। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য এবং দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করত। পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষানবিশী প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু সে শিক্ষাও ছিল বিদ্যালয়বহির্ভূত।

উপরোক্ত প্রাচীন প্রাচ্য দেশগুলির তুলনায় গ্রীসদেশের শিক্ষায় বিদ্যালয়ের নূতন পরিণতি ঘটেছিল। সেখানে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল এবং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলি প্রায় আধুনিক রূপগ্রহণ করেছিল। সেখানে যখন সামাজিক জীবন নগর-রাষ্ট্রকে (city-state) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তখন শিক্ষাও তার প্রাচীন অসংগঠিত (informal) অবস্থা ত্যাগ করে রাজনৈতিক রূপলাভ করেছিল। সমস্ত প্রাচীন দেশেই অবশ্য এমনি করে রক্তের বন্ধনের পরে রাজনৈতিক বন্ধন সমাজের মৌল বন্ধন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রীসের পরিণতি ছিল একটু ভিন্ন প্রকারের। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও চীনের শিক্ষার মৌল প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় হলেও

আসলে তা ছিল ব্যক্তিগত, কেননা রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতীক সম্রাটের সেবার জন্যই সেই সব দেশে শিক্ষাদান করা হোত। ইহুদীদের এবং প্রাচীন ভারতীয়দের শিক্ষা মূলতঃ ধর্মীয় লক্ষ্যের দ্বারা চালিত ছিল। কেবলমাত্র গ্রীকদের বেলায় শিক্ষা নাগরিকদের শিক্ষার আয়ুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও নাগরিকতার প্রচলিত আদর্শের দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হোত। সুতরাং বিদ্যালয়ের রূপান্তরে গ্রীকদের দুটি দান প্রধান। একটি হোল বিদ্যালয়কে প্রকৃত রাজনীতিভিত্তিক করে তোলা এবং অন্যটি হল শিক্ষার (এতাবৎ কাল পর্যন্ত প্রচলিত) তিনটি স্তরের বিদ্যালয়-সমূহের রূপ নির্ধারণ। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষাও ছিল সমাজের শাসকদের জন্য। অগণিত দাস জনসাধারণের জন্য সে শিক্ষা ছিল এক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বস্তু।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পরে রোমকদের মধ্যে বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্যভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। শিক্ষাদানের জন্য পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের উদ্ভব গ্রীকদের সংস্কৃতির প্রসারের সংগেই ঘটেছিল। বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলি মোটামুটি গ্রীকদের বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হয়েছিল। তবে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল বিদ্যালয়ের সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে। গ্রীকদের অপেক্ষা রোমক শাসকরা ও পৌরকর্তারা শিক্ষকদের সাহায্য করত এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করত। সুতরাং একথা বলা যায় যে, এক অর্থে রোমকরা ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের (Public Schools) স্থাপন করেছিল। তবে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সন্তানরাই মুখ্যতঃ পাঠ করত। তাদের দ্বার জনসাধারণের জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে অর্গলবদ্ধ ছিল।

ইয়োরোপের মধ্যযুগের শিক্ষায় ধর্মের প্রভাব বিশেষ প্রবল ছিল। তবে মধ্যযুগের বিদ্যালয়গুলি শুধু যাজক-পরিচালিত ছিল না। নগরগুলিতে সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রোম সাম্রাজ্যের পরে-ও কখনও লুপ্ত হয় নি। মধ্যযুগের প্রথম দিকে (Early Middle Ages) রাজন্যবর্গ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে তাদের প্রভাব সাধারণতঃ যাজকদের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হোত। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে যাজকদের সর্বময় কর্তৃত্ব যদিও মধ্যযুগের প্রথম স্তরে স্থাপিত হয়েছিল, তথাপি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভবের ফলে সে কর্তৃত্ব মধ্যযুগের শেষের দিকে অনেকটা খর্ব হয়েছিল। গরীবদের ও সাধারণ লোকের সন্তানদের জন্য কিছু কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে মধ্যযুগের শিক্ষা সাধারণতঃ জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরের বস্তু ছিল। আদিম ও প্রাচীন যুগের মত মধ্যযুগেও পেশাগত শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয় ছিল না এবং নারীদের জন্য কোন পৃথক বিদ্যালয় বা ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

নবজাগরণের যুগের শিক্ষাও প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য ছিল। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় নেতৃবর্গ তৈরী করার জন্য শিক্ষা দিত। রাজন্যবর্গ তাঁদের সমর্থক অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেন এবং নবোত্থিত সহরের মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজেদের সন্তানদের অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রয়াসী ছিল। তবে গণতন্ত্রের দিকে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল এই কারণে যে সাধারণ লোকদের জন্য দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের (vernacular school) দাবী ক্রমাগত উচ্চগ্রামে উঠেছিল এবং শিক্ষার নিম্নতম স্তরে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ও শহরগুলিতে বেশী করে দেখা দিতে সুরু করেছিল। মধ্যযুগের শিক্ষার সংগে এই যুগের শিক্ষার একটি প্রধান পার্থক্য হল এই যে, রাজন্যবর্গ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের জন্য বিদ্যালয়-গুলিতে যাজকদের একচ্ছত্র আধিপত্য অনেকটা খর্ব হয়েছিল। বিদ্যালয়-সমূহে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজন্যবর্গের এই হস্তক্ষেপ পরবর্তী কালের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়াপত্তন করেছিল।

ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেন অপেক্ষা ইয়োরোপের লুথার ও ক্যালভিন প্রভাবিত দেশগুলিতে শিক্ষা নবজাগরণের যুগের অপেক্ষা বেশী করে রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত দেশগুলিতে এ যুগেও শিক্ষাকে গির্জার ও সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব বলে মনে করা হত এবং তাই রাষ্ট্রের প্রভাব বেশী বিস্তৃত হয় নি। যদিও এ যুগেও শিক্ষা প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর জন্য ছিল, তথাপি জার্মানী প্রমুখ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট দেশগুলিতে জনসাধারণের জন্য নিম্নস্তরের শিক্ষার অনেকটা প্রসার হয়েছিল। জ্ঞানবিকাশের যুগে (Age of Enlightenment) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল।

জাতীয় সরকারদের শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে বিশেষ করে জার্মানী ও ফ্রান্সে বিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন করবার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। সমাজের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিদ্যালয়কে নিজেদের প্রভাবের আওতায় আনবার চেষ্টা করেছিল এবং মাধ্যমিক স্তরে নূতন প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন করবারও চেষ্টা করেছিল। নবজাগরণের যুগ থেকে আসা প্রাচীন ভাষাভিত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এই প্রথম বাধার সম্মুখীন হল। এই সময়ে নূতন ধর্মের অনুপ্রেরণাও দেখা দিয়েছিল এবং বিদ্যালয়গুলিতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে এই প্রভাব নূতন প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Dissenters' Academies) স্থাপনের মাধ্যমেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিদ্যালয়গুলি অবশ্য ইংলণ্ডের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীরও প্রয়োজন মেটাত। এই যুগে জনসাধারণের শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। তবে সে শিক্ষা দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিল বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুমাত্র আভাস দেয় নি। জনসাধারণকে সামান্য জ্ঞান ও অক্ষর পরিচয় দেবার চেষ্টামাত্র করা হয়েছিল। নিজেদের শাসন ও পরিচালিত করবার প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা জনসাধারণকে এই যুগে মোটেই দেওয়া হত না।

উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা গণতন্ত্রের অভিমুখে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক-পূর্ব স্তরে নূতন ধরণের বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে যেখানে স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুদের সর্বাংগীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। প্রাথমিক স্তরেও স্বাধীনতা, আনন্দ ও কর্মের মধ্য দিয়ে সর্বাংগসুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ব্যক্তিবৈষম্য ও সমাজের বহুমুখী চাহিদার দিকে নজর রেখে সাধারণ শিক্ষার সংগে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় গবেষণার স্থান সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র চলেছে। শিক্ষার এই স্তরে শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর চিন্তার স্বাধীনতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে যতটা স্বীকার করা হয় বর্তমানে কার্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা হচ্ছে না। এর কারণ, ধনতান্ত্রিক জীবনধারা ও মতবাদের সংগে কমুনিষ্ট মতবাদ ও জীবনধারার সংগ্রাম সারা দুনিয়াতেই খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। কোন দেশের রাষ্ট্রই চিন্তাকে পূর্ণভাবে বাধা-

বন্ধনমুক্ত রাখতে সাহসী হচ্ছে না। তবে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে রাষ্ট্রের প্রভাব প্রধানতঃ পরোক্ষভাবেই সঞ্চারিত হচ্ছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ হল এই যে, ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে সমস্ত অগ্রণী দেশের বিদ্যালয়গুলিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের কিছুদূর পর্যন্ত এই সব রাষ্ট্রে শিক্ষা আবশ্যিক বলে গৃহীত হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষারও প্রভূত ব্যাপ্তি ঘটেছে।

(খ) বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়

গণতন্ত্রের বিকাশ, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের অস্তিত্ব এবং আধুনিক সমাজের বহুমুখী চাহিদার জন্য বর্তমানকালের সমাজে (বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশে) বহুপ্রকারের বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়কে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ সে প্রচেষ্টাও করেছেন। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ফিল্ডলে ইংলণ্ডের মত ধনতন্ত্রী কিন্তু গণতন্ত্রী দেশগুলির বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন মান প্রয়োগ করে ভাগ করেছেন। তাঁর এই বিভাগটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণাংগ হওয়ায় নিম্নের শ্রেণীকরণ প্রচেষ্টায় তাঁকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

(১) মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

আধুনিক ধনতন্ত্রী দেশের বিদ্যালয়গুলিকে মালিকানার ভিত্তিতে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, ব্যক্তিগত স্বত্বের বিদ্যালয়, সংঘ-সমিতি পরিচালিত বিদ্যালয়, গচ্ছিত সম্পত্তিনির্ভর (endowed) বিদ্যালয়, কোচিং ক্লাস, ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান (correspondence course), সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয় ইত্যাদি। আজকাল ভারতবর্ষে এই সমস্ত প্রকার বিদ্যালয়ই দেখা যায়। তবে ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান ও কোচিং ক্লাস ইত্যাদির বিস্তার এখনও খুব বেশী হয় নি।

(২) সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

দেশের বিদ্যালয়গুলিকে আবার সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করা যায়, যথা জনসাধারণের জন্য বিদ্যালয় এবং অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের বিদ্যালয়। অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের পৃথক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব গণতন্ত্রবিরোধী

কেননা এদের দ্বারা সামাজিক অসাম্যকে জাতীয় জীবনে কায়েম করা হয়। গণতন্ত্রের মেকী সমর্থকরা অনেক সময় অর্থহীন যুক্তির দ্বারা এই সব বিদ্যালয়ের সমর্থন করে। দুঃখের বিষয় গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় নূতন করে স্থাপিত হচ্ছে।

(৩) শিক্ষার্থীর লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

সমাজের বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার্থীর লিঙ্গের উপর নির্ভর করেও শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। সমস্ত বিদ্যালয়কে এই দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—পুরুষদের জন্য বিদ্যালয়, নারীদের জন্য বিদ্যালয় এবং মিলিত নারী ও পুরুষদের জন্য বিদ্যালয়। নারীজাতির অগ্রগতির জন্য এই জাতীয় শ্রেণীকরণ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে লুপ্ত হবে। এই জাতীয় শ্রেণীকরণ পুরাতন যুগের প্রভাব এবং নারী ও পুরুষের চাহিদা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে লিঙ্গের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সংগঠন ও শ্রেণীকরণ এখনও যথেষ্ট প্রচলিত।

(৪) শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনের শক্তির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

সমস্ত শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনের যোগ্যতা সমান নয়। কেউ কেউ শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য বিদ্যার্জনের পথে সহজে এগোতে পারে না। কেউ কেউ বৌদ্ধিক অপটুত্বের অথবা চারিত্রিক ত্রুটির জন্য বিদ্যালাভে যোগ্যভাবে অগ্রসর হতে পারে না। কেউ কেউ শক্তির প্রাচুর্যের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হয় না। এই সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য দেশে দেশে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যেমন, মূক-বধিরদের বিদ্যালয়, অন্ধদের বিদ্যালয়, হীন বুদ্ধিদের বিদ্যালয়, অপরাধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, প্রতিভাধরদের জন্য বিদ্যালয় ইত্যাদি। ভারতবর্ষেও উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর বিদ্যালয় বর্তমান। গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিভাধরদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে প্রতিভাধরদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

(৫) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

ব্যক্তির চাহিদাও বিভিন্ন, সমাজের চাহিদাও নানা প্রকারের। তাই বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যেমন, প্রাচীন ভাষানির্ভর বিদ্যালয়, যন্ত্রশিক্ষাদানের বিদ্যালয়, বাণিজ্যিক

বিদ্যালয়, চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিদ্যালয়, শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়, কারুশিল্প বিদ্যালয়, রেডিও নির্মাণ-সংক্রান্ত বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয় ইত্যাদি।

স্বাধীন ভারতে এই সব বিদ্যালয়ের প্রসার পরাধীন ভারতের অপেক্ষা অনেক দ্রুত বেগে হচ্ছে। তবে দেশের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী।

(৬) শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থিতির সময়ের পরিমাণের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ

সমস্ত প্রকারের শিক্ষালয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব সমানভাবে গ্রহণ করে না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থানের সময়ও সবক্ষেত্রে সমান নয়। আবার সব বিদ্যালয়ের কাজ একই সময়ে চলে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর অবস্থানের সময় ও দায়িত্বের ভিত্তিতেও বিদ্যালয়গুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, যেমন, দিবা বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয়, গ্রীষ্মাবকাশের সময়ের বিদ্যালয় ইত্যাদি। ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলির বিষয়েও এই শ্রেণীকরণ মোটামুটি প্রযোজ্য।

(৭) শিক্ষার্থীর জীবন ও শিক্ষার স্তরের উপর নির্ভরশীল শ্রেণীকরণ

অতি শৈশব (infancy), বাল্য (childhood), কৈশোর (adolescence) ও পরিণত অবস্থা (adulthood) মোটামুটি এই কয়টি স্তরে মানুষের জীবনকে মনস্তাত্ত্বিকেরা ভাগ করে থাকেন। জীবনের এই সব স্তর ও শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্তরানুযায়ী নানাপ্রকারের বিদ্যালয় আধুনিক কালের সমাজে দেখা যায়। এই বিদ্যালয়গুলি হল যথাক্রমে—নার্সারী, মন্তেসরী, কিণ্ডারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়।

নার্সারী, মন্তেসরী, কিণ্ডারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয়গুলি হল অতি শৈশবের শিক্ষার জন্য। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হল বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষার জন্য এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল কৈশোরোত্তর বয়স্কদের জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ের এই শ্রেণীবিভাগই হল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং অন্য সমস্ত প্রকারের শ্রেণীবিভাগোদ্ভূত বিদ্যালয়গুলিকে এর শ্রেণীগুলির মধ্যে স্থান দেওয়া যায়, যথা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে নারী, পুরুষ ও

মিলিত নারীপুরুষের বিদ্যালয়, সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়, বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয়, দিবা ও রাত্রির বিদ্যালয়, সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, ন্যাসী (trust) বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান চালিত বিদ্যালয় ইত্যাদি বহুপ্রকারেরই বিদ্যালয় দেখা যায়।

এই শ্রেণীকরণোদ্ভূত বিভিন্ন শিক্ষালয়ের শিক্ষার প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) নার্সারী, মন্তেসরী, কিণ্ডারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয়

এই সব বিদ্যালয়ে ছয়-সাত বছরের নীচের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষালাভ করে। গৃহের অবিন্যস্ত শিক্ষার পরিবর্তে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্তরের শিক্ষার প্রধান কাজ হল দৈহিক বিকাশসাধন করা ও শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে মৌলিক অভিযোজন সম্পাদন করা। দেহের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অভ্যাসসমূহ আয়ত্ত করান ও পেশীসমূহের যোগ্য ব্যবহার শেখান, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য প্রধানতঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার শেখান, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য উত্তম সামাজিক ব্যবহার শেখান এবং প্রক্ষোভগত বিকাশের জন্য সংযত অথচ আনন্দপূর্ণ ব্যবহার শেখান ইত্যাদি হল এই বিদ্যালয়গুলির প্রধান প্রধান কাজ। এই স্তরের শিক্ষার শেষের দিকে লেখা, পড়া ও গণিতের কিছু স্থান থাকলেও তা অত্যন্ত নগণ্য। লেখা, পড়া ও গণিত ইত্যাদির প্রকৃত আরম্ভ হল পরবর্তী প্রাথমিক স্তরে। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষা হল আক্ষরিক অর্থে মৌলিক শিক্ষা। পরবর্তী সমস্ত স্তরের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এই স্তরেই হয়।

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এইগুলিতেই শিশুরা লেখা-পড়া ও গণিত রূপ শিক্ষার মৌলিক প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ত করে। তবে এই স্তরের শিক্ষারও মৌল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশ সাধন করা। বিশেষ শিক্ষার আরম্ভ হয় পরবর্তী স্তরে এবং পরিণতি হয় সর্বশেষ স্তরে। স্বভাবতঃই এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সর্বদিকের বিকাশ পূর্বের স্তরের অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে সাধিত হয়।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এই শিক্ষালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা ও ঝোঁকগুলির বিকাশের চেষ্টাও করা হয়। তবে বর্তমানে এই স্তরেও বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হয় শিক্ষার্থীর সাধারণ বিকাশের উপর। এই স্তরের বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রক্ষোভগত, সামাজিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিকের বিকাশের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়।

(ঘ) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চতর শিক্ষার এই বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নূতন সত্য উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছুটা সাধারণ শিক্ষাদানের জন্য আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলেছে। বলা বাহুল্য নিছক পেশাগত শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের জন্যই এই প্রচেষ্টা।

(ঙ) বিদ্যালয়ের কার্যাবলী

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষাদান শুধু বিদ্যালয়ের কার্য নয়। সমাজের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকার্যে লিপ্ত থাকে। এমনকি বলা হয়েছে যে, সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতিই (বাস্তব ও মানসিক) হল শিক্ষার বাহক। তথাপি শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থাকে সর্বাধিক। নিম্নে সাধারণভাবে সমস্ত প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান কার্যের পরিচয় দেওয়া হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কার্যগুলি হল শিক্ষার লক্ষ্যের রূপায়ণের সহায়ক কার্যসমষ্টি। সুতরাং শিক্ষার মৌল লক্ষ্য বা লক্ষ্যগুলির আলোকে এগুলি নির্ধারিত।

(১) সংস্কৃতির পরিবহন

বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল মানবজাতির ও দেশীয় সমাজের সঞ্চিত সংস্কৃতির সংগে পরিচয় ঘটান। তবে যেহেতু সমগ্র সংস্কৃতির সংগে পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়, এমন কি ক্ষতিকারকও, বিদ্যালয়কে সঞ্চিত সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে নির্বাচন ও সরলীকৃত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিশুদ্ধও করে নিতে হবে।

(২) মানসিক ঐক্য স্থাপন

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হল কতকগুলি সাধারণ বস্তুর শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা।

(৩) মানসিক বৈষম্যের বিকাশ

মঙ্গলময় সমাজ-জীবনের জন্য মানসিক ঐক্যও যেমন প্রয়োজনীয়, মানসিক বৈষম্যের অর্থাৎ ব্যক্তি মনের স্বাধীন বিকাশও তেমনি প্রয়োজনীয়। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। এই বৈষম্যভিত্তিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। ফলে শিক্ষার প্রথম স্তরগুলিতে সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে এবং শেষের স্তরগুলিতে বৈষম্যমূলক শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে।

(৪) শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটান

শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলিকে মেটাবার চেষ্টা বিদ্যালয়কে করতে হবে। তা না হলে শিক্ষা জীবন-বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাই শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থহীন হয়েও উঠবে।

(৫) শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাব্য শক্তির অনুসন্ধান ও বিকাশ

শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাব্য শক্তির (capacity) সংগে বিদ্যালয়কে পরিচিত হতে হবে এবং সেগুলির উন্নততর স্তরে বিকাশের জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

(৬) উপযুক্ত আসক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটান

মানবজীবনের মূল্যবান দিকগুলির প্রতি উপযুক্ত আসক্তি তৈরী করা ও সেই আসক্তিকে যোগ্যভাবে পরিচালিত করা হল বিদ্যালয়গুলির অন্যতম প্রধান কাজ, কেননা ঐরূপ আসক্তি না তৈরী হলে ব্যক্তিরও যোগ্য বিকাশ হয় না, সমাজেরও হয় না।

(৭) জ্ঞানের বিন্যাস ও প্রয়োগ

জ্ঞানের যোগ্য বিন্যাস ও সংহতি প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা সৃষ্টিরও প্রয়োজন। বিদ্যালয় এই প্রয়োজনগুলি মেটায়।

(৮) পরিচালনা

নানারূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের আসক্তি, প্রবণতা, শক্তি ও দুর্বলতার সংগে পরিচিত হয়ে তাদের উপযুক্ত সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিত্বের অভিযোজনে, পাঠে এবং বৃত্তির পথে চালিত করা হল বিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ।

(৯) মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ের সংগে অন্যান্য নানা প্রকারের প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাকার্যে লিপ্ত হয়, আমরা দেখেছি। শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে বিদ্যালয়ের কার্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মূল্য নির্ধারণ করা। কেননা তবেই তার পক্ষে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুবলয়িত বিকাশ সাধন করা সম্ভব হবে।

(১০) সম্পূরণ

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মূল্যায়নের পর যদি দেখা যায় যে, শিশুর বিকাশের মধ্যে কোথাও ফাঁক রয়েছে তাহলে বিদ্যালয়ের কাজ হবে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা।

(১১) সংশোধন

কোন দিক থেকে শিশুর বিকাশের উপর কু-প্রভাব বিস্তৃত হলে, সেই কুপ্রভাবের ফল সংশোধনের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের করা উচিত।

(১২) প্রতিষেধ

যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়কে কুপ্রভাবের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) শিক্ষাক্রিয়ার সংহতি সাধন

নানাপ্রকারের সংস্থার দ্বারা শিশুর বিকাশের উপর যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়, শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য তাদের সংহত করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়কে সেই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

(১৪) প্রক্ষোভগত বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংসাধন

মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে আজ সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্ প্রক্ষোভগত বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। বিদ্যালয়ের

অন্যতম প্রধান কাজ হল শিশুর এইদিককার বিকাশের প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা।

(১৫) উদ্দীপনাত্মক কার্য

গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল গণতান্ত্রিক জীবনধারার প্রতি গভীর আসক্তি ও উদ্দীপনাপূর্ণ নূতন নাগরিকদল সৃষ্টি করা।

বিদ্যালয়ের উপরোক্ত কার্যাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাদানের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত সামাজিক সংস্থা হওয়ার জন্য কতকগুলি কার্যের উদ্ভব হয়েছে। অন্য কার্যগুলির উদ্ভব হয়েছে বিদ্যালয়ের সংগে অন্যান্য শিক্ষা-মূলক সংস্থার সম্পর্ক থেকে।

———

বিদ্যালয় ও সমাজ

যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর শিক্ষায় শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান ছিল প্রচুর। বিদ্যালয়ের কাজ সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনেই নিবদ্ধ থাকত। জনসাধারণের পক্ষে অবশ্য এই বৌদ্ধিক বিকাশ সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ মুখস্থ করার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকত। বিজ্ঞাননির্ভর যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পরিবার, ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক অবদানের সুযোগ অনেকটা কমে গেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপূর্ণতা সকলের সামনে প্রকট হয়ে উঠল। শিক্ষাবিদেরা ও সমাজতাত্ত্বিকেরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলবার চেষ্টায় অগ্রসর হলেন। তাঁদের তত্ত্বগত প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষালয়ের সংগে সমাজের গভীর ও ব্যাপক সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নিম্নে তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হল।

সমাজ বিদ্যালয়-নির্ভর

(১) বিদ্যালয় সমাজসৃষ্ট সংস্থা। সঞ্চিত সংস্কৃতির সঞ্চালন সার্থকতর করে তোলবার জন্যই সমাজ তাকে সৃষ্টি করেছে। এই সংস্কৃতির সঞ্চালন যে সমাজের ধারাবাহিক অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং বিদ্যালয়ের সঠিক পরিচালনার উপর সমাজের সুস্থ অস্তিত্ব অনেকটা নির্ভরশীল একথা আমরা বলতে পারি। শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব বর্তমানে অনেকটা কমে যাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই দিককার কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

(২) বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজ খুব সার্থকভাবে তার সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কেননা বিদ্যালয়ের প্রভাব সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্যদের মনের উপর বিপুলভাবে প্রতিফলিত হয়।

(৩) সমাজের দোষত্রুটির আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক চেতনা জাগরূক করা যায় এবং যোগ্য পরিচালনার দ্বারা তাদের দক্ষ সামাজিক কর্মী ও নেতারূপে গড়ে তোলা যায়।

(৪) সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যার (যেমন, ধর্মবিরোধ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি) সমাধানের জন্যও অনেক সময় সমাজ বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে। তবে সমাজের মৌল সমস্যাসমূহের (যেমন, শ্রেণীবৈষম্য) সমাধান শুধু বিদ্যালয়ের সাহায্যে করা যায় না, কেননা রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক ব্যক্তিরা বিদ্যালয়কে এই পথে বেশী দূর এগোতে দেয় না এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য দিতেও পারে না।

(৫) মঙ্গলময় ব্যক্তি ও সমাজজীবনের জন্য নির্ধারিত তত্ত্বাদির সত্যতা-নির্ণয় বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকটা সম্ভব। আবার বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের জন্য নূতন তত্ত্ব নির্ধারণ সম্ভব। সুতরাং বিদ্যালয়কে সমাজের নবজীবন গঠনের গবেষণাগার রূপে ব্যবহার করা যায়। তবে এখানেও সমাজের নেতৃস্থানীয় শক্তিসমূহের ভিত্তিবিপন্নকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিদ্যালয় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না, কেননা তাদের দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য বাধা আসবেই।

(৬) চলমান বিশ্বে মানব-সমাজও চলমান। এই চলমান সমাজের উপযুক্ত জ্ঞান, মনোভাব ও আচরণ নির্ধারণে ও গঠনে বিদ্যালয়ের প্রভাব বিপুল। তবে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন কখনও আনা যায় না, কেননা যে বাধার কথা উপরে বারে বারে বলা হয়েছে সেই বাধার সম্মুখীন এখানেও হতে হবে।

বিদ্যালয় সমাজ-নির্ভর

(১) সঞ্চিত জ্ঞান, নৈপুণ্য, ভালমন্দবোধ ও সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির সঞ্চালনের মাধ্যমে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা হল শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজ এবং এই কার্য সম্পাদনের জন্যই প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সমাজের অস্তিত্বের উপর বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

(২) সমাজ-জীবনে যোগ্যভাবে অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তোলে। সুতরাং সমাজের আদর্শের দ্বারা বিদ্যালয়ের আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিদ্যালয়ে পরিবেশিত অভিজ্ঞতা সমষ্টির (অর্থাৎ বিষয়বস্তুর) প্রকৃতি, ঐ অভিজ্ঞতাসমূহের পরিবেশনের পদ্ধতি (অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি) এবং সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের জীবনধারা সমাজের প্রকৃতি, কর্ম ও চিন্তাধারার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা, সাংস্কৃতিক

মান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আদর্শ এই সমস্তই বিদ্যালয়ের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

(৩) সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সংগে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি ও কর্মধারার পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয় সাধারণতঃ হয় সমাজ পরিবর্তনের (social change) অনুবর্তী। কিছুটা সীমিত ক্ষেত্রে বিদ্যালয় যে সমাজ-পরিবর্তনের প্রবর্তক ও হতে পারে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি।

(৪) সমাজের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতাতেই বিদ্যালয় তার কর্তব্য সম্পাদন করে। শিশুকে শিক্ষাদান করা একা বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

(৫) সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। প্রয়োজনীয় অর্থ ও শিক্ষার্থিগণ সমাজ থেকেই আহৃত হয়।

(৬) সমাজের প্রগতিসাধনই বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের পৃথক কোন লক্ষ্য নেই।

গণতান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষা

উপরে শিক্ষা ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের যে চিত্র দেওয়া হল তা বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই। যেহেতু এই সমাজ প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক নয়, সেইহেতু বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা এর মধ্যে সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থাৎ যে সমাজে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অসাম্য এবং কায়েমী স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত সেই সমাজে বিদ্যালয় হবে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু এবং পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল জীবনদর্শনের সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র ও পরিপোষক। বিদ্যালয়ে জীবনদর্শনকে প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শনকে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা হবে। এমন কি বিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে নূতন জীবনদর্শনের উদ্ভব সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কর্মধারা তখন সমাজনেতাদের স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা খণ্ডিত ও খর্ব হবে না। সর্বমানবের মঙ্গলই হবে তখন তার সমস্ত কর্মের লক্ষ্য ও মানদণ্ড। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কের আলোচনাকালে যে সব বাধার উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্তই তখন অন্তর্হিত হবে। তখন ডিউইর বর্ণনানুযায়ী বিদ্যালয় হবে সরলীকৃত, পরিশুদ্ধ ও সুসমঞ্জস সমাজ, এমনকি সমাজের পথ-প্রদর্শক।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের উন্নতিবিধান

(ক) বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্কের ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সংগে সমসাময়িক সমাজের সম্পর্ক মোটেই গভীর ছিল না। পুস্তকে সঞ্চিত অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চালনই ছিল বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলি ছিল পুস্তককেন্দ্রিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রথমতঃ জন ডিউইর সমাজ-সচেতন শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে প্রগতিশীল দেশসমূহে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, শিশুকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে সবচেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করা হত শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছা, ঝোঁক, কর্মপ্রবণতা ও অনুভূতির উপর। শিশুর বর্তমানের ঝোঁক ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই তাকে সবকিছু আয়ত্ত করতে শেখান হত এবং শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার উপরই ঐ সব বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যালয় ও তার বেষ্টনকারী সমাজের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত করবার চেষ্টা সর্বপ্রথম স্বরু হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিকে এখন সমাজ-কেন্দ্রিক করবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সমাজকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্মধারা সম্বন্ধে ই, জি, অলসেন (E. G. Olsen) নিম্নমত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক সমাজকেন্দ্রিক বিদ্যালয়—

(১) জনসাধারণের ঝোঁক ও চাহিদার দিকে চেয়ে তার লক্ষ্য নির্ণয় করে ;

(২) তার কর্মপরিকল্পনায় সমাজের নানাপ্রকারের সংস্থা ও উপকরণের ব্যবহার করে ;

(৩) সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মে গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করে ;

(৪) মানবজীবনের প্রধান প্রধান সমস্যা ও কর্মকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় অংশ (core) গঠন করে ;

(৫) সমাজের ক্ষুদ্র ও ব্যাপক অংশসমূহে যৌথ-জীবনের পরিকল্পিত ও সংযুক্তভাবে সাধিত উন্নতির জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করে ;

(৬) শিশুদের এবং বয়স্কদের পরস্পরের স্বার্থে ও প্রয়োজনে দলগত সমস্যামূলক কর্মে (project) নিযুক্ত করে।

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতিসাধনের উপায়

আমরা বলেছি যে, বিদ্যালয়কে সমাজের সংগে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা সবেমাত্র স্বরু হয়েছে। আমরা এও বলেছি যে, আজকের জগতের অসম্পূর্ণ

গণতন্ত্রসমূহে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব নয়। তথাপি এই অবস্থাতেও বিদ্যালয় ও সমাজকে কিছুটা সার্থকভাবে যুক্ত করতে হলে বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে কি কি করণীয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

বিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ

(১) বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংগে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে তার উচিত সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও আদর্শগুলিকে ভাল করে জানিয়ে দেওয়া।

(২) যেহেতু বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিক্ষার্থীদের সমাজের যোগ্য সভ্যরূপে প্রস্তুত করে তোলা, সেইহেতু শিশুদের পূর্ণশিক্ষা কখনও শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে শুধু আলোচনা করলেই চলবে না, সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ও বিচিত্র জীবনের সংগে তাদের প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত করে দিতে হবে। সমাজ-জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য নিম্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়ঃ

(ক) সরকার, পৌর প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশিত ছাপা পুস্তিকা, বিবরণী ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানদান করা যায়।

(খ) সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতাদের সংগে ছাত্রদের পরিচিত করে দেওয়া যায়। তাঁদের বিদ্যালয়ে কথোপকথন বা বক্তৃতার জন্য আনা যায় এবং বাছাই করা ছেলেদের তাঁদের কাছে পাঠান যায়। অবশ্য যে ছেলেদের পাঠান হবে তাদের ফিরে আসার পরে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে।

(গ) চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যকারী উপকরণসমূহের সাহায্যে অর্থাৎ মডেল, চার্ট, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানদান করা যায়।

(ঘ) চারপাশের সামাজিক অবস্থা ও সংস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের সম্বন্ধে বিবরণী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজকে চিনতে শেখে এবং সমাজের বয়স্ক সভ্যরাও সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়।

(ঙ) স্থানীয় সমাজের সংগে পরিচয় লাভ করলেই হবে না। বাইরের বৃহত্তর সমাজের সংগে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘভ্রমণ (extended field trips) ও দূরে শিবির স্থাপন (camping trips)। শহর, রাজধানী, সুদূর পল্লীগ্রাম ও শিল্পকেন্দ্র ইত্যাদিতে এই সব ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। সহজেই বোধ্য যে, এর মধ্য দিয়ে সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব জীবন্ত হয়ে উঠবে।

(চ) সমাজের সেবার জন্য নানাপ্রকারের প্রচেষ্টা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সমাজের লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে অর্জন করা যায়।

(ছ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সময়ে অর্থোপার্জনের জন্য সমাজে আংশিকভাবে কাজ করে (part-time work) সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

(জ) বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাবপত্র স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে দিয়ে বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলা যায়।

(ঝ) অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সংস্থা (parent-teacher association) সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন সম্ভব।

(ঞ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম ও উৎসবাদিতে সমাজের লোকদের আহ্বান করে বিদ্যালয়ের সংগে তাঁদের যোগাযোগ নিবিড় করে তোলা যায়।

বেণ্ট ও ক্রোনেনবার্গ (Bent and Cronenberg) বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিক বলে নিম্নে দেওয়া হল।

(১) জনসাধারণের সংগে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সুসংযত ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

(২) নানা প্রকারের মাধ্যম ও কর্মের ব্যবহার করা উচিত।

(৩) এই প্রচেষ্টা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলা উচিত এবং বস্তুমুখী সমাজ পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর একে গড়ে তোলা উচিত।

(৪) বিদ্যালয়ের সংগে সম্পর্কিত সকলের কাছেই এই প্রচেষ্টা পৌছান উচিত।

(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি অথবা নাগরিক সমিতি কিম্বা দুই-ই গঠন করা উচিত।

(৬) সামাজিক ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির সহযোগিতা করা উচিত।

(৭) প্রত্যেক শিক্ষকের সমস্ত দিকের আচরণ এমন হওয়া উচিত যে, সমাজের লোকরা বিদ্যালয়ের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠে। সমস্ত শিক্ষকেরই সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

(৮) বিদ্যালয়সমূহের আর্থিক পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গঠন করা উচিত। জনসাধারণের সংগে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করা উচিত।

(৯) বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্ত মৌলিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নাগরিক-দের অধিকার সম্বন্ধে বিদ্যালয়কে বিশেষ অবহিত হতে হবে।

(১০) সামাজিক আদর্শগুলিকে বিদ্যালয় তার কর্মধারায় রূপদান করবে।

(১১) শিক্ষার্থীদের উত্তম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উপর বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য, কেননা এই কার্যের মধ্য দিয়েই সমাজের সংগে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজের কর্তব্যসমূহ

বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পর্ক পারস্পরিক। সুতরাং এই সম্পর্কের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়েরও যেমন অনেক কিছু করণীয় আছে, তেমনি সমাজেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। এই বিষয়ে সমাজের কর্তব্যসমূহের কিছুটা আভাস নিম্নে দেওয়া হল।

(১) সমাজ যখন চায় যে তার নবজাতকেরা সৎ নাগরিক ভাবে গড়ে উঠুক, তখন শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ব্যক্তিগত ও দলগত সুযোগ সমাজের দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজকে শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(২) বিদ্যালয়ের মৌলিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সমাজকে অবহিত হতে হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকদের সংগে যোগ্য নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরেও প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়বহির্ভূত নানা প্রকারের শিক্ষামূলক মাধ্যমের সাহায্যে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র, সাময়িক সাহিত্য, রেডিও, টেলিভিসন, মিউজিয়াম, শিল্পপ্রদর্শনী, পুস্তকালয়, সংগীত ও নাটক কেন্দ্র, পরিবার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক, নাগরিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের উল্লেখ করা যায়।

(৪) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিসমূহ নির্বাচনের পর সমাজের উচিত শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া এবং সমাজের সমস্ত সংস্থার উচিত বিদ্যালয়ের সংগে শিশুর শিক্ষাব্যাপারে সর্বাংশে সহযোগিতা করা।

(৫) রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজসেবকদের উচিত বিদ্যালয়কে জীবনের গবেষণাগারে পরিণত করতে যথাসম্ভব সাহায্য করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের নূতন তত্ত্ব ও নীতি নির্ধারণে বিদ্যালয়কে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

বিদ্যালয় সমাজের প্রকৃতি

(ক) শিক্ষাতাত্ত্বিক পার্শি নানের মত

পার্শি নান্ বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের হওয়া উচিত একটি আংশিকভাবে স্বাভাবিক এবং আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ। এটি আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ হবে এইজন্য যে, এখানের সামাজিক জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত। বাইরের সমাজের জটিলতা ও দোষত্রুটির স্থান এখানে থাকবে না। এখানে বাইরের বৃহত্তর সমাজের শুধু 'শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবন্ত' বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হবে। অন্যদিকে বিদ্যালয় আংশিকভাবে একটি স্বাভাবিক সমাজ হবে এই কারণে যে, বাইরের সমাজ-জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে ফুটে উঠবে। ফলে বিদ্যালয়ের রূপ দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

(১) বিদ্যালয়ের সমস্ত সভ্য, শিক্ষক ও ছাত্র এখানের জীবনে 'পরিপূর্ণভাবে এবং প্রাণবন্তভাবে' অংশগ্রহণ করবে।

(২) এখানের আচার-ব্যবহার 'সার্বিক নিয়ম ও আদর্শাবলীর' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতি ও আদর্শের প্রচলন এখানে থাকবে না।

(৩) বাইরের জীবনের কাম্য বস্তুগুলি (interests) এখানের জীবনকে প্রভাবিত করবে।

(খ) সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকআইভারের মত

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকআইভারের (McIver) মতে বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক সমিতি (association)। এই সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত রীতি-নীতি (institutions) থাকে। এই রীতি-নীতির মধ্যে কতকগুলি হল সাধারণ, যেগুলিকে বহুপ্রকারের সমিতির সম্পর্কেই দেখা যায়। আবার কতকগুলির হল বিশেষ প্রকারের। যেগুলিকে শুধু বিদ্যালয়ের সম্পর্কেই দেখা যায়। এই বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতিগুলির স্বরূপ নির্ভর করে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসমূহের উপর। বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতির উদাহরণস্বরূপ পাঠাদান, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরিচালনা ইত্যাদির উল্লেখ করা

যায় এবং তাঁর উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে আত্মবিকাশ, জ্ঞানার্জন, পেশাগত প্রস্তুতি ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। তবে-ম্যাকআইভার-প্রদত্ত সমাজের (society) সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করা যায়, কেননা তিনি বলেছেন যে, সমাজ বলতে বোঝায় বহুপ্রকারের সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা বোনা একটি জাল বিশেষকে। সামাজিক সম্পর্ক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের মধ্যকার সেই সম্পর্ককে যেখানে একের উপস্থিতি অপরের মনের উপর রেখাপাত ক'রে তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

(গ) শিক্ষাসমাজতাত্ত্বিক অট্টাওয়ের মত

ইংলণ্ডের শিক্ষাসমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক অট্টাওয়ের (Ottaway) মতে বিদ্যালয় হল 'কম্যুনিটি' (community) জাতীয় সমাজ, পূর্ণাংগ সমাজ নয়। তাঁর মতে পূর্ণাংগ সমাজ বলতে বোঝায় সেই মানবগোষ্ঠীকে যার সভ্যেরা কোন বিশেষ ভূভাগে বাস করে, যাদের জীবনধারণের পদ্ধতি হল একই প্রকারের, যারা সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন এবং যারা একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর দ্বারা যুক্ত। অট্টাওয়ের মতে কম্যুনিটি জাতীয় সমাজে বয়স্করা ও শিশুরা উভয়ই সভ্য হতে পারে কিন্তু সভ্যরা সকলে ঐ সমাজের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। যেহেতু বিদ্যালয়সমাজে বয়স্ক ও শিশু দুই দলই থাকে এবং যেহেতু শিশুরা সেই সমাজের লক্ষ্য, সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন থাকে না, সেই হেতু ঐ সমাজকে অট্টাওয়ে কম্যুনিটি জাতীয় সমাজ বলে অভিহিত করেছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক অট্টাওয়ে তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যবিষয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক কলিংগউডের (Collingwood) সংশ্লিষ্ট মতের উপর নির্ভর করেছেন এবং অধ্যাপক ম্যাকআইভারের কম্যুনিটি জাতীয় সমাজের ধারণার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট ধারণার কোন মিল নেই। ম্যাকআইভারের মতে কম্যুনিটি বলতে বোঝায় সেই জনসমষ্টিকে যার সভ্যেরা একই ভূভাগে বাস করে এবং একই রসের (sentiment) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রসকে কম্যুনিটি-রস আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যকার প্রধান তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হল একত্ববোধ (we-feeling), স্থানবোধ (sense of place or station), ও নির্ভরতাবোধ (dependency feeling)। এই জাতীয় সমাজের আর একটি

প্রধান লক্ষণ হল এই যে, এর সভ্যরা তাদের সমগ্র জীবনই এর মধ্যে অতিবাহিত করতে পারে। স্পষ্টতঃ এই অর্থে বিদ্যালয় কম্যুনিটি জাতীয় সমাজ নয়। কেননা বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থপিন করতে পারে না, অর্থাৎ তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে না।

সিদ্ধান্ত

অধ্যাপক ম্যাকআইভারের মতকে অনুসরণ করে বিদ্যালয়কে এক প্রকারের সমিতি বলে মনে করাই ঠিক। তবে বিদ্যালয়ের সংগে সাধারণ সমিতিগুলির কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সমিতিগুলির উদ্দেশ্য থাকে মাত্র কয়েকটি। কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল বহু। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়-গুলি সমিতির সংজ্ঞা ছাড়িয়ে প্রায় কম্যুনিটির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়, কেননা শিক্ষার্থীদের জীবনের এক বৃহৎ অংশ এই প্রকার বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয়কে অনেকটা যৌক্তিকতার সংগেই সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করা যায়, কেননা এখানের জীবনে বহু প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পার্শি নানের উপরোক্ত মতের মধ্যে সত্যতা এইখানে রয়েছে যে, বিদ্যালয়ের জীবন হল সত্যই আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং আংশিকভাবে স্বাভাবিক এবং বিদ্যালয়ের জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাবিকতা থাকা উচিতও। জন ডিউই-র মত মূলতঃ নানের মতেরই অনুরূপ। সুতরাং তার সত্যতাও একই প্রকারের। তবে উভয়ের মতের সম্পর্কেই একটি প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটি হল এই যে, শিক্ষার্থীদের যদি বাইরের জীবনের পুঞ্জীভূত কলুষ ও কদর্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকে তাহলে তারা জীবনযুদ্ধে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হবে কিনা। উত্তরে বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ এই নয় যে সামাজিক কলুষ ও কদর্যতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের কোন ধারণা দেওয়া হবে না। বিদ্যালয়ের জীবনে কলুষ ও মালিন্য কোনপ্রকারে প্রবেশ না করে তা নিশ্চয়ই দেখতে হবে, তবে সামাজিক অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে শিশুদের সম্যক্‌ভাবে অবহিত করেও তুলতে হবে।

জন ডিউইর মত

উপরে জন ডিউইর মতের কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে তাঁর সংশ্লিষ্ট মতের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

জন ডিউই বিদ্যালয়কে একটি 'ক্ষুদ্র সামাজিক দল' (miniature sccial group) রূপে কল্পনা করেছেন। এই সামাজিক জীবনে পাঠ ও বৃদ্ধি (growth) দলগত অভিজ্ঞতার ফলরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিদ্যালয়কে তিনি সর্বাংশে একটি সমাজরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, কেননা সামাজিক অনুভূতি (perception) ও অনুরাগ (interest) প্রকৃত সামাজিক মাধ্যমেই বিকাশলাভ করে। তবে এই দলের জীবন ও অভিজ্ঞতার ধারার সংগে বাইরের বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক জীবনধারার গভীর ও অন্তরংগ যোগ থাকা উচিত। অর্থাৎ বিদ্যালয়-সমাজের জীবনে বাইরের সমাজ-জীবনের সার্থক প্রতিফলন হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রতিফলন কখনও পূর্ণাংগ হতে পারে না, কেননা বাইরের সমাজ জীবন হল জটিল, মালিন্যযুক্ত, সামঞ্জস্যবিহীন ও অসংহত। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ে বাইরের সমাজ-জীবনকে সরলীকৃত, মালিন্যমুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংহত করে প্রতিফলিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর করবার উপায়

বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার অর্থই হল বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে গণতান্ত্রিক আদর্শে গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহকে অবলম্বন করলে বিশেষ ভাল ফল আশা করা যেতে পারে।

(১) বিদ্যালয়ের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও নির্ধারিত লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সচেতন ও শ্রদ্ধাবান করে তোলা।

(২) নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মধ্যে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যানুযায়ী ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্বাংগীণ বিকাশের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা করা।

(৩) শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যৌথ ও ব্যক্তিগত কর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা করা।

(৪) শাসন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যবহার পরিত্যাগ করে প্রেম ও সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

(৫) বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(৬) শ্রেণীকক্ষের বাইরে বহুপ্রকারের ক্রীড়ার ও সংস্কৃতিমূলক কর্মের ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, এখানেও দলগত ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের সমন্বয়-সাধন প্রয়োজন।

(৭) ছাত্রদের জন্য নানাপ্রকারের আত্মশাসনমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

(৮) বিদ্যালয়ের কর্মাবলীতে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দলগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(৯) অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(১০) দলগত স্মৃতির (group memory) বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য পুনর্মিলন উৎসব ও পুরাতন ছাত্রদের সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা। বলা নিষ্প্রয়োজন, দলগত স্মৃতির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি দলের সংহতি বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

(১১) ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিরোধকে বিদ্যালয়ের জীবনে কুপ্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া।

(১২) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের সংগে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবসমূহে সাগ্রহে যোগদানের ব্যবস্থা করা।

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে মিল ও অমিল

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয় হল সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিদ্যালয় সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে এবং বৃহত্তর সমাজের সংগে তার মিল ও অমিলের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখানে বৃহত্তর সমাজের সংগে বিদ্যালয়-সমাজের মিল ও অমিল আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

(ক) বিদ্যালয়-সমাজের সংগে বৃহত্তর সমাজের মিল

(১) সমাজে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে বাস করে। বিদ্যালয়েরও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(২) সমাজের মত বিদ্যালয়েরও একটি বিশেষ এলাকা থাকে।

(৩) সমাজের সভ্যদের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও নানাপ্রকারের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

(৪) সমাজের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও একটা মানসিক ঐক্যবোধ থাকে।

(৫) সমাজের জীবনে একটা ধারাবাহিকতা থাকে এবং তার সঞ্চিত ঐতিহ্য থাকে। বিদ্যালয়েরও এই বৈশিষ্ট্য থাকে।

(৬) প্রত্যেক সমাজের সংগে অন্য সমাজের যোগাযোগ থাকে। তেমনি এক বিদ্যালয়-সমাজের সংগে অন্য বিদ্যালয়-সমাজের ও বাইরের বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ থাকে।

(৭) বিদ্যালয়-সমাজের সংগে অন্য বিদ্যালয়-সমাজের একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকে। এখানেও বিদ্যালয়-সমাজ বাইরের বৃহত্তর সমাজের মত।

(৮) সমাজের সভ্যদের মধ্যে ঐক্যও থাকে অনৈক্যও থাকে। তবে ঐক্যই প্রধান। বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

(৯) সমাজে নবীন-প্রবীণের ও পরিচালক-পরিচালিতের সম্পর্ক বর্তমান থাকে। বিদ্যালয়েও এই সম্পর্কসমূহ বর্তমান।

(১০) সমাজ-পরিচালনা ও শৃঙ্খলাবিধানের ভার সমাজে এক বিশেষ দলের উপর ন্যস্ত থাকে। বিদ্যালয়েও ঐরূপ ঘটে।

(১১) সমাজ-জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। বিদ্যালয় জীবনও ঐরূপ পরিবর্তনশীল।

(খ) বৃহত্তর সমাজের সংগে বিদ্যালয় সমাজের অমিল

(১) সমাজের সভ্যদের সংখ্যা ও তাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য বিদ্যালয়ের সভ্যদের তুলনায় অনেক বেশী।

(২) সমাজে স্বার্থ সংঘাতের অবকাশ বিদ্যালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী।

(৩) বিদ্যালয়ের তুলনায় সমাজের জীবনে ব্যাপকতর ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকে।

(৪) সমাজ-জীবনের ব্যাপ্তি বিদ্যালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী।

(৫) সমাজের আত্মনির্ভরশীলতা বিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী।

(৬) সমাজের বিচার ও শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা অধিকতর ব্যাপক।

(৭) সমাজের ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী।

(৮) সামাজিক সম্পর্কের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী।

(৯) সমাজের সাধারণ সভ্যদের অধিকতর অধিকার থাকে।

(১০) এখনও সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাপ্তি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার চেয়ে অনেক কম।

(১১) বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই অপরিণত, কিন্তু সমাজের বেলায় তা নয়।

শিক্ষক ও শিক্ষা

শ্রেণীবিভক্ত কর্তৃত্বপীড়িত গণতন্ত্রপূর্ব সমস্ত প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থার অন্যান্য অনেক প্রকার দ্বন্দ্বের মত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যালয়ের আদর্শ হল বৃহত্তর সমাজের আদর্শ। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ে বাইরের সমাজের মানবীয় সম্পর্কের প্রতিফলন হয়। বাইরের সমাজে মানব ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা না থাকলে বিদ্যালয়েও ঐগুলির অভাব হয়। গণতন্ত্রপূর্ব সমাজব্যবস্থাগুলিতে সাধারণ মানবের প্রতি কোন প্রকারের শ্রদ্ধার অস্তিত্ব ছিল না। তাই বিদ্যালয়েও সাধারণ মানুষের ছেলেদের প্রতি কোন প্রকারের শ্রদ্ধা প্রকাশের স্থান ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম কথা হল মানব-ব্যক্তিত্বের সৃজনীশক্তির উপর সীমাহীন বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা যখন বিদ্যালয় সম্পর্কিত চিন্তা প্রভাবিত হল, তখন দেখা গেল যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পুরাতন দ্বন্দ্ব হল পুরাতন সমাজেরই মত অর্থহীন এবং ক্ষতিকর। গণতান্ত্রিক সমাজের মত সুস্থ মানবিক ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হল মধুর, প্রীতপূর্ণ ও সহযোগিতাভিত্তিক। পরিণত অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে শিক্ষক বিকাশোন্মুখ শিক্ষার্থীদের হলেন 'বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক'।

অনেকের ধারণা নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্ম অনেক কমে যাবে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। বস্তুতঃ নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে যাবে এবং তাঁর কর্মধারার রূপান্তর ঘটলেও তার বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যাবে এবং অনেক বেশী প্রকারের গুণেরও প্রয়োজন হবে তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য। নিম্নে নূতন শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

নূতন শিক্ষকের কর্মাবলী

নূতন যুগের শিক্ষকের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মের কিছুটা আভাস নিম্নে দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

(১) আধুনিক শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষাদান করা নয়, শিখন পরিচালনা করা।

(২) আধুনিক শিক্ষকের কাজ শুধু বৌদ্ধিক শিখনে সহায়তা করা নয়, শিশুর সর্ববিধ শিখনে সহায়তা করা।

(৩) শিক্ষকের দক্ষ পরিচালনার জন্য শিক্ষককে অতীব নৈপুণ্যের সংগে শিক্ষার্থীর পরিবেশকে পরিচালিত করতে হবে।

(৪) শিক্ষার্থীর পরিবেশের যোগ্য পরিচালনার জন্য সেই পরিবেশ সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ করতে হবে।

(৫) পরিবেশ পরিচালনাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর আচরণ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে।

(৬) পরিবেশ পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবিত করবার জন্য যোগ্য পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে হবে।

(৭) শিক্ষার্থীর বহুমুখী শিখন ঠিক পথে ঠিক মত চলছে কিনা তার পরিমাপ করতে হবে।

(৮) শিখনে ত্রুটি ঘটলে সংশোধনমূলক শিখনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে যথাযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সমস্ত প্রকারের শিখনকে সংহত করতে হবে।

(১০) প্রয়োজন হলে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করতে হবে, তাদের শিক্ষাদানকর্মের মধ্যে ফাঁক থাকলে তা পূরণ করতে হবে এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) শিক্ষার্থীর সর্বপ্রকারের শিখন যাতে গণতান্ত্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হয়ে উঠে তা সর্বদাই লক্ষ্য করতে হবে।

(১২) শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ যাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে।

(১৩) শিশুর শিখন ও বিকাশ সার্থক করে তোলবার জন্য শিক্ষককে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে এবং নিজের বুদ্ধি ও বিকাশকে সার্থক করে তুলতে হবে, কারণ নিজের ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ না হলে অপরের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা যায় না।

সুশিক্ষকের গুণবলী

আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের বহুমুখী দায়িত্বের সংগে আমরা

কিছুটা পরিচিত হলাম। এই দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে হলে শিক্ষকের যে সব গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল। প্রথমে বলা প্রয়োজন, যে কোন শিক্ষাব্যবস্থাতেই শিক্ষকের ভূমিকা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য সর্বদিক থেকে নির্ভর করে যোগ্য শিক্ষকের উপর। বর্তমানে শিক্ষাজগতের কেন্দ্রে শিশুকে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও, যেহেতু শিক্ষককেই সেই জগৎটিকে পরিচালিত করতে হয়, সেইহেতু তাঁর প্রয়োজনীয়তা এখনও অসীম। শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং অতি আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও সুরু হয়েছে। সেই সমস্ত আলোচনা ও গবেষণার ফলের উপর নির্ভর করে নিম্নের গুণগুলির উল্লেখ করা হল ঃ

(১) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা

শিক্ষকের প্রধান প্রধান দায়িত্বের তালিকার সংগে আমরা পরিচিত হয়েছি। সহজেই অনুমেয় যে, ঐ সব দায়িত্ব পালন করতে গেলে শিক্ষককে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন এবং পরিচ্ছন্নতা অমনিও চিত্তাকর্ষক তাই তার প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর।

(২) আকৃতি

শিক্ষককে সুদর্শন না হলেও কুদর্শন হলে চলবে না। কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ শিক্ষকের শিক্ষণ শুধু আকৃতির জন্যই অনেকটা ব্যাহত হবে।

(৩) বিদ্যা

(ক) শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষা ব্যাপক ও গভীর হওয়া উচিত, কেননা মানুষ গঠনের কাজে প্রধান প্রধান বিদ্যাসমূহের সংগে গভীর পরিচিতির প্রয়োজন।

(খ) যে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন সেই সব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(গ) আচরণকারী প্রাণী হিসাবে মানবাচরণের, বিশেষ করে শিশুর আচরণের সংগে তার গভীর পরিচয় প্রয়োজন।

(ঘ) শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন এবং লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন।

(৪) বুদ্ধি

শিক্ষকের বিদ্যার পরিধির সংগে পরিচিত হওয়ার পরে সহজেই বোধ্য যে, শিক্ষকের বুদ্ধি অসাধারণ না হলেও সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া দরকার।

(৫) স্বাধীন ও সৃজনমূলক চিন্তা

সৃজনমূলক চিন্তার শক্তি শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন, কেননা তা না হলে আজকের পরিবর্তনশীল জগতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

(৬) সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতা

স্থির-ধীর বিচার-ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন আছে শিক্ষকের, কেননা অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে।

(৭) **দায়িত্বশীলতা**—শিক্ষকের পক্ষে দায়িত্বশীলতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাজ করবার পূর্বে তার পরিণতি সম্বন্ধে ভাবতে হবে এবং কর্মের ফলকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। আশানুরূপ ফল না হলে কর্মের ধারাকে পরিবর্তিত করতে হবে।

(৮) **উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন**—আজকের গণতান্ত্রিক নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন উদারভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। সেই রকম নাগরিক তৈরী করার দায়িত্ব রয়েছে বলে শিক্ষকেরও দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন উদার হওয়া প্রয়োজন।

(৯) **ধৈর্য ও প্রক্ষোভগত সাম্য**—ঝড়ের নৌকার মত শিক্ষককে সর্বদা প্রক্ষোভের বাত্যাতাড়িত হলে চলবে না। তাকে ধীর, স্থির ও সংযত হতে হবে। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল অবস্থায় তাঁকে মনের হাল দৃঢ়হস্তে ধরতে হবে।

(১০) **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈর্ব্যক্তিকতা**—শিক্ষককে সংস্কার-বিহীন, পরীক্ষামুখী (experimental) ও নৈর্ব্যক্তিক মন নিয়ে সমস্ত বস্তুর বিচার করতে হবে।

(১১) **চিন্তা ও আচরণের নমনীয়তা ও প্রগতিশীলতা**—আজকের

পরিবর্তনশীল জগতে চিন্তা ও আচরণের কাঠিন্য অচল, পরিবর্তনশীল অবস্থার সম্মুখে মনের ও আচরণের নমনীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রগতির পথে অবিরত এগিয়ে যাবার জন্য নিজের চিন্তা ও আচরণকে সর্বদা প্রস্তুত করতে হবে।

(১২) **শিক্ষকতাকে অন্তরের সংগে গ্রহণ**—শিক্ষকের কাজকে অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ না করলে সার্থক শিক্ষক হওয়া কখনও সম্ভব নয়।

(১৩) **সহানুভূতি ও ভালবাসা**—শিক্ষককে ছাত্রদের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতিশীল মনোভাব ও আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। শিক্ষারূপ ষ্টীম-ইঞ্জিনের ষ্টীম হল প্রেম ও সহানুভূতি। প্রেম ও সহানুভূতি শিক্ষকের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। তবে এদের সংগে জ্ঞান ও সুঅভ্যাস যুক্ত হলেই সার্থক শিক্ষণ সম্ভব হয়।

(১৪) **গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা**—গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে যোগ্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা যায় না। আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিকতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায়।

(১৫) **সমাজ-জীবনের সংগে গভীর পরিচয়**—গণতান্ত্রিক শিক্ষায় চতুষ্পার্শের সমাজের সংগে নিবিড় পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের এই রকম পরিচয়লাভে সাহায্য করতে হলে সমাজের সংগে শিক্ষকের নিজের পরিচয় ও সম্পর্ক নিবিড় ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

(১৬) **ভদ্রতাবোধ ও পরিচ্ছন্ন আচার-ব্যবহার**—ছাত্র, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য লোকের সংগে শিক্ষককে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। ভদ্রতাবোধ ও শিষ্টাচার যদি তাঁর না জানা থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে নিজকর্মে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(১৭) **সুষম, মধুর ও সর্বাংগীণ বিকাশসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব**—উপরে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি থাকলেই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে সুষম, মধুর ও সর্বাংগীণ বিকাশসম্পন্ন। তবুও সুষম ও সর্বাংগীণ

বিকাশকে আদর্শ হিসাবে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, যাতে বৃদ্ধি কোন প্রকারে একপেশে হয়ে না পড়ে।

(১৮) **স্বপ্নদর্শন ও আশাবাদ**—শিক্ষককে কিছুটা স্বপ্নদ্রষ্টা হতে হবে, কেননা আজকের জীবনের অসম্পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত করতে হবে। এইরূপ স্বপ্নদর্শন অবশ্যই সম্ভব হবে না যদি না শিক্ষক আশাবাদী হন।

(১৯) **রসজ্ঞতা ও পরিমাণবোধ**—আনন্দ ও কৌতুকের বারিধারায় জীবনের পথ মালিন্যমুক্ত হয় এবং তাই তাতে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। পরিমাণবোধও সার্থক জীবনযাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(২০) **গণতান্ত্রিক নেতা ও সহযোগীর গুণাবলী**—শিক্ষক স্বভাবতঃই শিক্ষাক্ষেত্রের নেতা। সুতরাং নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী তাঁকে অর্জন করতে হবে। তার উপর ও অন্যান্য শিক্ষকের সংগে তাঁকে অনেক সময়ই যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। সুতরাং তাঁকে সহযোগিতাসম্পন্ন হতে হবে এবং যোগ্য সহযোগীর গুণাবলীও অর্জন করতে হবে।

———

মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর

দেহতত্ত্ববিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। কিন্তু ঐ সব স্তরের সংগে পরিচয়লাভের পূর্বে মানবের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে পরিচয়লাভ করা প্রয়োজন। নিম্নে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মানবের বিকাশের সাধারণ তত্ত্বসমূহ

(১) মানুষের বিকাশধারা হল অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমিক

মানুষের বিকাশধারায় কোন ছেদ পড়ে না, অব্যাহতভাবে তা চলতে থাকে। পরিবর্তন অবশ্য আসে, তা নাহলে বিকাশ কথাটির অর্থ হয় না, কিন্তু পরিবর্তন সংঘটিত হয় ক্রমিক ধারায়। সহসা কোন পরিবর্তন আসে না। যদিও কোন কোন সময়ে কোন কোন পরিবর্তনকে অতি ব্যাপক এবং সহসা উদ্ভূত বলে মনে হয়, তবুও কোন পরিবর্তনের উদ্ভব সহসা হয় না। ক্রমিক ধারায় ধীর গতিতে সংঘটিত পরিবর্তনের অদৃশ্য ফল সহসা দৃশ্য হয়ে উঠে এই মাত্র।

(২) বংশধারাগত বস্তুনিচয়ের সংগে পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সমস্ত প্রকারের বিকাশ সংঘটিত হয়।

বংশধারা থেকে মানুষ পায় বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক গুণের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাগুলির পরিবেশের অনুকূল প্রভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন গুণরূপে প্রকাশ পায়। কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যই শুধু বংশধারা বা শুধু পরিবেশের প্রভাবোদ্ভূত নয়। তবে কতকগুলি গুণের বিকাশে বংশধারার প্রভাব বেশী, কতকগুলির বেলায় পরিবেশের প্রভাব বেশী।

(৩) শিশুর অনেক রকমের 'বয়স' থাকে

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং এই দিকগুলির বিকাশের গতিবেগ বিভিন্ন। ফলে যে কোন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের বিভিন্ন 'বয়সের' উল্লেখ করা যায়, যেমন শরীরতত্ত্বঘটিত 'বয়স', প্রক্ষোভঘটিত 'বয়স', সামাজিক বৃদ্ধিঘটিত 'বয়স', নৈতিক বা ধর্মীয় 'বয়স' ইত্যাদি।

(৪) মানুষের দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের গতিবেগ বিভিন্ন হলেও সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ ঘটে এক সংগে, একের পর এক নয়।

পূর্বে রুশোর মত অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করতেন যে, মানবাচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয় পর পর, এক সংগে নয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই মত সমর্থন করে না। তাঁদের মতে মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ এক সঙ্গে ঘটে, যদিও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের গতিবেগ হয় বিভিন্ন এবং তাই বিভিন্ন সময়ে সেগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(৫) বিকাশের গতিবেগ প্রথম দিকেই হয় সর্বাপেক্ষা অধিক

শৈশবে দেহ ও মনের বিকাশ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে ঘটে। অবশ্য মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপের পথে গাণিতিক বাধা আছে। কিন্তু পরিসংখ্যানবিজ্ঞানীরা সেই বাধাগুলির অপসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় ঐ পরিমাপ বর্তমানে অনেকাংশে সফল হয়েছে। বলা বাহুল্য, গাণিতিক পরিমাপের সাহায্যেই বিকাশের গতিবেগ নির্ধারিত হয়।

(৬) এক একটি বর্গের (species) মধ্যে বিকাশের ছক (pattern) একই প্রকারের

আর্ণল্ড গেসেল (Arnold Gesell) এই তত্ত্বটির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর মতে এক একটি বর্গের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিকাশোদ্ভূত বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব নির্দিষ্ট ক্রমিক ধারায় হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ঘটে বংশধারার প্রভাবের ফলে। এইরূপ ক্রমিক বিকাশের ফলে বিকাশের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা সহজ হয়ে পড়ে।

(৭) শৈশব থেকে পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের বৃদ্ধির গতি প্রায় একই প্রকারের হয়

জন্মের সময় বংশধারার প্রভাবের জন্য ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং বৈষম্যের আপেক্ষিক পরিমাপ (relative magnitude) বিকাশের ধারাপথে একই প্রকারের থাকে। অর্থাৎ জন্মের সময় বংশধারার প্রভাবে যে ব্যক্তিবৈষম্য দৃষ্ট হয় তা বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে অন্তর্হিত হয় না, বরং তার ধারা ও আপেক্ষিক গতি বরাবরই অব্যাহত থাকে। যেমন একটি ছেলেকে যদি অতি

অল্প বয়সে বুদ্ধিমান বলে মনে হয় তাহলে খুবই সম্ভাবনা থাকে যে, সে পরবর্তী জীবনেও বুদ্ধিমানরূপে প্রতিভাত হবে।

(৮) বিকাশের ধারায় সংহতিকরণ (integration) ও পৃথকীকরণ (differentiation) এই দুটি প্রক্রিয়াই দৃষ্ট হয়।

বিকাশের ধারা সাধারণ আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ মানবাচরণের বিবর্তনে প্রথমে প্রকাশিত হয় ব্যাপক ধরণের আচরণ এবং তারপর দেখা দেয় বিশেষ প্রকারের আচরণ। সাধারণ আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের এই প্রকাশকে মনস্তত্ত্বে ও জীববিদ্যায় বলা হয়ে থাকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া।

বিকাশের ধারার দ্বিতীয় স্তরে বিশেষ প্রকারের আচরণের আবির্ভাব হলেও উদ্ভবের পরে ঐ আচরণগুলি সংহত হয়ে ব্যাপক ধরণের আচরণের জন্ম দেয়। বিচ্ছিন্ন আচরণগুলির এই সংহতিকে বলা হয় সংহতিকরণ প্রক্রিয়া।

(৯) শিক্ষার প্রভাব পরিণমনের স্তরের উপর নির্ভর করে

শিক্ষাদানকার্যের সফলতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ বিকাশের উপর। সাধারণ প্রকারের পরিবেশগত অবস্থাসমূহের মধ্যে যে বৃদ্ধি ও বিকাশ আশা করা যায় তাকেই মনস্তত্ত্বে আভ্যন্তরীণ বিকাশ বা পরিণমন প্রক্রিয়া (maturation) বলে অভিহিত করা হয়। বংশধারাগত বস্তুনিচয়ের উপর পরিবেশের প্রভাবের ফলে যে বিকাশ সংঘটিত হয়েছে তারই উপর যে বর্তমানের শিক্ষাকার্যের সফলতা নির্ভর করে এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়।

মানবের বিকাশের বিভিন্ন স্তর

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মানুষের বিকাশধারা হল ক্রমিক ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিকাশধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যেও পৃথক পৃথক স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরগুলির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করেই স্তরভাগ বিভাগ সম্ভব হয়। মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব অবশ্য সর্বস্তরেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেগুলির সংগে বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও উপস্থিত থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও স্তরগুলির উদ্ভব সহসা হয় না,

স্তরগুলির মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং একের উদ্ভব বা পরিণতি অপরের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও মনোবিজ্ঞানীরা স্তরগুলির আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে একমত নন, এমনকি সেগুলির সংখ্যা সম্বন্ধেও একমত নন। এর কারণ বিকাশধারার ধারা-বাহিকতা। স্তরগুলির উদ্ভব হয় অলক্ষিতে—অতি ধীরে—এবং রূপান্তর হয় অলক্ষিতে—অতি ধীরে। সুতরাং একের দ্বারা টানাবিভেদের ছেদ রেখা অপরের ছেদ রেখার সংগে একস্থানে অনেক সময় পড়ে না। যাইহোক বহুকাল থেকেই মানুষ জীবনধারাকে সাতটি স্তরে (seven ages) বিভক্ত করেছে এবং বেশীর ভাগ মনস্তাত্ত্বিক সেই বিভাগকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পরেও সমর্থন করায় আমরাও মানুষের বিকাশধারাকে সাতটি পর্যায়ে ভাগ করলাম। সেই সাতটি ভাগ হল: শৈশব, বাল্যকাল, যৌবন, পরিণত অবস্থা, মধ্য বয়স, বার্দ্ধক্যের সুরু ও পূর্ণ বার্দ্ধক্য। এই স্তরগুলির মধ্যে প্রথম তিনটির সংগেই আমাদের সম্পর্ক খুব নিবিড়, তাই নিম্নে সেগুলিরই বিশদ আলোচনা করা হল।

(ক) **শৈশব (Infancy)**

প্রথম পাঁচ বছরকে সাধারণতঃ শৈশবকাল বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়ের উপর মনোবিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে থাকেন। বিশেষ করে ফ্রয়েড্ (Freud) ও এ্যাড্লারের (Adler) শিষ্যরা এই সময়ের উপর সীমাহীন গুরুত্ব দান করেন। ফ্রয়েড্ বলেছেন: চার কি পাঁচ বছরের সময়ে ছোট মানবটি প্রায়ই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং এ্যাড্লার বলেছেন: জন্মের কয়েক মাস পরেই নির্ধারণ করা যায় জীবনের সংগে শিশুর সম্পর্ক কেমন দাঁড়াবে। ফ্রয়েড্ ও এ্যাড্লারের অত্যুগ্র মতবাদের সংগে একমত না হয়েও শৈশবকালের অত্যধিক গুরুত্ব স্বীকার করতে কোন যুক্তিমান ব্যক্তির (ও বৈজ্ঞানিকের) বাধা থাকতে পারে না। তাই শৈশবের প্রতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ঐরূপ মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথম পাঁচ বছরকে মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ দুটি ছোট স্তরে বিভক্ত করে থাকেন। তাঁরা প্রথম দুবছরকে নিয়ে একটি স্তর নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তী তিন বছরকে নিয়ে অন্য একটি স্তর নিরূপণ করেন। নিম্নে এই স্তর দুইটি সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতাবলীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল:

(১) প্রথম দুই বৎসরের বৈশিষ্ট্যাবলী

(ক) অংগ-সঞ্চালন ও গতি

প্রথম বছরে শিশুর অংগ-সঞ্চালন ব্যাপারে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। পূর্ণ অসহায় একটি হাড় ও মাংসের ক্ষুদ্র কাঠামো অদ্ভুত দ্রুততার সংগে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। ফলে বাপ-মা ও আত্মীয়-পরিজনদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই বৃদ্ধি দ্বিতীয় বৎসরেও প্রায় অব্যাহত থাকে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই পর্যায়ের আচরণিক পরিবর্তন প্রথম বৎসরের মত অত ব্যাপক এবং বিস্ময়কর হয় না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহে উদ্দেশ্যপূর্ণ সমস্ত ইতিবাচক অংগ-সঞ্চালন খাদ্যগ্রহণের সম্পর্কেই ঘটে থাকে। পরে ধীরে ধীরে খাদ্য ভিন্ন ব্যাপারেও অংগ-সঞ্চালনের প্রসার ঘটে। এই সময়ে আত্মরক্ষামূলক নেতিবাচক অংগ-সঞ্চালনও খুব বেশী দেখা যায়। জন্মের প্রথম মাসে শিশু তার পরিবেশকে জানবার খুব চেষ্টা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে ঘুমোতে ও খেতে। কিন্তু পরিবেশের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টার ক্ষীণাভাস এই সময়েও বিজ্ঞ দর্শকের চোখে পড়ে। পায়ের ও হাতের আঙ্গুলের সঞ্চালন এই সময়েই সুরু হয় এবং তার মধ্য দিয়েই পরবর্তী কালের ব্যাপকতর ও পূর্ণতর প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পাঁচমাস পর্যন্ত শিশুর দেখার সংগে অনুভূতির সমন্বয় ঘটে না। পাঁচমাস বয়স থেকেই শিশু বোধ করতে শেখে যে, একই বস্তু হল শাদা ও শক্ত কিম্বা কাল ও নরম ইত্যাদি। এই সময়েই শিশু বোধ করতে শেখে যে কতকগুলি জিনিস হল খস্‌খসে বা মসৃণ, শুক্‌নো বা ভিজে ; শক্ত বা নরম এবং গরম বা ঠাণ্ডা।

এই পর্যায়ে শিশুর আচরণে প্রতিবর্তী কর্মের (reflex activity) প্রকাশ দৃষ্ট হয়। এই কর্মের কিছু প্রকাশ হয় ইতিবাচক এবং কিছু হয় নেতিবাচক। ইতিবাচক কর্মের উদাহরণস্বরূপ ধরা, স্তন্যপান, গলাধঃকরণ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় এবং নেতিবাচক কর্মের উদাহরণস্বরূপ চোখের পাতা বোজান, হাঁচি, কাশা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এই কর্মগুলির উদ্দেশ্য হল কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যোগ্য আচরণের ব্যবস্থা করা।

সুস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃহৎ পেশীগুলির বৃদ্ধি হয় এবং তার আচরণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ও জটিলতর হতে থাকে।

সাধারণতঃ গতি ও অংগ-সঞ্চালনের বিকাশের ধারায় নিম্নমত আচরণাবলী দেখা যায় ঃ

(১) একমাস বয়সে মাঝে মাঝে শিশু মাথা তোলে।

(২) দুমাস বয়সে উপুড় হয়ে শুলে হাত ও পা কিছুটা নাড়তে পারে।

(৩) তিনমাস বয়সে সে স্থিরভাবে মাথা উঁচু ও সোজা করে রাখতে পারে।

(৪) পাঁচ মাস বয়সে অল্প সাহায্য পেলে সে বসতে পারে।

(৫) ছমাস বয়সে অল্প সময়ের জন্য সে একলা বসতে পারে।

(৬) সাত মাসে সে উপুড় হতে পারে।

(৭) নয় মাস বয়সে সে হামাগুড়ি দেওয়া আরম্ভ করে।

(৮) দশমাস বয়সে সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

(৯) তেরমাস বয়সে সে কয়েক পা হাঁটতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের আচরণাবলী সাধারণতঃ দেখা গেলেও ব্যক্তিগত বৈষম্যও প্রচুর দেখা যায় এবং ছোট-খাট আচরণিক পশ্চাদগমনের চিহ্ন পরবর্তী কালের দ্রুততর বৃদ্ধির জন্য পরে প্রায়ই দেখা যায় না। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশুর বিকাশে পরিবেশের প্রভাবের ফল সুদূরপ্রসারী হলেও সাধারণ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় মুলতঃ আভ্যন্তরীণ পরিণতির ফলেই শিশু হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি আচরণ আয়ত্ত করে।

(খ) প্রত্যক্ষণের বিকাশ

সুস্থ শিশুর পক্ষে পাঁচ মাস বয়স হল খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের পর্যায়। এই সময়ে শিশু একপ্রকারের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংগে অন্য প্রকারের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে যুক্ত করতে শেখে এবং তার বোঝার ক্ষমতাও অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। এই বয়সের শিশু চারপাশের বস্তুসমূহকে জানবার কাজে মুখবিবরের ব্যবহার খুব বেশী করে। বৃদ্ধির সংগে সংগে অবশ্য মুখের ব্যবহার ত্যাগ করে সে দর্শন ও স্পর্শনের উপর বেশী নির্ভর করে। প্রথম বছরের শেষের দিকে শিশু জিনিসপত্র অনেক বেশী ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে এবং বস্তুনিচয়কে ধরবার প্রচেষ্টাও তার হয়ে উঠে অনেক সঠিক।

(গ) বাক্‌শক্তির বিকাশ

শিশুর শ্বাসযন্ত্র বেশ পরিণতই হয় এবং প্রথম থেকেই তার ব্যবহার সে

জানে। প্রথম দিকে সে কান্নার খুব বেশী ব্যবহার করে। এই কান্নার সাহায্যেই সে পরিবেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার প্রতি অন্যান্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কান্না ও সাধারণ বাক্‌শক্তির ব্যবহার কিন্তু এক বস্তু নয়। শিশু যখন দেখে যে, সে নানাপ্রকারের শব্দ উৎপন্ন করতে পারে, তখন সে শব্দ নিয়ে খেলা করে। চারপাশের লোকেদের নানাপ্রকারের শব্দ ব্যবহার দেখেও সে তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এক বছর বয়সের সময়ে সে একটা-দুটো অর্থপূর্ণ শব্দ সুস্পষ্টভাবে বলতে শেখে, কিন্তু তখন সে বোঝে অনেক কথাই। স্বরবর্ণ ও ওষ্ঠ্যবর্ণ উচ্চারণ করা সর্বাপেক্ষা সহজ এবং কণ্ঠ্যবর্ণ ও সংযুক্ত দ্বিস্বর (diphthong) উচ্চারণ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন। অনেক চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে সে ইচ্ছামত শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। তাই দ্বিতীয় বছরেই শিশু কথা শেখার কার্যে উদ্যোগী হয়ে উঠে।

শিশু তার নিজের তৈরী আওয়াজে খুব আনন্দ পায়। কিন্তু উচ্চ শব্দ, বিশেষ করে অপরিচিত শব্দের দ্বারা সে বেশী বিচলিত হয়। তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ অপেক্ষা শিশু মৃদু ও শান্ত আওয়াজ পছন্দ করে। সংগীত ও শব্দের শ্রুতিমধুর প্রবাহ শিশুকে খুব আনন্দ দেয়। সে গতি ভালবাসে এবং তাই গতিশীল বস্তুসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

(ঘ) বৌদ্ধিক বিকাশ

বাক্‌শক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধিক বিকাশের অন্য অনেক প্রকারের লক্ষণও দেখা যায়।

শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুই প্রকারের অনুভূতিই বোধ করে। প্রথম বছরে শিশুকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষিত বস্তু (percept) ও ভাব (concept) সৃষ্টি করতে অগ্রসর হতে দেখা যায়। সহজ রকমের সামান্যীকরণও (generalisation) এই সময়ে তার দ্বারা সম্ভব হয়। ক্রমে সে খাবার পাত্র দেখে খাবার কথা মনে করতে পারে, কলের জল দেখে স্নানের কথা স্মরণ করে এবং আরও অমনি অনেক কিছুই করতে পারে। অর্থাৎ একপ্রকারের অনুষংগমূলক (associative) চিন্তন তখন তার দ্বারা সম্ভব হয় এবং এই চিন্তনের মধ্যে স্মৃতি, পরিচিতি ও পূর্বচিন্তা (forethought) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা

যায়। শীঘ্রই সে নিজের কতকগুলি সমস্যা সমাধানেও সমর্থ হয়, যেমন, জুতো টেনে খুলে ফেলা, মুখে খাবার বস্তু তোলা ইত্যাদি। গেস্টাল্টবাদীদের (Gestalt Psychologists) শিম্পাঞ্জীর মত সমস্যা সমাধানে শিশু নানা প্রকারের উপকরণ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে।

(ঙ) প্রক্ষোভগত বিকাশ

ছোট শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন খুবই সক্রিয়। তার অনুভূতিগুলি হল অত্যন্ত তীব্র, পরিবর্তনশীল এবং প্রায়ই অনিয়ন্ত্রিত। এই সময়ে পরিত্যক্ত, ক্ষুধার্ত, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ করা হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক অবস্থা। শৈশবের বঞ্চিত ভাব পরবর্তী জীবনের উপর গভীর রেখাপাত করতে পারে।

মা-বাপের কাছ থেকে এই সময়ে শিশুদের বেশীক্ষণ বা বেশী দিন দূরে থাকা উচিত নয়। শিশুদের অনিদ্রা, এমনকি স্নায়বিক দৌর্বল্যও, এর ফলে দেখা দিতে পারে। ভয় হল শৈশবের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অনুভূতি। মা-বাপের প্রধান কর্তব্য হল শিশুদের ভয়বোধ যতদূর সম্ভব দূর করা।

স্তন্যপান শিশুদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্তন্যপান সম্বন্ধীয় গোলযোগ পরবর্তী জীবনে সুদূরপ্রসারী দৈহিক ও মানসিক ফল প্রসব করতে পারে। নির্ধারিত সময়ে মায়ের বক্ষ দুগ্ধ পান হল সর্বদিক থেকে বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পেয় দুধটি ভাল হওয়া চাই। খাদ্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত শিশু নিজেকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকে না। স্বভাবতঃই বাইরের বহুবিচিত্র জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ গড়ে উঠে এবং পরিবেশের নানা বস্তুকে সে নাড়া-চাড়া করতে শেখে। পরিবেশকে জানায় এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষণ, ভাবসৃষ্টি, যুক্তি ও চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। খাদ্য বিষয়ে অপরিতৃপ্ত শিশুর মনে বঞ্চনা, ক্রোধ এবং ঘৃণা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। সহজেই এই সব ভাবের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে মা কিংবা অন্য কোন খাদ্যদানকারী। বঞ্চিত শিশু ক্রোধপরবশ হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে এবং তার মনোভাব বদ্ মেজাজের বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ইহা সহজেই বোধ্য যে, শৈশবে খাদ্যবিষয়ে শিশুদের কোনপ্রকারেই বঞ্চিত হতে দেওয়া উচিত নয়।

স্তন্যপানত্যাগ শিশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। স্তন্যপান ত্যাগের

মধ্য দিয়ে শিশু প্রথম স্বতন্ত্র জীবনের দিকে পদক্ষেপ করে এবং তাই এই বিষয়ে মাতা দ্বারা পরিত্যাগের ভীতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। খুব ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সংগে সংঘটিত করলে এই প্রক্রিয়াটি ক্ষতিকারক না হয়ে বরং সুফলপ্রদ হয়ে উঠে। নানাপ্রকারের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস প্রথম থেকেই করান উচিত। আস্বাদের বৈচিত্র্য শিশু খুব পছন্দ করে।

মলমূত্রের ব্যাপারও শিশুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খাদ্যের সংগে সম্পর্কযুক্ত। প্রক্ষোভজনিত গোলমালের দরুণ প্রায়ই শিশুর হজমের গোলমাল হয়। মলমূত্র ব্যাপারে খুব বেশী হৈচৈ করা মোটেই সমীচীন নয়, কেননা, এর থেকে অনেক সময়ে খুব জটিল মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই ব্যাপারে অভিভাবকদের শান্ত ও সংযতভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং মনে করা উচিত যে, শিশু যদি দুবছর বয়সে এই ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জন করে তাহলেই যথেষ্ট হল। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, বিকাশের প্রত্যেক দিকেই ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং সাময়িক বৃদ্ধিরোধের পরিপূরণ প্রায়ই পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে।

(২) দুই থেকে পাঁচ বছরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(ক) অংগ-সঞ্চালন-সম্বন্ধীয় বিকাশ

এই সময়ের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হল ধীরে ধীরে অংগ-প্রত্যংগের উপর শিশুর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বিস্তার এবং পেশীগত ক্ষমতার বৃদ্ধি। দুবছর বয়সে শিশুর পদক্ষেপ ধীর ও দৃঢ় থাকে না। কিন্তু অতি দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটে। ফলে, তিনবছর বয়সে সে অত্যন্ত সহজে হাঁটতে ও দৌড়াতে পারে। এখন থেকে সে নানাপ্রকারের দৈহিক নৈপুণ্যের প্রকাশেও সমর্থ হয়। চক্র-বিশিষ্ট যে-কোন শক্ত খেলনার সাহায্যে এই সমস্ত নৈপুণ্য আয়ত্ত করা সহজ হয়। এই বয়সের ছেলেদের সাহসের কাজকর্মের সুযোগ দেওয়া ভাল, তাতে বৃদ্ধির বিশেষ অবকাশ ঘটে।

সংগীত ও তালের সংগে অংগ সঞ্চালন শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এর দ্বারা শিশুদের দেহ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বাড়ে এবং চলা-ফেরা বেশী সুষম ও সহজ হয়। চার বছরের ছেলেরা তালযুক্ত অংগ-সঞ্চালন (eurhythmics) বিশেষ উপভোগ করে।

ক্ষুদ্র পেশীসমূহের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃহৎ পেশীসমূহের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার পরে শিশু অর্জন করে। পাঁচ বছরের পূর্বে শিশুর বড় বড় উপকরণের প্রয়োজন হয় এবং বড় রকমের অংগ-সঞ্চালনের সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত, অবশ্য যে পর্যন্ত না সে আরও ভাল করে চোখ ও হাতের সমন্বয়সাধনে সমর্থ হয়। অন্ততঃ পাঁচ বছরের পূর্বে কোন শিশুকে লেখা শেখান উচিত নয়। নানা-প্রকারের হস্তসঞ্চালন-সম্পর্কিত কাজকর্ম শিশু এই সময়ে উপভোগ করে, যেমন পুঁতির মালা গাঁথা, খেলনার অংশগুলিকে যুক্ত করা, জুতো পরা, জামা ঝুলান ইত্যাদি।

(খ) ইন্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক বিকাশ

(১) ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ

এই সময়ে শিশুর পরিমাণ, আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদির বোধ ধীরে ধীরে সঠিক হয়ে উঠে এবং সে ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যসমন্বিত যে কোন কর্মের অভ্যাসে আনন্দ পায়। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত যে-কোন যন্ত্রপাতি শিশুদের এই সময়ে বিশেষ আনন্দ দান করে। ছেলেরা পাঁচ বছর পর্যন্ত রংয়ের নামকরণে সমর্থ হয় না, কিন্তু তিনবছরের সময়ে বর্ণের মিল সংঘটনে সমর্থ হয়। সময়বোধ এই সময়ে ভালভাবে গড়ে উঠে না, কেননা, শিশুর আকর্ষণ বর্তমানের প্রতিই—ভবিষ্যৎ ও অতীতের প্রতি কোন টানই শিশু বোধ করে না। এইজন্য শিশুদের খুব দূরের সময়ের (অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত) সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নয়।

(২) বাক্‌শক্তির বিকাশ

আমরা দেখেছি যে, প্রথম বৎসরেই শিশুর বাক্‌শক্তির অতি প্রাথমিক বিকাশ ঘটে; কান্না ও চিৎকার হল অতি শৈশবের প্রাথমিক শাব্দিক প্রকাশ। কিন্তু এদেরও তীব্রতা ও গুণগত পার্থক্য প্রথম মাসের পর লক্ষ্য করা যায়। এর পর আসে শব্দ নিয়ে খেলা বা বক্‌বক্ করা (babbling)। প্রথম দেখা যায় স্বরবর্ণ ও ওষ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণ, পরে দেখা যায় ব্যঞ্জনবর্ণ ও কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণ। স (s), শ (sh), জ (z) এবং র ও ল ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ পরে সম্ভব হয়, কেননা এ সবের উচ্চারণের জন্য জিহ্বার সবলতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং দাঁতের ব্যবহারের প্রয়োজন। এই বক্‌বকানির পর্যায়ে শিশু

শব্দ নিয়ে খেলা করে এবং তাই একই শব্দ বহুবার উচ্চারণ করে আনন্দ পায়।

দশমাস বয়সে শিশু অর্থপূর্ণভাবে একটি কথা ব্যবহার করতে পারে। এক বছর বয়সে সে তিনটি-চারটি পৃথক কথা উচ্চারণ করতে পারে। অন্য বিষয়ের মত বাক্‌শক্তির বিকাশের বেলায়ও ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এই পার্থক্যসমূহ সাধারণতঃ বুদ্ধি, স্বাস্থ্য উৎসাহদান, সুযোগ এবং পরিবেশসম্পর্কিত প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। উচ্চাংগের বুদ্ধির সংগে প্রাথমিক বাক্‌শক্তির বিকাশের সম্পর্ক বিদ্যমান। উপযুক্ত সংগী, উত্তম সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বড়দের ভাল বাচনভঙ্গি এবং সাধারণ প্রকারের উৎসাহ প্রদান বাক্‌শক্তির বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। খুব ভাল স্বাস্থ্য ও দৈহিক কর্মে বিশেষ ব্যস্ততা অনেক সময়ে বাক্‌শক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, কেননা, এই সব ক্ষেত্রে শিশু দৈহিক কর্মে ও নৈপুণ্যঅর্জনে বিশেষ ব্যস্ত থাকে।

প্রথম শব্দটি আয়ত্ত করার পর শিশুর শব্দভাণ্ডার ধীরে ধীরে বাড়ে; একটি বা দুটি শব্দের দ্বারা নানা কাজ করান হয়। আঠার মাসের পর কিন্তু শব্দভাণ্ডার অতি দ্রুত বাড়তে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের এম. ই. স্মিথ শিশুদের শব্দভাণ্ডার পরীক্ষা করে নিম্নের তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন (শিশুদের শব্দভাণ্ডারের বৃদ্ধির ধারণা দানের জন্য)।

বয়স		পরীক্ষিত শিশুর সংখ্যা		শব্দভাণ্ডার
১·০	—	৫২	—	৩
১·৬	—	১৪	—	২২
২·০	—	২৫	—	২৭২
২·৬	—	১৪	—	৪৪৬
৩·০	—	২০	—	৮৯৬
৩·৬	—	২৬	—	১,২২২
৪·০	—	২৬	—	১,৫৪০
৪·৬	—	৩২	—	১,৮৭০
৫·০	—	২০	—	২,০৭২
৫·৬	—	২৭	—	২,২৮৯
৬·০	—	৯	—	২,৫৬২

প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক টারম্যান (Terman) পরীক্ষার দ্বারা নিম্নমত ফলাফল পেয়েছিলেন :

বয়স		শব্দভাণ্ডার
৮	—	৩,৬০০
১০	—	৫,৪০০
১২	—	৭,২০০
১৪	—	৯,০০০
সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তি	—	১১,৭০০
উচ্চাংগের বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি		১৩,৫০০

শিশু প্রথমে বাক্য-শব্দের (sentence-words) দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করে। অবশ্য শব্দের এই স্বল্পব্যয় অংগভংগি ও মুখব্যঞ্জনার সংগে যুক্ত হয়ে অনেক সময় বিস্ময়করভাবে কার্যকরী হয়। আড়াই বছর বয়সের সময় শিশুর ব্যবহৃত বাক্যের জটিলতা কিছু বৃদ্ধি পায়। নিম্নের তালিকার দ্বারা পূর্বোল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক স্মিথ শিশুদের ব্যবহৃত বাক্যের আকৃতি ও জটিলতা-বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন :

বয়স		পরীক্ষিত শিশুর সংখ্যা		বাক্য প্রতি গড় শব্দের সংখ্যা
২	—	১১	—	১·৭
২·৬	—	১৮	—	২·৪
৩·০	—	১৭	—	৩·৩
৩·৬	—	২৩	—	৪·০
৪·০	—	১৭	—	৪·৩
৪·৬	—	২২	—	৪·৭
৫·০	—	১৬	—	৪·৬

বিস্ময়সূচক শব্দ, বিশেষ্য এবং ক্রিয়া হল শিশুদের খুব প্রিয় শব্দ। এদের আবির্ভাবই হয় সবচেয়ে প্রথমে এবং সবচেয়ে শেষে আসে সংযোজক অব্যয় (conjunction), সম্বন্ধবাচক অব্যয় (preposition) ও সম্পর্কসম্বন্ধীয় শব্দসমূহ।

সুতরাং ব্যক্তির জীবনে ভাষার বিকাশ হয় সরলতর রূপাবলী (forms)

থেকে জটিলতর রূপাবলীর দিকে। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের সময়কে সাধারণতঃ ভাষার স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ভাষা আয়ত্ত করা ও ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস এই সময়ে প্রকট হয়ে উঠে।

(গ) সামাজিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশ

সামাজিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশ পরস্পরের সংগে গভীরভাবে যুক্ত বলে এদের একসংগে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পিতা-মাতার সংগে সম্পর্কই হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্ষোভগত সম্পর্ক। এঁদের সংগে সহজ ও প্রেমপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সাধারণ সামাজিক বিকাশ ভালভাবে হতে পারে না। পিতা-মাতার স্নেহ পেলে সে বাইরের লোকের কাছ থেকে ভালবাসা ও স্নেহ আশা করবে এবং এগিয়ে যাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে। এ বিষয়েও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর দেখা যায়।

ভাই-বোনদের সংগে সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের সঙ্গে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক থাকলেও বন্ধুত্ব ও প্রেম-প্রীতির ভাবের দ্বারা সেই সম্পর্কের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের ভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করতে পারে না। তাই এই সময়ে প্রায়ই শিশুদের ব্যবহারে ঘৃণা ও ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। খেলা ও বাক্যের মধ্য দিয়ে এই সব বিক্ষোভমূলক ভাবের ক্ষতিহীন প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য প্রক্ষোভজীবনের কিছুটা দমন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় এবং ভাল পরিবেশে বিজ্ঞ পিতা-মাতার পরিচালনায় থাকলে বছর পাঁচেক বয়সে শিশুর চরিত্রে মোটামুটিভাবে প্রশান্তি, সন্তোষ, সামাজিকতা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সতর্কতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটে। সহজেই অনুমেয় সুখী সংসারের ছেলে-মেয়েরা—যাদের পিতা-মাতার সংগে ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে—বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে, বিরোধ-বিক্ষুব্ধ সংসারে—যেখানে শিশুর সংগে পিতা-মাতার ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেনি—শিশুরা বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয় না। সাধারণতঃ ছেলের আকর্ষণ থাকে মায়ের প্রতি এবং বিরোধিতার ভাব থাকে পিতার প্রতি এবং মেয়ের আকর্ষণ থাকে পিতার

প্রতি এবং বিরোধিতার ভাব থাকে মায়ের প্রতি। দুই থেকে চার বছরের মধ্যে উপরোক্ত বিরোধিতার ভাব খুব তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু তার পর সেই তীব্রতার ক্রমিক হ্রাস ঘটে। অন্য শিশুদের সংগে খেলা এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্রমিক বিস্তৃতি শিশুর প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়।

বড়দের সংগে ও শিশুদের সংগে নিম্নমতভাবে শিশুর সম্পর্ক গড়ে উঠে বলে মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন :

বড়দের সম্পর্কে শিশুর ভাব

(১) ১৮ মাস থেকে ২ বৎসর—নির্ভরশীলতা।
(২) ২ থেকে ৩ বৎসর—স্বাধীনভাব।
(৩) ৩ থেকে ৪ বৎসর—সহযোগিতা।

ছোটদের সম্পর্কে শিশুর ভাব

(১) ২ বৎসর—দূরে থাকা।
(২) ৩ বৎসর—ক্রোধ।
(৩) ৪ বৎসর—বন্ধুভাব।

দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রক্ষোভগত ত্রুটি ঘটে। নিম্নে কতকগুলি ত্রুটির পরিচয় দেওয়া হল :

(১) বদ্‌মেজাজ—(Temper Tantrums)

দু বছরের ছেলের চরিত্রের এটি হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সহৃদয়তার সংগে দেখলে বছর চারেক বয়সে এই বৈশিষ্ট্যটি লুপ্ত হয়।

(২) ধ্বংসের মনোভাব

ধ্বংসমূলক কার্যের মধ্য দিয়ে প্রায়ই শিশুর পরীক্ষার মনোভাব প্রকাশ পায়। কখন কখন এর মধ্য দিয়ে সে তার শক্তি পরীক্ষা করে। আবার কখনও কখনও এর মধ্য দিরে ঘৃণা ও ক্রোধ ইত্যাদি বিস্ফোরক প্রক্ষোভের উদ্গত (sublimated) প্রকাশ ঘটে।

(৩) কলহপ্রিয়তা

সামাজিক জীবনযাপনের অতি দুরূহ শিল্পনৈপুণ্য অর্জনের সময় স্বাভাবিক-ভাবেই কিছুটা সংঘর্ষ দেখা যায়। কিন্তু তা হল 'বৃদ্ধিজনিত কষ্ট' (pain of

growing)। সুতরাং এর জন্য চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তিন বছর বয়সে কলহপ্রিয়তা চরম পর্যায়ে উঠে, কিন্তু চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুরা দীর্ঘতর সময় একসংগে খেলতে পারে এবং তাদের সহযোগিতা-সম্পর্কিত ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

(৪) আরামের অভ্যাস (যেমন আঙ্গুল চোষা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি)

আঙ্গুল চোষা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি অভ্যাস সাধারণতঃ শিশুর আরামবোধ থেকে উদ্ভূত। আঙ্গুল চোষা হল অতিশৈশব (babyhood) থেকে পাওয়া বস্তু। এটি স্তন্যপানের প্রতিভূ। ভীত, উদ্বিগ্ন, একা এবং বিরক্ত হলে শিশু অতি শৈশবের এই অভ্যাসে ফিরে যায়।

(৫) ভয় ও উদ্বেগ

এই সময়ে ভয় ও উদ্বেগ মাঝে মাঝে প্রকাশ পাবেই। শিশুর অবচেতনের বিক্ষোভ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রায়ই প্রকাশলাভ করে। প্রক্ষোভজীবনের সুষ্ঠু বিকাশ এবং পিতামাতার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে ক্রমে দুঃস্বপ্নের প্রকাশ খুব কম হয়ে যায়।

দিনের বেলাতেও শিশুদের ভয়ের প্রকাশ অনেক সময় দেখা যায়। এরও শিকড় মনে হয় অবচেতনে রয়েছে। কিন্তু এই ভয় সাধারণতঃ কোন জন্তু-জানোয়ার বা পোকা-মাকড়কে ঘিরেই গড়ে উঠে।

যে শিশু অত্যন্ত ভীরু ও স্নায়বিক দুর্বলতাবিশিষ্ট সে কখনই প্রকৃতভাবে সুস্থ নয়। খুব বেশী ভয় পেলে বা দুঃস্বপ্ন দেখলে মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

সাধারণ পরিবেশে সাধারণভাবে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ঘটলে বছর পাঁচেক বয়সের শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন অনেক শান্ত ও সংযত হয়ে উঠে।

স্বাধীন খেলার প্রচুর ব্যবস্থা থাকলে শিশুর মন সহজে আকাঙ্ক্ষিত বিকাশ লাভে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ, এই খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ ঘটে। এই খেলার জন্য প্রয়োজন যোগ্য স্থান, উপকরণ ও সংগীত। খেলার উপকরণ হয় বিচিত্র রকমের এবং প্রায়ই শিশু ঘরোয়া ঘটনাসমূহের নাটকীয় রূপদানের (dramatising) মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও বস্তুসম্বন্ধীয় সম্পর্ক-সমূহকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

(ঘ) বৌদ্ধিক বিকাশ

প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশ সহজভাবে চললে বৌদ্ধিক বিকাশও সহজ হয়ে পড়ে। শিশুর মন তখন অন্তর্জগৎ ছেড়ে বহির্জগৎ নিয়ে ব্যস্ত হয় এবং তার ব্যাপকতার পরিচয়লাভেও সমর্থ হয়। এই সময়ে বৌদ্ধিক বিকাশের গতি বৃদ্ধি হয় এবং শিশুর চিন্তা পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়নির্ভর, মূর্ত এবং প্রাণারোপকারী (animistic) না হয়ে অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও বিমূর্ত হতে সুরু করে। তথাপি এই পর্যায়েও শিশুর শিক্ষণের প্রথম মাধ্যম হল কর্ম এবং শিশুর এই স্তরের সর্বাপেক্ষা ভাল বৌদ্ধিক পরিমাপ পাওয়া যায় কর্মমূলক বৌদ্ধিক অভীক্ষার দ্বারা। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধিক অভীক্ষার ফল সাত বছরের পূর্বের অপেক্ষা সাত বছরের পরে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়, কেননা এই সময়ে প্রক্ষোভ-জীবনের প্রভাব তার সামগ্রিক জীবনের উপর খুব বেশী পড়ে।

শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব তাড়াতাড়ি সুরু করা উচিত নয়। এর জন্য যোগ্য মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। তবে শিশুর আচরণ সহজেই প্রকাশ করে কখন এই প্রস্তুতি পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে প্রচুর সুযোগ দিতে হয় বাস্তব জগতে উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, কেননা এর মধ্য দিয়েই পূর্বোক্ত প্রস্তুতি পূর্ণ হয়ে উঠে।

কোন বিশেষ শ্রেণীতে ভর্তি করাবার পূর্বে শিশুর মানসিক বয়স ও মানসিক বৃদ্ধির গতির সংগে ভালভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক অভিভাবকেরই মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধি সাধারণতঃ তিনটি বস্তুর দ্বারা খারাপভাবে প্রভাবিত হয়ঃ (১) শারীরিক দুর্বলতা, (২) সীমাবদ্ধ পরিবেশ ও (৩) প্রক্ষোভগত বাধা (inhibition)।

(৩) পাঁচ থেকে এগার বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী

(ক) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালন-সম্পর্কিত বিকাশ

এই সময়ে শিশুর দৈহিক বিকাশ ও অংগ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। অংগ-সঞ্চালনগত বিভিন্ন নৈপুণ্যকে শিশু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। এই সময়ে শিশুকে নানা জিনিস শেখানো যায় এবং পরবর্তী

জীবনের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক নৈপুণ্যও আয়ত্ত করতে সাহায্য করা যায়।

শিশু এই সময়ে অত্যন্ত কর্মচঞ্চল হয় এবং চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন কিছু করতে সে খুবই চায়। এই সময়ে স্বাধীন খেলা ত্যাগ করে সে সঙ্ঘবদ্ধ খেলায় যোগদান করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে শিশু নানাবস্তু সংগ্রহ করে। তার বিচিত্র ও ব্যাপক সংগ্রহপ্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে অনেক মনস্তাত্ত্বিক এই বয়সকে 'সংগ্রহের বয়স' (collecting age) আখ্যা দিয়েছেন। শিশুর সংগ্রহের এই প্রবৃত্তিকে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা যায়।

(খ) বৌদ্ধিক বিকাশ

এই সময়ে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ বেশ এগিয়ে যায়। এখন সে বিমূর্ত-চিন্তায় অনেক বেশী অভ্যস্ত হয় এবং সামান্যীকরণে খুব সহজেই সমর্থ হয়। যুক্তিযুক্ত বিষয়বস্তু আয়ত্তও সে সহজে করতে পারে। প্রক্ষোভগত সমস্যাসমূহ এখন মনের সম্মুখে না থাকায় শিশুর বৌদ্ধিক কৌতূহল খুব উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। তার স্মৃতির ব্যাপ্তি (memory span) এখন দীর্ঘতর হয় এবং তার মনোযোগের ক্ষমতাও অনেক বাড়ে। তার বৌদ্ধিক আগ্রহ এখন বেশ ব্যাপক হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রও হয় অনেক বেশী বিস্তৃত। কিন্তু কোন শিশুর প্রক্ষোভগত সাম্য যদি না থাকে তাহলে বৌদ্ধিক বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বড়দের অনুকরণস্পৃহা ধীরে ধীরে কমে যায়। যদিও অন্য শিশুদের অনুকরণ, বিশেষ করে যদি তারা বড় হয়, বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

এই বয়সের শিশুদের জন্য নানাপ্রকারের বৌদ্ধিক অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সমস্ত অভীক্ষার বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করলে এই বয়সের শিশুদের বৌদ্ধিক জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। নিম্নে উপরোক্ত অভীক্ষাগুলিকে অনুসরণ করে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল।

সংখ্যাসম্বন্ধীয় স্মৃতি-পরিধি

৪ বছরের শিশু—৪

৭ ,, ,, —৫

১০ ,, ,, —৬

বাক্যসম্বন্ধীয় স্মৃতি-পরিধি

৫ বছরের শিশু—১২ অক্ষর

৮ ,, ,, —১৬ অক্ষর

১১ ,, ,, —২০ অক্ষর

শব্দের সংজ্ঞা

৫ বছরের শিশু—ব্যবহারের ভাষায়—চেয়ার।

৮ ,, ,,—শ্রেণীর ভাষায়—জেলে।

১১ ,, ,,—বিমূর্ত শব্দ—কৃতজ্ঞতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি।

মিল সন্ধান

৭ বছরের শিশু—চেয়ার এবং টেবিলের মধ্যে মিল।

৮ ,, ,,—বল বা কমলালেবুর মধ্যে মিল ও অমিল।

১১ ,, ,,—গাছ, লতা ও ঘাসের মধ্যে মিল।

অসম্ভব সন্ধান

৮ বছরের শিশু—রামের মোটর গাড়ীর একটা চাকা খুলে গিয়েছিল। রাম দেখল সে একলা চাকা পরাতে পারবে না। তাই সে মেরামত করবার জন্য গাড়ীটাকে গ্যারেজে নিয়ে গেল। (এই বর্ণীত অবস্থার অসম্ভাব্যতা দেখাতে ৮ বছরের শিশুরা পারে।)

যুক্তিসম্বন্ধীয় অভীক্ষা

দশ থেকে এগার বছরেয় ছেলে-মেয়েরা নিম্নের অভীক্ষাগুলির সমাধানে সমর্থ হয়।

(১) রাম শ্যামের চেয়ে লম্বা। হরি রামের মত লম্বা নয়। কে সবচেয়ে লম্বা?

(২) শ্যামলী সীতার বাঁ দিকে বসেছিল এবং মালতী শ্যামলীর বাঁ দিকে বসেছিল। যদি আমি তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতাম, তাহলে কে আমার ডান দিকে বসত?

এই সময়ের বৌদ্ধিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নমত কয়েকটি মন্তব্য করা যায়। এগুলি মনে রাখলে শিশুকে শিক্ষাদান করা সহজ হয়ে উঠে।

(১) ব্যবহারিক সমস্যাসমাধানের মধ্য দিয়েই এই সময়ে বৌদ্ধিক বিকাশ প্রধানতঃ সাধিত হয়।

(২) শিশুর শিক্ষা তার স্বাভাবিক আগ্রহের ভিত্তির উপরই সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে সংগে শিক্ষণের উন্নতি ঘটে এবং শিক্ষণের উন্নততর কৌশল ও প্রক্রিয়াসমূহ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।

(৪) স্মৃতিশক্তি এই সময়ে খুবই তীক্ষ্ণ হয়।

(৫) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে প্রক্ষোভগত বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(৬) শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশের হারের ব্যাপারে প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়।

(গ) সামাজিকতার বিকাশ

বাল্যের মাঝামাঝি সময়ে শিশুদের সামাজিকতাবোধ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলেদের সংগ খোঁজে এবং মেয়েরা খোঁজে মেয়েদের সংগ। তবে মিশ্র দলও দেখা যায়। পূর্বের অপেক্ষা এখন দলগুলি হয় বড়, যদিও দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রায় প্রত্যেকেরই থাকে। বন্ধুত্বের ভিত্তি সাধারণতঃ হয় সাধারণ কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই গুপ্তদল তৈরী করে, যার মধ্যে বড়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। এই সময়টিকে অনেক সময় 'দলবাঁধার সময়' (gang age) বলে অভিহিত করা হয় এবং এই দলবাঁধা এগার বছর বয়স নাগাদ চরম পর্যায়ে উঠে। দলগুলি ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত হয় এবং কখনও কখনও দুঃসাহসিকতা ও আনন্দোচ্ছ্বাসের ফলে শিশুরা অন্যায়, এমনকি অপরাধের পথে এগিয়ে যায়।

বাল্যের জন্য গঠিত 'স্কাউট্', 'গাইড্' প্রভৃতি দলগুলি এগার বছর নাগাদ শিশুদের আকর্ষণ করতে স্থরু করে এবং শিশুরা নিখুঁত সংগঠন, ভাল নেতৃত্ব ইত্যাদি তারিফ করতে শেখে।

শিশু এই সময়ে পরিবারের বাইরের কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে খাড়া করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ সে অন্ততঃ আংশিকভাবে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হতে চায়। তবে পিতা-মাতার প্রভাব তার জীবনে এখনও অপরিসীম। কেননা, তাঁদের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে না উঠলে নতুন সম্পর্ক ভাল করে তৈরী করে তোলা শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, বোধ হয় উপরোক্ত স্বাধীনতার বিকাশ।

(ঘ) প্রক্ষোভগত বিকাশ

প্রক্ষোভের দিক থেকে এই পর্যায়কে 'প্রচ্ছন্নতার সময়' (period of latency) বলা হয়, কেননা এই সময়ে শিশুর প্রক্ষোভ জীবন পূর্ব বা পরস্তরের মত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয় না। একটা ধীর প্রশান্তি তার অনুভূতির জগতে এই সময়ে সাধারণতঃ বর্তমান থাকে।

এই সময়ে অনুভূতিনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শিশুর অনেক বেশী থাকে এবং সাধারণতঃ বিরোধিতা ও নির্দয়তার বিরুদ্ধে যে বেশ সাহসের সংগে দাঁড়াতে পারে। বয়স্কদের সংগে এখন সে কম মেলামেশা করে এবং বন্ধুদের মত তার কাছে অনেক সময়ে পিতা-মাতার মতের অপেক্ষা মূল্যবান মনে হয়।

কখনও কখনও শিশুরা সরাসরি বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যায়। শিশুদের এই আচরণকে অভিভাবকদের অত্যন্ত সহনশীলতার সংগেই দেখা উচিত, কেননা, তা না হলে পরবর্তী ফল সর্বদিক থেকে ক্ষতিকারক হয়। বিদ্রোহ এই সময় স্বল্পক্ষণস্থায়ীই হয়, যদি অবশ্য অভিভাবকরা উপরোক্তভাবে ব্যবহার করেন।

শৈশবের অপরাধপ্রবণতা (Juvenile Delinquency)

পাশ্চাত্যদেশে এই সমস্যা আজকাল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা নানা দিক থেকে অনুধাবন করে এর সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যসমূহ (ও আরও অনেক কিছু) উদ্ঘাটিত করেছেন ঃ

(১) খারাপ পরিবেশের জন্য অনেক সময় শিশুরা অপরাধের পথে এগিয়ে যায়। খেলার উপযুক্ত স্থান ও উপকরণ না মিললে শিশুরা দুঃসাহসী কাজ করতে অগ্রসর হয়। ফলে, তারা অনেক রকমের সমাজ-বিরোধী কাজ করে বসে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষ বাঁধে। স্বভাবতঃই এই জাতীয় অপরাধ নিরাকরণের উপায় হল ভাল খেলার জায়গা ও উপকরণের ব্যবস্থা করা।

(২) বদ্ সংসর্গের জন্য অপরাধপ্রবণতা বাড়ে না। কারণ বদ্ পরিবেশের জন্যই বদ্ সংসর্গের উদ্ভব হয়।

(৩) অপরাধপ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশী। কারণ, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী, শক্তিসম্পন্ন ও কর্মঠ হয়।

(৪) নয় থেকে এগার বছরের শিশুরা খুব বেশী দলবদ্ধ হতে থাকে এবং

দলবদ্ধ জীবন পছন্দ করে। এই সময়ে তারা অনেক বেশী স্বাধীনতা-ভাবাপন্ন এবং বড়দের কর্তৃত্ববিরোধী হয়। তাই এটিকে বলা হয় 'আইন-ভাঙ্গার সময়'।

(৫) যে-সব শিশু বুদ্ধির অভাবে বিদ্যালয়ের পাঠে কিছুটা অপারগ হয় তারা অনেক সময়ে অপরাধের পথ নেয়, বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এবং সহপাঠীদের চোখে বড় হবার জন্য।

(৬) 'ভগ্ন পরিবারে' ('broken home') স্নেহবঞ্চিত হয়ে শিশু অনেক সময়ে অপরাধ অনুষ্ঠান করে। ভগ্ন পরিবার বলতে বোঝায় সেই সব পরিবারকে যেগুলির বন্ধন মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরিত্যাগ ইতাদি কারণে ছিন্ন হয়েছে।

(৭) অবৈধ প্রণয়জাত সন্তানও অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রায়ই অগ্রসর হয়। সেও স্নেহ, ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবের জন্য অপরাধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হয়।

(৮) কোন প্রতিষ্ঠানে ('অনাথ আশ্রম' ইত্যাদিতে) লালিত-পালিত শিশুও অনেকক্ষেত্রে অপরাধ অনুষ্ঠানে এগিয়ে যায়। তার কারণ, পূর্বানুরূপ ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব।

(৯) বঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত শিশুরাও সাধারণতঃ অপরাধপ্রবণ হয়।

(১০) বাপ-মায়ের ভালবাসা না পেলে ছেলেরা অনেক সময়ে চুরি করে এবং এই চুরি আর কিছুই নয় 'ভালবাসা চুরির' প্রচেষ্টা।

(১১) বয়ঃসন্ধিক্ষণে শিশুর অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী গুরুতর আকার ধারণ করে। সে আরও বেশী স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী, প্রবৃত্তিপরবশ এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তার অন্তরের বিক্ষোভ মুক্তির পথ অনিরুদ্ধভাবে খোঁজে এবং তার নবজাগ্রত যৌনচেতনা তাকে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রণোদিত করে। সংসারানভিজ্ঞ, সহজে বিক্ষুব্ধ, বয়ঃসন্ধিকালের শিশু সহজেই অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে এবং তাই তার প্রয়োজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পরিচালনার।

(১২) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের মূলচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন ভালবাসা, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং বাইরের উপযুক্ত বৌদ্ধিক ও সামাজিক উদ্দীপনা-পূর্ণ অবস্থাসমূহের উপস্থিতি।

উপরের আলোচনাতে সাধারণভাবে পরিবেশবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের মতবাদের অনুসরণ করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তথাপি বেশীর ভাগ মনস্তাত্ত্বিকদের অমনিই মত।

(৪) এগার থেকে আঠার বছর বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী

(ক) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালনগত বিকাশ

এগার বছর বয়স থেকে সাধারণ সুস্থ বালকের উচ্চতার হার বাড়তে থাকে এবং চোদ্দ-পনের বছর বয়সের সময় সেই বৃদ্ধির হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। সাধারণ সুস্থ বালিকার উচ্চতার হার দশ বছর থেকে বার-তের বছর পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং তারপর বৃদ্ধির হার কমে যায়। ওজনের দিক থেকে সাধারণ সুস্থ বালকের বৃদ্ধির হার এগার বছর বয়সের পর থেকে দ্রুত হয় এবং চোদ্দ বছর বয়সে সেই হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। অন্যদিকে বালিকাদের বৃদ্ধির হার তের-চোদ্দ বছরের সময় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। উপাস্থিগুলি (cartileges) এখনও বাড়তে থাকে এবং হাড়গুলি এখনও সুগ্রথিত না হওয়ায় সহজে বিকৃত হতে বা আঘাত পেতে পারে। কতকগুলি গ্রন্থি এই সময়ে রক্তধারায় রস নিঃসরণ করে এবং সেই রস শিশুর বৃদ্ধির উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

এই সময়ে শিশুর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকে। কেননা, দেখা গেছে যে দশ থেকে পনের বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা কম। তবুও শীতপ্রধান দেশে এই সময়ে বাত-জ্বরের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে দেখা যায়।

এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তন যৌন ইন্দ্রিয়ের পরিণতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। যৌবনাগমের বয়স খুবই পরিবর্তনশীল। বালিকাদের মধ্যে বালকদের পূর্বেই যৌবনের উদ্গম হয়। যৌবনাগমের সময় ১১ বছর থেকে ১৬ বছর, কি আরও কিছু বেশী। যৌবনাগমের এই পরিবর্তনশীলতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন, বংশধারা, জাতি-প্রকৃতি (ethnic group), আবহাওয়া ও মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা। শেষোক্ত মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব থেকে প্রধানতঃ আসে এবং তার প্রভাবে যৌবনাগমের গতি দ্রুততর হতে পারে। যৌবনাগমের বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তনের ফলে দেহতন্ত্রের উপর বিশেষ চাপ পড়ে এবং সেইজন্য

উপযুক্ত খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যৌবনাগম নিয়ে হুলুস্থূল করা যদিও খুব রেওয়াজ হয়ে পড়েছে, তথাপি একথা জোর করে বলা যায় যে, সাধারণ কর্মময় জীবন ও বর্ধমান আগ্রহরাজির (interests) জন্য যোগ্য সুযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সাধারণ বালক-বালিকা যৌবনাগমজনিত দৈহিক ও মানসিক অসুবিধার হাঁত থেকে বেশ সহজেই রেহাই পেতে পারে। মারগারেট্ মিড্ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদেরা এই প্রসঙ্গে আদিম জাতিগুলির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

বাল্য থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন সহসা আসে না। পূর্বেই বলা হয়েছে আদিম জাতিগুলির মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের জন্য বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা আছে। উৎসবান্তে শিশুদের বয়স্কদের সমাজের সভ্য বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্কদের সমাজে এই অন্তর্ভুক্তির সময় ক্রমেই পেছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আংশিক ফলস্বরূপ বয়ঃসন্ধিক্ষণের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির আবির্ভাবও অপেক্ষাকৃত পরে ঘটছে। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

ষ্টান্‌লী হল (Stanley Hall) এবং তাঁর সমর্থকদের প্রভাবের ফলে একথা বেশ প্রচলিত হয়েছে যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপযোগী মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে প্রক্ষোভগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, একমাত্র আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলেই বিকাশলাভ করে। কিন্তু কথাটি অনেকাংশে সত্য নয়, কেননা এটা ঠিকই যে, বয়ঃসন্ধিকালের অনেক বৈশিষ্ট্যেরই মূলে রয়েছে আসন্ন স্বাধীন জীবনের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও আশা। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তি হল মনোজগতে, দেহজগতে নয়।

পেশীগত শক্তি যদিও এগার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, তথাপি পেশীগত নৈপুণ্য ক্রমিক ধারায় বৃদ্ধি পায় না। এইটির আংশিক কারণ এই যে, বিভিন্ন হাড় বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পায়। এর অন্য কারণ-সমূহ নিহিত রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রে ও শিশুর প্রক্ষোভ-জীবনে। যৌন ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধির জন্য যৌবনাগমে সাময়িকভাবে স্নায়ু ও পেশীর যুক্ত কার্য ক্ষুণ্ণ হয়।

(খ) ইন্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক বিকাশ

চোদ্দ থেকে ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশগত পরিবর্তন বিশেষ ঘটে না। পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, যা ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অপেক্ষা বিশেষ

জ্ঞান, আগ্রহ ও শব্দভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে, এই সময়ে কিছুটা কমে যেতে পারে, কেননা, বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুর মন অনেক সময় অন্তর্মুখী হয় এবং পরিবেশের দিকে অপেক্ষাকৃত কম নিবদ্ধ হয়।

পূর্বে মনে করা হত যে, মানসিক শক্তিগুলির আবির্ভাব ক্রমিক পর্যায়ে ঘটে। মনে করা হত যে, শৈশব হল ইন্দ্রিয়নিচয় ও অঙ্গসঞ্চালনক্ষমতার বিকাশকাল, বাল্য স্মৃতিশক্তির বিকাশকাল এবং যৌবনাগমে ঘটে যুক্তি-ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ। মানসিক শক্তিগুলির এই ক্রমিক আত্মপ্রকাশের ধারণার উপর নির্ভর করেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। শক্তিগুলির ক্রমিক বিকাশের ঐ ধারণার সংগে সংগে এও মনে করা হত যে, সেইগুলির সাধারণ শিক্ষা প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষা সম্ভব হয় বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর সাহায্যে। বর্তমান কালে মানসিক শক্তিগুলির পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং অস্বীকার করা হয়েছে তাদের ক্রমিক আবির্ভাবের কথা। মানসিক শিক্ষার জন্য এখন কোন সাধারণ শিক্ষার কথাও বলা হয় না। এখনকার মতে এই শিক্ষার কাজ হল বিশেষ অভ্যাসসমূহ, স্মৃতিসমূহ, ধারণাসমূহ, হস্ত ও মানসিক নৈপুণ্যের বিভিন্ন রূপসমূহ, বৌদ্ধিক আগ্রহনিচয়, নৈতিক আদর্শাবলী এবং পদ্ধতিসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। তবে এই পথানুসরণের বিপদ হল এই যে, অর্জিত বহুবিধ মানসিক ক্ষমতা, প্রক্রিয়া ও কৌশলের মধ্যে সংহতি উপস্থিত না থাকতে পারে। এই বিপদ এড়ানর জন্য প্রয়োজন সমস্ত মানসিক গুণাবলীর সংহত বিকাশ ও একটি সর্বব্যাপী জীবন-দর্শনের আবির্ভাব। শিশুশিক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে তাদের এই কথা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত।

যৌবনাগমের সময়ে 'সাধারণ বুদ্ধির' (general intelligence) বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমে যায়। এর পরে বৃদ্ধির পরিমাণ হয় সামান্য এবং ষোল থেকে আঠার বছর বয়সের মধ্যে বিকাশের সীমায় পৌছান যায়। অবশ্য অন্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে প্রচুর। যোগ্যতর শিশুদের বৃদ্ধি সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশীদিন ধরে চলে এবং হীনবুদ্ধিদের বুদ্ধির বিকাশ সাধারণ শিশুদের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিশেষ আগ্রহ ও মনোভাবের বিকাশ এবং নূতন বৌদ্ধিক নৈপুণ্যসমূহের অর্জন বুদ্ধির

বিকাশের সংগে সংগেই বন্ধ হয় না। ফলে বৌদ্ধিক বিকাশ উচ্চতার (vertical) দিক থেকে বন্ধ হলেও, সমতলক্ষেত্রে সামনের দিকে (horizontally) অনেকদিন ধরে চলতে থাকে।

বুদ্ধি ও মনোযোগের ব্যাপ্তির বৃদ্ধির জন্য শিশুরা এই সময়ে দীর্ঘতর সময় ধরে মনোনিবেশ করতে পারে এবং দীর্ঘতর ও জটিলতর বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে। এর ফলে শিখণের ক্ষমতা ও মনে রাথার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ বুদ্ধিযুক্ত স্মরণক্ষমতা এই সময়েই খুব বৃদ্ধি পায়। যৌবনাগমের সময়ে, বিশেষ করে বালিকাদের, প্রতিরূপগুলি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত ও মূর্ত এবং তাই এই সময় হল সৃজনমূলক কল্পনাশক্তির (imagination) শিক্ষার উত্তম কাজ।

যদিও এ কথা ঠিক নয় যে, এই সময়েই বৌদ্ধিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তবুও এ কথা সত্য যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু এই সময়ে বিমূর্ত ও প্রতীক সমন্বিত চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনেক বেশী সমর্থ হয়। তর্কবিদ্যাসম্মত যুক্তি হল এক প্রকারের কৌশল। যৌবনাগম হল এই কৌশল আয়ত্তের অতি উপযুক্ত সময়।

শিশুরা বয়ঃসন্ধিক্ষণ কালের শেষে প্রায়ই জীবনে প্রবেশ করে এবং জটিল আধুনিক জীবনের সংগে সংগতিবিধানে বাধ্য হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের উচিত মানবসভ্যতার সাধারণ রূপরেথার সংগে এবং তাদের দেশ ও জনপদের ইতিহাসের সংগে শিশুদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া। অল্প বয়স ও সীমিত শিক্ষাকালের জন্য এই পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। সুতরাং প্রশ্ন উঠে, কোন্ উপায়ে সময়ের এই সীমিত দানকে জীবনের উপযুক্ত করে তোলা যায়? কেউ কেউ বলেন, পরবর্তী কালের জন্য সব চেয়ে ভাল শিক্ষাদান সম্ভব নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের বস্তুমুখী চিন্তার অভ্যাস গঠন করিয়ে এবং পরবর্তী জীবনে ঐ প্রকার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের বিশেষভাবে অবহিত করিয়ে, কিন্তু অনেকে আবার ঐরূপ প্রস্তাবে পূর্ণভাবে রাজী নন। তাঁদের মতে বস্তুমুখী চিন্তার অভ্যাসগঠন ও তার প্রয়োজনীয়তা-বোধের উন্মেষের সংগে সংগে তের বছর বয়সের উপরের শিশুদের শিক্ষায় দুটি উপাদান থাকা উচিত: নাগরিকতার শিক্ষা এবং ব্যক্তিতা বিকাশের শিক্ষা। এই নাগরিকতাশিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে ক্রমিক পর্যায়ে শিশুদের জ্ঞানদান এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হবে দেশের ও বিশ্বের

ঘটনাবলীর স্বাধীন আলোচনা। একথা বোঝা খুব কঠিন নয় যে, উপরোক্ত দুই প্রকারের ব্যবস্থা হল পরস্পরের পরিপূরক, তাদের মধ্যে কোন প্রকারের দ্বন্দ্ব নেই। সুতরাং বয়ঃসন্ধিক্ষণের বৌদ্ধিক শিক্ষায় ঐ দুই প্রকারের ব্যবস্থারই স্থান থাকা উচিত।

(গ) প্রক্ষোভগত বিকাশ

শৈশব ও বাল্য থেকে যৌবনাগমকালে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় মুখ্যতঃ পরিমাণগত, কিন্তু ঐ সময়ে প্রক্ষোভগত বৃদ্ধি শুধু মাত্র পরিমাণগত হয় না, হয় গুণগতও। অবশ্য এই গুণগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে, হঠাৎ নয়।

যৌন ইন্দ্রিয়গুলি ও তাদের গ্রন্থিতন্ত্রের পরিণতির জন্য শিশুদের গুপ্ত কৌতূহল জাগতে পারে এবং অবদমিত ভীতি ও ঘৃণাবোধেরও উদ্ভব হতে পারে। যৌন বিষয়ে নূতন আগ্রহ কখনও কখনও অবশ্য পরিস্ফুটও হয়। উদ্দেশ্যহীন অস্থিরতা, অদ্ভুত আকাজ্ক্ষা ও তীব্র প্রক্ষোভানুভূতি এই সময়ে দেখা যায়। অনেক যুবকের এই সময়ে প্রচ্ছন্ন ভীতি জন্মায় এবং চাপা প্রকৃতির যুবকরা মিথ্যা ও ভণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত যৌনজ্ঞান দান করা বয়স্কদের কর্তব্য। এই যৌনজ্ঞান প্রধানতঃ দান করবেন —পিতা-মাতা, শিক্ষক, ধর্মযাজক, যুবনেতা প্রভৃতি বয়স্করা। অবশ্য শুধুমাত্র যৌনজ্ঞান দানের দ্বারা সুস্থ জীবনবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যৌনজ্ঞানকে সুস্থ নৈতিক ধারণানিচয় ও জীবনদর্শনের অংগীভূত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এই সময়ে সর্বপ্রকারের প্রক্ষোভের তীব্রতা বাড়ে। রাগ, অহংকার, যুযুৎসা, আত্মপ্রদর্শন ইত্যাদি এই সময়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংগে সংগে ভীতি, অপরের নেতৃত্ববরণের ইচ্ছা ইত্যাদিও দেখা যায়। আগের স্তরের বহির্মুখিনতার স্থানে এখন আত্মসমালোচনার উদ্ভব হয়। অনেকের বিবেক এই সময়ে অতি কঠোর হয়ে উঠে, ফলে তারা নির্দোষ ব্যাপারেও গুরুতর অপরাধ ও পাপের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। অত্যধিক আত্মসচেতনতার ফলে অনেকে সমালোচনাকাতর হয়ে পড়ে। অনেকে এই সময়ে আত্মমৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। বড়দের উচিত এই আচরণকে সহানুভূতির সংগে দেখা এবং খুব স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করা।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুর আচরণের উপরোক্ত বিরোধী গুণাবলী বুঝিয়ে দেয় যে শিশু জটিল জগতের সংগে সংগতিবিধানে ব্যস্ত। শিশু এখন বাল্যের

বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে ঘৃণা করতে সুরু করে এবং সুরু করে বয়স্কদের চাল-চলনকে ভালবাসতে। স্বভাবতঃই পূর্বের স্তরের প্রশান্তির ভাব এখন প্রায় অন্তর্হিত হয় এবং প্রক্ষোভ-জীবনের জটিলতা স্ব-বিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। সত্যই এই বয়সটি হল স্ব-বিরোধী ভাবের- কাল। অত্যধিক পরিশ্রমের পরেই দেখা যাবে যে, শিশু কুঁড়েমিতে লিপ্ত, বন্ধুসংগের পরেই সে চায় একাকী থাকতে। বিশ্বাস ও সন্দেহ পর পর দেখা দেয়। এই রকম পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি ও আচরণের প্রকাশের জন্য এই বয়সের শিশুদের সংগে প্রায়ই গৃহে ও বিদ্যালয়ে বয়স্কদের সংগে সংঘর্ষ দেখা দেয়। কিন্তু তথাকথিত 'ঝড়-ঝঞ্ঝা' ('storm and stress') এড়ানর সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হল সাধারণ কর্মঠ জীবন এবং সজ্ঘবদ্ধ কর্মের প্রচুর সুযোগ।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশু সচেতনভাবে বা অবচেতন স্তরে তার জীবনকে নির্দিষ্ট ব্যাপক লক্ষ্য ও আদর্শসমূহকে কেন্দ্র করে পরিচালিত করতে চায়। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হল ধর্মীয় ও দার্শনিক লক্ষ্যসমূহ। দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রশ্নসমূহ শিশুদের আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করে এবং বিব্রতও করে তোলে। এই সময়েই সাহিত্য খুব প্রিয় হয়ে উঠে এবং আদর্শ ব্যক্তি ও আদর্শকে ঘিরে প্রক্ষোভগুলি পরিচালিত হতে থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী রসও (sentiment) গঠিত হয়। এই সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই খুব প্রকট হয়ে উঠে। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল বিদ্যালয়ের জীবনকে খাঁটি ধর্মীয় ভাবে অভিষিক্ত করে তোলা, ধর্মসমূহ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানদান করা এবং ভাল উদাহরণসমূহ উপস্থাপিত করা। ধর্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল নির্দেশ হল ঐতিহাসিক ও বস্তুমুখী দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুকে দেখা। শিশুদের বোঝাতে হবে পুস্তকটি বা পুস্তকগুলির অর্থ যারা লিখেছিল এবং যাদের জন্য লেখা হয়েছিল তাদের কাছে আসলে কি ছিল।

বলা বাহুল্য, ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থার কোন মূল্য নেই। তাঁরা এই বয়সের শিশুদের মানবতামূলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করার বিশেষ পক্ষপাতী। আসল কথা হল এই যে, এই সময়ের শিশুদের একটি ব্যাপক বিশ্ববীক্ষা (weltanschauung) গঠনে সাহায্য করতে হবে। তবে সে বিশ্ববীক্ষা ধর্মভিত্তিক হতে পারে বা নাও হতে পারে।

(ঘ) সামাজিক বিকাশ

এই সময়ে পিতা-মাতার সংগে শিশুর সম্পর্ক বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। পিতা-মাতার সমালোচনায় এখন সে প্রায়ই তৎপর হয়ে উঠে এবং তাঁদের কর্তৃত্বকে অমান্য করতে আনন্দ পায়। তাঁদের প্রচলিত বিশ্বাসের এখন সে প্রায়ই বিরোধী হয়ে উঠে এবং নূতন বিশ্বাসকে উচ্ছ্বাস ও আবেগের সংগে গ্রহণ করে। তবে যদি পিতা-মাতার সংগে সম্পর্ক এতাবৎ ভাল থেকে থাকে তাহলে বিরোধ খুব অল্প সময়স্থায়ীই হয়।

এই সময়ে শিশু পরিবারের বাইরে সমর্থন ও পরিচালনা খোঁজে। চার্চের সাহায্য সে গ্রহণ করতে পারে এবং কোন শিক্ষককে সে তার বীরপূজার পরম পূজ্য বলে গ্রহণ করতে পারে। কিংবা সে কোন চিত্র-তারকা বা খেলোয়াড়ের আচরণের নকল করতে চায়। এই বীরপূজার ফলে শিশু নূতন উদ্দীপনা, নূতন আদর্শ ও নূতন আগ্রহসমূহ লাভ করে। কিন্তু মাত্রাধিক আকর্ষণের জন্য সে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে এবং আশা ভংগও অনুভব করতে পারে।

বাড়ীর অবস্থা খারাপ হলে সে এখন আরও বেশী করে কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করে। এই প্রকারের দিবাস্বপ্ন খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার অপসারণেরও প্রয়োজন রয়েছে। সমবয়সীদের প্রয়োজন এই সময়ে খুব বেশী। যুব সংগঠনগুলি এই সময়ে খুব প্রিয় হয়ে উঠে। মিশ্র নাচ ও খেলাধূলা এই সময়ে শিশুরা খুব পছন্দ করে। এই সবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের আগ্রহের সংগে শিশুদের পরিচয় ঘটে এবং অন্য যৌনশ্রেণীর সংগে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ক্ষণস্থায়ী প্রেমের ব্যাপারও দেখা যায় এবং এই সব ব্যাপার সাধারণতঃ প্রচুর আবেগ ও উচ্ছ্বাসসমন্বিত হয়। সংখ্যার খুব মূল্য রয়েছে। শিশুকে যত ব্যাপক ও ভাল সামাজিক অভিজ্ঞতা দেওয়া হয় ততই তার সামাজিক বিকাশ সার্থক হয়ে উঠে। সঙ্গীহীন, অত্যধিক পুস্তকপ্রিয় এবং অতিগম্ভীর প্রকৃতির শিশু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। অন্যদিকে অতিকর্মঠ, অতিচঞ্চল ও অসন্তুষ্ট যুবকও মানসিকভাবে নিশ্চয়ই অসুখী হয়। ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুতি হল যৌবনকালের একটি প্রধান কাজ। তাই এদিক থেকে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিদ্যালয় তার এই দিককার কর্তব্য পালন করে যথাসাধ্য পেশাগত পরিচালনা প্রদান করে।

* * * *

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের যে চিত্র উপরে দেওয়া হল তা ইংলণ্ড ও আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে ভারতীয় শিশুদের বেলায় ঐ চিত্র মোটামুটি প্রযোজ্য হলেও পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হবে না। ভারতীয় ও পশ্চিমী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য স্বভাবতঃই শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে—এ কথা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ

আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন করা। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন প্রকৃতির, তাই পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শকে ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকের বেলায় পৃথকভাবে নির্ধারিত করা প্রয়োজন। ব্যক্তির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও কারণসমূহের সংগে গভীর পরিচয়। নিম্নে ব্যক্তিবৈষম্যের সমস্যার বিভিন্ন দিকের আলোচনা লিপিবদ্ধ হল।

(ক) ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ

ব্যক্তিবৈষম্য জীবনের সর্বদিকে প্রকাশ পায়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত প্রকারের বৈষম্যের উপযোগিতা সমান নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালনগত বৈষম্য, মানসিক শক্তিসম্বন্ধীয় বৈষম্য, প্রক্ষোভগত বৈষম্য, সামাজিক গুণাবলীসম্পর্কিত বৈষম্য, অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যসম্পর্কিত বৈষম্য এবং ব্যক্তিত্বসম্পর্কিত বৈষম্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই সব বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই নিম্নের আলোচনা পরিচালিত হবে।

(১) দৈহিক ও অংগসঞ্চালনগত বৈষম্য

এই জাতীয় বৈষম্য সহজেই নজরে পড়ে। এই দিককার উল্লেখযোগ্য বৈষম্য হল উচ্চতা, ওজন, দেহের কাঠামো এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জটিলতা, যাথার্থ্য ও ক্ষিপ্রতা সম্পর্কিত। এই শ্রেণীর সমস্ত প্রকার বৈষম্যের একটি প্রধান লক্ষণ হল এই যে, কোন অনির্বাচিত বড়দলের পরিমাপ করলে এবং পরিমাপের ফলগুলিকে 'গ্রাফ' কাগজে অঙ্কিত করে যুক্ত করলে দেখা যাবে যে সেগুলি ঘণ্টার আকার (bell-shape) ধারণ করে। এই ঘণ্টাকৃতি বক্র-রেখাকে বলা হয় স্বাভাবিক বিস্তারের বক্ররেখা (normal probability curve)। অর্থাৎ বেশী ভাগ লোকের পরিমাপ প্রায় একই প্রকারের হয় এবং খুব অল্প সংখ্যকের পরিমাপ হয়—নয় খুব বেশী বা নয় খুব কম।

দৈহিক ও অংগসঞ্চালনের বৈষম্যের প্রভাব শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের

উপর পড়ে এবং অংগসঞ্চালনগত বৈষম্যের প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর অনেকখানি পড়ে।

(২) বুদ্ধিগত বৈষম্য

একই বয়সের শিশুদের মধ্যে দেহের মত বুদ্ধির ব্যাপারেও প্রচুর বৈষম্য বর্তমান থাকে এবং বুদ্ধির পরিমাপ করলে দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপের মত একই রকমের ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক বিস্তারের বক্ররেখার উদ্ভব হয়।

(৩) প্রক্ষোভগত বৈষম্য

যদিও প্রক্ষোভের প্রকৃতিপ্রদত্ত ভাণ্ডার সকল মানুষেরই প্রায় এক রকম হয়, তথাপি প্রক্ষোভগুলির শক্তি ও পরিমাণ সকলের এক প্রকারের নয় এবং একই অবস্থায় সকলের প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াও এক প্রকারের হয় না। স্বভাবতঃই প্রক্ষোভের বৈষম্যমূলক প্রকাশে অভিজ্ঞতায় অবদান খুব কম হয় না। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার জন্য প্রকৃতির সমগোত্রীয় দানও ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

(৪) সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য

মানবিক সম্পর্কবিষয়ে শিশুরা জন্মের কিছু পরেই আচরণিক বৈষম্য প্রকাশ করে। কোন শিশু হয়ত বেশ সামাজিকতাবোধসম্পন্ন। কেউ হয়ত আবার লাজুক প্রকৃতির। কেউ হয়ত সংঘর্ষপ্রিয়। আবার কেউ হয়ত সহযোগিতাভিত্তিক খেলা ও কর্মে বিশেষ উৎসাহী। কেউ হয়ত নিস্পৃহ ও অন্তর্মুখী স্বভাবের। আবার কেউ হয়ত হাস্যোচ্ছল ও আনন্দ-পরিহাসপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বৈষম্যের কারণ অন্যান্য প্রকারের বৈষয্যের মত বংশধারা ও পরিবেশ উভয়েরই মধ্যে নিহিত এবং যেখানেই পরিমাপ সম্ভব সেখানেই পরিমাপের ফল 'স্বাভাবিক বক্ররেখার' মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

(৫) অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যসম্পর্কিত বৈষম্য

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় এবং বৈষম্যের পরিমাপের ফল 'স্বাভাবিক বিস্তারের বক্র-রেখা'র রূপ গ্রহণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রকার বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এই পরিচয়ের সাহায্যে শিক্ষাকে অনেকটাই ব্যক্তির বিকাশোপযোগী করে তোলা যায়।

(৬) ব্যক্তিত্বসম্পর্কিত বৈষম্য

ব্যক্তিত্ব হল মানুষের বিভিন্ন প্রকারের গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ। এর মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয়, সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ বুদ্ধি, প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়া, সামাজিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সব কিছুই পড়ে। তবে এর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি বিশ্লেষণের ফল নয়, এটি হল মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণজাত ফল। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের বেলায় পৃথক। সুতরাং এটা সহজবোধ্য যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণাত্মক ফলও হবে পৃথক অর্থাৎ বৈষম্যমূলক।

(খ) ব্যক্তিবৈষম্যের কারণসমূহ

ব্যক্তিবৈষম্যের কারণ আংশিকভাবে বংশধারাগত। জননকোষের সার-বস্তুর (germ plasm) মধ্যেই এর প্রাথমিক বীজ নিহিত থাকে। মাতা ও পিতার দেহের যুগ্মফলের জন্য তাদের দুজনের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্যসমূহ শিশুর মধ্যে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারে।

বংশধারাগত বৈষম্যগুলি আবার পরিবেশের বহুবিচিত্র উদ্দীপকগুলির প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হতে পারে। পরিবেশগত উদ্দীপকগুলি সম্পর্কে হলিংগ-ওয়ার্থ নিম্নলিখিত সুন্দর মন্তব্যটি করেছেন ঃ

"মানুষের প্রকৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যই জন্মগত নয়, সেগুলির উদ্ভব হয় অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, অভ্যাস ও আকস্মিক বিপর্যয় থেকে। যে সব ভাষা আমরা ব্যবহার করি, যেসব খাদ্য আমরা পছন্দ করি, যেসব পোষাক আমরা পরি, যেসব বস্তুকে আমরা ভয় করি, যেসব বস্তুকে আমরা ভালবাসি, যেসব প্রথা আমরা শ্রদ্ধা করি, যেসব ইচ্ছাকে আমরা দমন করি, যেসব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আমরা প্রায়ই প্রকাশ করি, যেসব খেলা আমরা খেলি—সমস্তই প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ম ও কর্ম-বিরতির সময়ের প্রত্যেক কাজই আমাদের সাধারণ গঠনের উপর ছাপ রেখে যায়, যেমন জীবনের বিচিত্র আকস্মিক বিপর্যয়সমূহ আমাদের অনেক বিকৃতি ঘটায় "।

বংশধারাগত কারণসমূহ

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশগত কারণসমূহের প্রকৃতি ও প্রভাবের কিছুটা পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এখন বংশধারাগত কারণসমূহের কিছুটা

পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই কারণ সমূহের মধ্যে (১) যৌন কারণ, (২) জাতি বা পরিবারগত কারণ এবং (৩) বয়স বা পরিণতির পর্যায়গত কারণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) যৌন কারণ

যৌন পার্থক্যকে অনেক সময়ে ভুল করে অনেক প্রকারের বৈষম্যের উৎস বলে মনে করা হলেও, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কিছুটার ব্যাখ্যা যৌন পার্থক্যের দ্বারা দেওয়া যায়। কতকগুলি দৈহিক কাঠামোগত (anatomical), দৈহিক প্রক্রিয়াগত (physiological) এবং সাধারণভাবে দেহগত পার্থক্যের ভিত্তিতে রয়েছে যৌন পার্থক্য। অন্য প্রকারের পার্থক্য খুব বেশী বা লক্ষ্যণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, নারী ও পুরুষ সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, বলবিদ্যা, অর্থনীতি এবং সৃজনাত্মক শেখার ক্ষেত্রে প্রায় সমান। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহ ও অর্জিত শক্তির পার্থক্য দেখা গেলেও, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যাখ্যা পূর্বের শিক্ষা ও সামাজিক প্রথার প্রভাবের ভাষায় দেওয়া যায়। যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নারীরা পুরুষের জন্য চিহ্নিত অনেক বিশেষ কর্মক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

(২) জাতিগত কারণ

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যতদিন না পরিবেশের বৈষম্যসৃজনকারী প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে দূরা করা হচ্ছে, ততদিন বলা কঠিন কোন্ জাতির আদিম বৈশিষ্ট্য কি প্রকারের বা কি পরিমাণের। তবে ব্যক্তির মধ্যে যেমন জন্মগত পার্থক্য রয়েছে, তেমনি জাতিদের মধ্যেও জন্মগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু জাতিমিশ্রণ ইতিহাসে এতই ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে যে, বোধহয় কখনই নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না পৃথিবীর জাতিগুলির আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি হল কি প্রকারের বা কি পরিমাণের। এমনকি নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে পৃথিবীর পৃথক জাতিসমূহের সংখ্যা ও অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তিগত বৈষম্যকে জাতিগত বলে নির্দেশ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য

যদি বা থাকত তাহলে সেই পার্থক্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য অপেক্ষা অনেক কমই হোত।

(৩) বয়সসম্পর্কিত কারণ

বয়স বাড়ার সংগে সংগে বিকাশের ধারার অনেক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনেক বেড়ে যায়। দশ বছরের ছেলের সংগে ষোল বছরের ছেলের সমস্ত পার্থক্য প্রত্যক্ষভাবে জন্মগত বা পরিবেশগত নয়। অনেক পার্থক্য শুধু বয়স বাড়ার জন্যই সৃষ্ট হয়।

(গ) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি, অর্থ ও তাৎপর্য

(অ) পূর্বে (তাও বহুপূর্বে নয়) বিদ্যালয় শুধু বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণ সম্পর্কিত বৈষম্যব্যাপারে উৎসাহিত ছিল। অর্থাৎ বিদ্যালয় উৎসাহিত বোধ করত বুদ্ধি, জ্ঞান ও নৈপুণ্য-সম্পর্কিত বৈষম্যের ব্যাপারে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ হওয়ায়, বিদ্যালয় মানব-ব্যক্তিত্বের যে কোন দিকের বৈষম্য সম্বন্ধেই আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বৈষম্যের প্রকৃতি ও অর্থ সম্বন্ধে নিম্নের মন্তব্যসমূহ করা যায়।

(১) প্রত্যেক মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যেকটি লোক পৃথক।

(২) প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের বেলাতেই দেখা যাবে যে, তা বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে হয় মাঝামাঝি রকমের। অর্থাৎ খুব অল্প লোকের মধ্যেই কোন বৈশিষ্ট্য খুব বেশী বা খুব কমভাবে দেখা দেয়।

(৩) বিকাশ বা শিখনের হার হল প্রত্যেক ব্যক্তিরই পৃথক। সকলের বিকাশ এক সময়ে স্থরু হয় না বা একভাবেও অগ্রসর হয় না। শিখনের গতিবেগও সকলের একপ্রকারের হয় না।

(৪) বৈষম্যগুলির আর একটি সাধারণ লক্ষণ হল এই যে, দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হল অত্যন্ত নিবিড়। কোন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পর্কিত পার্থক্য অন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পার্থক্য সৃষ্টি করে।

(৫) একথা সত্য যে, মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বংশধারা ও পরিবেশ এই দুই শক্তিকেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয়, তথাপি উদ্ভবের অপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হল পরিবর্তনের। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন আসে স্বাস্থ্য, দৈহিক কাঠামো, অভিজ্ঞতা, পরিবার ও পরিবেশের মানবীয় সম্পর্ক, অর্থ-নৈতিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের প্রকার ও পদ্ধতি ইত্যাদির প্রভাবে।

(আ) ব্যক্তিগত বৈষম্য ও শিক্ষক

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ও প্রকৃতির সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে শিক্ষকের নিম্নপ্রকারের উপকারসমূহ হতে পারে :

(১) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে পরিচিত হলে শিক্ষকের ধৈর্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি শিখনবিষয়ে মন্থরগতি ও কমশক্তিসম্পন্ন শিশুদের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হবেন।

(২) ব্যক্তি বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের ফলে বোঝা যাবে যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী গড় মানের চেয়ে নিম্নে থাকবেই। সুতরাং বেশীর ভাগকে কেউ আর গড় মানের উপরে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না।

(৩) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে শিক্ষার সংগতিবিধানের প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয় ঐ বৈষম্যকে কমাতে পারে না। শিখনের সুযোগের অভাবের ফলে যে বৈষম্যের উদ্ভব উত্তম সুযোগের ফলে তা কমতে পারে, কিন্তু শিখনের শক্তিরই পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্যজনিত বৈষম্য শিক্ষাদানের উন্নততর প্রচেষ্টার ফলে কমে না, বরং বাড়ে।

(৪) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার ফলে প্রতিষেধাত্মক (remedial) ব্যবস্থার ফলাফলকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা সম্ভব হবে। একজনের সম্পর্কে প্রাপ্ত ফলের সংগে অন্য একজনের সম্পর্কে প্রাপ্ত ফলের অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর তুলনা করা বন্ধ হবে।

(৫) মানব-ব্যক্তিত্বের সর্বদিকের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কের সংগে পরিচয়ের ফলে আরও উচ্চাংগের শিক্ষাদান সম্ভব হবে। দূরস্থিত কারণের সন্ধানে ও ব্যবহারে শিক্ষকদের দক্ষতা অনেক বাড়বে।

(ঘ) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে শিক্ষার সামঞ্জস্যবিধান

ব্যক্তি-বৈষম্যের কারণ যাই হোক না কেন শিক্ষাবিদ্‌দের কর্তব্য হল এই বৈষম্যগুলির সংগে প্রথমেই পরিচিত হওয়া এবং এমনভাবে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারিত করা যাতে করে ভাল বৈষম্যগুলি সংরক্ষিত হয় এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং খারাপ বৈষম্যগুলির ভিত্তি শিথিল হয় কিম্বা সেগুলি বিদূরিত হয়। যে কোন অনির্বাচিত ছাত্রদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই পার্থক্যগুলি হল (১) দেহসম্পর্কিত, (২) সাধারণ ও বিশেষ শক্তির পরিমাণসম্পর্কিত এবং (৩) প্রক্ষোভ ও সামাজিকতা-

সম্পর্কিত। এই বৈষম্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষাক্ষেত্রে কি প্রকারের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায় নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

(১) দৈহিক বৈষম্যসমূহ ও শিক্ষা

সমাজের প্রত্যেক শিশুরই স্বাস্থ্য ভাল হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যেখানেই দেখা যাবে যে, ব্যক্তিগত বৈষম্য দৈহিক সুস্থতাব্যঞ্জক নয়, সেখানেই দ্রুত যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রেরই শারীরিক পরীক্ষা করান উচিত এবং প্রয়োজনবোধে যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। চিকিৎসা-ব্যাপারে অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সংগে সহযোগিতা করা বিদ্যালয়ের উচিত, কেননা বিদ্যালয়ের একক প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের উপযোগী হবে না।

যে সব ছাত্রের গুরুতর দৈহিক ত্রুটি আছে তাদের সম্পর্কে বিদ্যালয়ের যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, কেননা, গুরুতর দৈহিক ত্রুটির ফলে শিশুর শিখন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং তার প্রক্ষোভজীবনে গুরুতর সংক্ষোভের আবির্ভাবও হতে পারে। দৈহিক ত্রুটির ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এমনি : (১) যতশীঘ্র সম্ভব ত্রুটি আবিষ্কার, (২) সংগে সংগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, (৩) বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থাকে ত্রুটিযুক্ত শিশুর প্রয়োজনের নিরিখে পরিবর্তিত করা, (৪) ত্রুটিযুক্ত শিশুর প্রতি বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ের কর্মাবলীতে যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণে তাকে উৎসাহিত করা।

অনেক সময়ে একই শ্রেণী-কক্ষের অভ্যন্তরে ত্রুটিহীন ও ত্রুটিযুক্ত উভয় প্রকারের ছাত্রদেরই শিক্ষাদান সম্ভব হয়। আবার অনেক সময়ে প্রয়োজন হয় পৃথক শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের।

উপরে যাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন প্রত্যেকটি শিশুই পৃথক এবং সেইজন্য দৈহিক শিক্ষার বেলায় বিশেষ করে এবং সাধারণ শিক্ষার বেলায়ও দেহগত বৈষম্যকে নজরে রেখে শিক্ষাদান করতে হবে।

(২) সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশেষ শক্তিসম্পর্কিত বৈষম্য এবং শিক্ষা

আমরা দেখেছি যে, সাধারণ মানসিক শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির পরিমাপ সব মানুষের, ও তাই সব শিশুর, সমান নয়। কিছু সংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের

চেয়ে বেশী এবং প্রায় সমসংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের চেয়ে কম, কিন্তু বেশীরভাগ লোকের বুদ্ধি হয় মাঝামাঝি রকমের। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণের জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে I. Q. নামক পরিমাপ-কৌশলের। এই I. Q. দ্বারা বয়স ও মানসিক বৃদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। মানসিক বয়স (বুদ্ধির হিসাব মত গড় বয়স) ও সাধারণ বয়সের আনুপাতিক ফল হল I. Q.। মনস্তাত্ত্বিকরা I. Q.-র উপর নির্ভর করে নিম্নভাবে মানুষের শ্রেণীকরণ করেছেন ঃ

I. Q.	শ্রেণী
(১) ১৪০ এর উপর	প্রতিভাধর বা প্রতিভাধরকল্প
(২) ১২০ থেকে ১৪০	অত্যন্ত বেশীবুদ্ধিসম্পন্ন
(৩) ১১০ থেকে ১১৯	বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন
(৪) ৯০ থেকে ১০৯	সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন
(৫) ৮০ থেকে ৮৯	একটু বোকা
(৬) ৭০ থেকে ৭৯	সীমারেখাস্থিত
(৭) ৫০ থেকে ৬৯	'মোরোন' (moron)
(৮) ২৫ থেকে ৪৯	'ইমবেসাইল' (imbecile)
(৯) ২৫ এর নীচে	'ইডিয়ট্' (idiot)

সাধারণ বুদ্ধি ও বুদ্ধি-পরিমাপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে বর্তমানে পৌছান যায় ঃ

(১) স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধির সংগে বুদ্ধির সম্পর্ক খুব নিবিড়।

(২) I. Q. অপরিবর্তনীয় নয়। উন্নত পরিবেশগত অবস্থা I. Q.-র বৃদ্ধি কিছুটা সংসাধিত করতে পারে। তবে পরিবেশের প্রভাব প্রথম দিকে যত কার্যকরী হয়, শেষের দিকে তত কার্যকরী হয় না।

(৩) একটি মাত্র বুদ্ধির পরিমাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যের অবস্থা, শ্রান্তি ও আগ্রহের পরিমাণ কিম্বা পরিবশগত অবস্থা বুদ্ধি পরীক্ষার ফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

(৪) উত্তম অর্থাৎ সঠিক (valid) ও নির্ভরযোগ্য (reliable) বুদ্ধি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত I. Q. ব্যক্তির শিখন ক্ষমতার পরিমাণের নির্দেশ দেয়।

(৫) I. Q.-র সংগে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করলে (যেমন

শিখনের ক্ষেত্রে অর্জিত ক্ষমতা, প্রক্ষোভগত স্থৈর্য বা অস্থিরতা, পঠনের অভ্যাসের উপযোগিতা) মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাস দানের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বুদ্ধির সংগে বিদ্যালয়ের সাফল্য খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের সাফল্য বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের সংগে সমান তাল রেখে বাড়ে বা কমে। তবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সম্পর্কে এই মন্তব্যটি প্রযোজ্য নয়, কেননা শারীরিক স্বাস্থ্য, প্রক্ষোভজনিত অবস্থা, আগ্রহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থাসমূহ শিখনক্রিয়াকে ভাল বা মন্দর দিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) যদি ৮০র কম হয়, তাহলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে যে সব শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৮০র ভেতরে তাদের পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুটা পরিবর্তিত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা সম্ভব এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি করাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন প্রয়োজন। ৫০ এর কম বুদ্ধ্যঙ্কের শিশুদের আচরণ কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মারফত নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ের বেশী বুদ্ধিমানদের, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের এবং বোকা, সীমারেখস্থিত ও মোরোনদের পূর্ণাংগ বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(অ) উজ্জ্বলবুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্নদের (gifted children) শিক্ষার প্রকৃতি

উজ্জ্বলবুদ্ধি ও বিশেষশক্তিসম্পন্নদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ পর্যন্ত নানাপ্রকারের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল :

(১) উজ্জ্বলবুদ্ধিদের অনেক সময়ে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করে দ্রুত অগ্রসর হতে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা এই শ্রেণীর শিশুরা অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের নির্ধারিত পাঠক্রম শেষ করে ফেলতে পারে। তবে এই ব্যবস্থার ত্রুটি হল এই যে, কোন শিশু বুদ্ধির দিক থেকে উজ্জ্বল হলেও দৈহিক, প্রক্ষোভগত ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর হতে পারে এবং ফলে মানসিক ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকে সে জটিল অভিযোজনসম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অন্যদিকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর কাছ থেকে দূরে

মানুষ হওয়ার জন্য সে অগণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জন করতে পারে এবং তাদের প্রকৃতির সংগে পরিচয় না থাকার জন্য সার্থকভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে-ও অক্ষম হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরাও এদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজের বিপুল ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থার একমাত্র গুণ হল এই যে, বুদ্ধিমানদের অপেক্ষাকৃত কমবুদ্ধিসম্পন্নদের সংগে একসাথে মন্থর গতিতে এগোতে হয় না।

(২) কোন কোন স্থানে আবার উজ্জ্বলবুদ্ধি শিশুদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে উপরের ব্যবস্থার দোষগুলি আরও প্রকট হয়ে উঠে। তবে উপরের ব্যবস্থার গুণটিও এইরূপ ব্যবস্থায় আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অর্থাৎ পৃথক বিদ্যালয়ে উজ্জ্বলবুদ্ধিদের মানসিক দিকের চর্চা আরও অনেক ভালভাবে সম্ভব হয়।

(৩) বর্তমানে উজ্জ্বলবুদ্ধিদের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে রেখে উন্নততর বিষয়বস্তুর সাহায্যে যোগ্য শিক্ষা দেবার বিশেষ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই ব্যবস্থায় ঐ শিশুদের সৃজনীশক্তির বিকাশের ও স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ নানা ভাবে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় শিশুদের মানসিক বিকাশও সার্থক হয় এবং সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিরও অবকাশ থাকে না। অবশ্য এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের উপর দায়িত্ব অনেক বেশী পড়ে এবং বিদ্যালয়ের ভাল আর্থিক সঙ্গতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়, কেননা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই উজ্জ্বল-বুদ্ধিসম্পন্নদের উপযোগী শিক্ষক ও পরিবেশের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়।

(৪) কোন কোন মনোবিজ্ঞানী একটা সামগ্রিক হিসাবের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'বয়সের' উপর নির্ভর করে একটা সামগ্রিক জৈবিক বয়স (organismic age) নির্ধারণ করে শিশুদের শ্রেণীকরণ করতে চান। এই ব্যবস্থায় বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভগত ও সামাজিক সমকক্ষদের মধ্যেই শিশুর শিক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও শিশুদের সামাজিক নেতৃত্বের জন্য যোগ্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এবং সম্পর্কিত শিশুদের অন্তরে অগণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠে।

(৫) বিশেষ শক্তিসম্পন্ন শিশুদের অর্থাৎ যে সব শিশু কোন বিশেষ বিষয়ে (যেমন শিল্প, সংগীত, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি) বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে

তাদের শিক্ষার জন্যও বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কখনও কখন-ও এদের পারদর্শিতার বিষয়গুলিতে পৃথক শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ শ্রেণীতে রেখে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও এদের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সুবিধা হল এই যে, পারদর্শিতার বিষয়গুলির জন্য উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হল এই যে, সামাজিক অভিযোজন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিশুরা অপটু রয়ে যায় এবং অন্যদেরও তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা সম্ভব হয় না। তাদের সম্বন্ধে অপর শিশুদের শ্রদ্ধাবান করে তোলাও এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না। ফলে তাদের সৃজনমূলক কর্মের জন্য সমাজের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া সহজ হবে না এবং তাই তাদের সৃজনীশক্তির পূর্ণ বিকাশও সহজে সংঘটিত হবে না।

(আ) শিখনে মন্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের শিক্ষা

শিখনে মন্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এতাবৎ হয়েছে। যে সব শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫ থেকে ৭০-এর মধ্যে তারা কখনও কখনও অত্যধিক চেষ্টার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের পক্ষে কিন্তু বিদ্যালয়ের বা বাইরের সাধারণ জীবনের সংগে অভিযোজন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে চেষ্টা করলে তাদের অদক্ষ শ্রমিক (unskilled labour) বা কিছুটা দক্ষ (semi-skilled) শ্রমিকের কাজ করতে সমর্থ করে তোলা যায়। সহজেই বোধ্য যে, সব শিশুকেই সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যপালনে কিছুটা দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। স্পষ্টতঃ বিদ্যালয়ের কার্যাবলীকে ও শিক্ষাপদ্ধতিকে এদের মানসিক স্তরের সংগে সংগতি রেখে নির্ধারিত করা প্রয়োজন, কেননা বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্যপরিকল্পনা এদের ঠিক উপযোগী নয়। অনেক আধুনিক বিদ্যালয়ে বৌদ্ধিক শিক্ষাসম্পর্কিত বেশীর ভাগ কাজের জন্যে শিক্ষায় মন্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের পৃথকভাবে পরিচালিত করা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তাদের অংশগ্রহণের জন্য ভাল ব্যবস্থা থাকে। ফলে তাদের সংগে তাদের যোগ্যতর সহপাঠীদের পার্থক্য খুব বেশী হয়ে উঠে না।

(৩) প্রক্ষোভগত ও সামাজিক অভিযোজনসম্পর্কিত বৈষম্য ও শিক্ষা

শিশু প্রক্ষোভের দিক থেকে পরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক বুদ্ধিরও কোন বিশেষ আভাস জন্মের পর তার আচরণে দেখা যায় না। সে নানাপ্রকারের প্রক্ষোভের সম্ভাবনা নিয়েই শুধু জন্মায়। পরিবেশের প্রক্ষোভউদ্দীপক উপাদানসমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েই সে প্রক্ষোভগত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

জন্মের পর থেকেই শিশুর আচরণ কতকগুলি মৌলিক অভাবের তাড়নায় নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই অভাবগুলির মধ্যে কতকগুলি হল আভ্যন্তরীণ অবস্থাজাত (যেমন খাদ্যের অভাব, নিদ্রার অভাব ইত্যাদি) এবং কতকগুলি হল সামাজিক সম্পর্কোদ্ভূত (যেমন পরের দৃষ্টি ও প্রশংসার জন্য কামনা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ভালবাসা ও নিশ্চয়তার কামনা ইত্যাদি)। এই সমস্ত অভাবের পরিতৃপ্তি বা অপূর্ণতা থেকে বহুপ্রকারের প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াগুলির সুষম পরিণতি থেকেই শিশুর সুষ্ঠু প্রক্ষোভগত বিকাশ ও সামাজিক অভিযোজন ঘটে।

স্বভাবতঃ প্রত্যেক শিশুর প্রক্ষোভগত ও সামাজিক আচরণগত প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল প্রত্যেক শিশুকে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উত্তম প্রক্ষোভনির্ভর মনোভাব ও সামাজিক অভিযোজন আয়ত্ত করতে সাহায্য করা। তবে বিদ্যালয়ের দ্বারা এই কর্তব্য সম্পাদন সহজ হয় না, যদি না বিদ্যালয়ের কর্মীদের, বিশেষ করে শিক্ষকদের, নিজেদেরই প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সংসাধিত হয়।

বংশধারা ও পরিবেশ

ভূমিকা

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তার কারণসমূহের আলোচনা করেছি। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণসমূহের আলোচনার সময়ে আমরা বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছি। কিন্তু কারণানুসন্ধানকে যদি শেষ স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখব যে, সমস্ত কারণের মূলে রয়েছে দুটি মৌলিক কারণ—একটি হল বংশধারা এবং অন্যটি হল পরিবেশ। মনস্তত্ত্বের পুস্তকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়ে থাকে। বিশদ পরিচয়ের জন্য তাই মনস্তত্ত্বের পুস্তকপাঠের প্রয়োজন। এই পুস্তকে স্বভাবতঃই এই বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে প্রধানতঃ এই বিষয়ের শিক্ষাসম্পর্কিত তাৎপর্যের উপর।

বংশধারা ও পরিবেশের প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক কারণের সম্মিলিত প্রভাবে। মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর বংশধারা ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব অমোঘ, কিন্তু এই প্রভাব সব সময়েই সম্মিলিতভাবে কাজ করে বলে তাদের পৃথক প্রকৃতি ও রূপ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তার উপর রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতের প্রভাব। বিশ্ব ও মানব-সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিরন্তর চলেছে। এই পরিবর্তন কখনও কখনও বিপ্লবের (অর্থাৎ আমূল পরিবর্তনের) রূপ ধারণ করে। আধুনিক কালের মত তত্ত্বপ্রধান কালে বিপ্লবের সময়ে পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা সাধারণতঃ বংশধারার সমর্থন করেন, কেননা তাঁরা অচল সামাজিক ব্যবস্থাকে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থা (natural order) বলে চালিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে, পরিবর্তন ও নূতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা সাধারণতঃ পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। কেননা তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তির সমর্থকদের উন্নততর বংশধারার অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ থাকেন। মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরাও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানুষ, তাই তাঁরাও অজ্ঞাতভাবে বা সজ্ঞানে তাঁদের

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতকে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কার্যের ফলের সংগে যুক্ত করে ফেলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এখানে সংস্কারহীন নিছক বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা আচরণ অসম্ভব। এর দ্বারা শুধু এইটুকুই বোঝায় যে, এই বিষয়ের আলোচনাকালে অত্যন্ত সাবধানতার সংগে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশেষ-ভাবে আত্মসমালোচনাপ্রবণ হতে হবে। সংস্কারহীন বৈজ্ঞানিক মনোভাব গ্রহণ করলে বর্তমান অবস্থায় বংশধারা ও পরিবেশ সম্বন্ধে নিম্নমত মন্তব্যসমূহ করা যায়।

বংশধারা ও পরিবেশের প্রকৃতি

বংশধারার প্রকৃতি

বংশধারা বলতে বোঝায় পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে থাকে সম্ভাবনা-রূপে, পরে পরিবেশের প্রভাবে তাদের পূর্ণ পরিণতি ঘটে। মাতা ও পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাগুলিকে মানুষ প্রত্যক্ষতঃ পেলেও পরোক্ষভাবে পূর্বতন পুরুষদেরও দান রয়েছে এই সম্ভাবনাগুলির উদ্ভবে। কেননা পিতা-মাতারও পিতা-মাতা ছিল এবং তাঁরা তাঁদের সম্ভাবনাগুলিকে তাঁদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন। এমনি করে স্মরণাতীত কাল থেকে বংশধারার মাধ্যমে অতীত তার কাজ 'গোপনে গোপনে' করে চলেছে।

যেহেতু বংশধারা বলতে বোঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাগুলিকে এবং যেহেতু সম্ভাবনাগুলি পরিবেশের প্রভাবেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, সেইহেতু কোন মানবীয় বৈশিষ্ট্যকেই সম্পূর্ণভাবে বংশধারার ফল বলে গ্রহণ করা চলে না। তবে প্রাণিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব এই দুই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, দেহের কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য (যেমন চোখের রং, চুল ও চামড়ার রং, মাথার খুলির আকৃতি এবং লম্বা বা বেঁটে হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি) এবং দেহ সম্পর্কিত কতকগুলি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (যেমন, অংগসঞ্চালনগত শক্তিসমূহ, বুদ্ধির স্তর ইত্যাদি) বংশধারার দ্বারা বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে

বংশধারার প্রভাব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বেশীরভাগ মনোবিজ্ঞানীদের মত হল এই যে, মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (traits), মনোভাবসমূহ (attitudes) ও আগ্রহসমূহ (interests) দৈহিক প্রভাবের উপর কম নির্ভরশীল বলে পরিবেশের প্রভাবের উপর খুব বেশী করে নির্ভর করে। কিন্তু যেহেতু মনঃ প্রকৃতি (temperament) বলতে বোঝায় মানসিক শক্তির স্তর (energy level) ও মেজাজ (mood) এবং যেহেতু এইগুলি মানুষের বিভিন্ন গ্রন্থি ও অন্যান্য দৈহিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু মনঃপ্রকৃতি তাঁদের মতে বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয় বংশধারার দ্বারা। মনোবিজ্ঞানী নিউম্যান, ফ্রিম্যান ও হলজিন্‌গার বলেছেন যে, সামাজিক মনোভাবগুলি নির্ভর করে পরিবেশের উপর, কিন্তু মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের গভীরতর দিকগুলি (deeper aspects of personality) তা করে না। গর্ডন অলপোর্টের মতে সংগতিবিধানের ক্ষমতা (adaptability), সংগ্রামীভাব (aggressiveness) এবং অস্থির ভাবের (restlessness) মত ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি খুব কমই পরিবর্তিত হয় এবং তাই মনে হয় সেগুলিও অনেকাংশে বংশধারার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক সেবাসঙ্ঘসমূহের কার্যবিবরণ, রাজনৈতিক বিপ্লবসম্পর্কিত তথ্য ও ধর্মসম্পর্কিত মানসিক পরিবর্তনের বিবরণের আলোচনা উপরের মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের উপরে সন্দেহের ছায়াপাত করে।

বংশধারার দৈহিক ভিত্তি ও কর্মপ্রকৃতি

১৯০০ সালে তিনজন জীববিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে একটি বস্তু উদ্ভাবন করেছিলেন। উদ্ভাবনটি ছিল বংশধারাসম্পর্কিত এবং এই উদ্ভাবন তাঁদের নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জন্ম নেয় নি। জন্ম নিয়েছিল গ্রিগর মেণ্ডেল নামক এক অষ্ট্রীয়ান সন্ন্যাসীর এক লেখা থেকে। ৩৪ বৎসর পূর্বে মেণ্ডেল এই বস্তুটি লিখেছিলেন। কিন্তু সেটি সংগে সংগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ সালে তিনজন বৈজ্ঞানিক এই লেখাটি একই সংগে উদ্ধার করেছিলেন এবং জগতের সামনে মেণ্ডেলের যুগান্তকারী মতবাদকে উপস্থাপিত করেছিলেন। মেণ্ডেল তাঁর বাগানে মটরের চাষ করেছিলেন। যখন তিনি শাদাফুলযুক্ত মটরের সংগে লালফুলযুক্ত মটরের সংযোগস্থাপন করেছিলেন

(mated), তখন তিনি দেখেছিলেন যে, কতকগুলি উপাদান (elements) পরবর্তী মটরের সাদা ও লাল রংকে নিয়ন্ত্রিত করত। ঐ উপাদানগুলিজাত সাদা ও লাল মটরগুলির মধ্যে বংশপরম্পরা ধরে একটা স্থির অনুপাত উৎপন্ন করত। মেণ্ডেল উদ্ভাবিত বংশধারা সম্পর্কিত সঞ্চালনের নিয়মগুলি 'মেণ্ডেলের নিয়মাবলী' (Mendel's laws) নামে প্রখ্যাত।

মেণ্ডেলের লেখার পুনরুজ্জীবনের ফলে সমগ্র জগৎ জুড়ে জীববিজ্ঞানীরা তাঁর উদ্ভাবনকে অনুসরণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য অনেকের সংগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মর্গান ও পার্ল সাহেব 'জীন' (gene) ও 'ক্রোমোসোম' (chromosome) তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বংশধারার তত্বকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। এঁরা মেণ্ডেলের অস্পষ্ট 'উপাদনের' ধারণাটির স্থানে 'জীন' ও 'ক্রোমোসোমের স্পষ্টতর ধারণা দুটি উপস্থাপিত করেছিলেন। জীনগুলি থাকে জীবদেহের মৌলিক একক (unit) কোষগুলির কেন্দ্রে এবং সেগুলি রাসায়নিক দিক থেকে প্রোটীন গঠিত অনু (protein molecules)। খুব শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমগুলি হল পুঁতির মালার মত। বিশেষভাবে বিন্যস্ত জীনসমষ্টির দ্বারাই এরা গঠিত। মানুষের জীনগুলি ৪৬টি (২৩টি যুগ্ম) ক্রোমোসোমের মধ্যে অসমভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং সংখ্যায় বোধ হয় এক হাজারেরও বেশী। ক্রোমোসোমগুলির মত জীনগুলিও যুগ্মভাবে থাকে। মানুষের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি জীনের প্রয়োজন হয় এবং যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের বেলায় এই জীনযুগ্মগুলি পৃথক প্রকৃতির হয়, সেইহেতু প্রত্যেকটি মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলিও হয় পৃথক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি যুগ্মের দুটি জীনই হয় এক প্রকারের। তখন সংশ্লিষ্টবৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু জীনগুলি পৃথক প্রকৃতিরও হতে পারে। তখন দুটি জীনের মধ্যে একটি হয়ে উঠে প্রভাবশীল (dominant) এবং অন্যটি হয় প্রভাবহীন (recessive)। ফলে প্রভাবশীল জীনের প্রকৃতি অনুযায়ীই জাত বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠে। নিষ্ক্রিয় জীনগুলি কিন্তু প্রভাবশীল না হলেও লুপ্ত হয়ে যায় না। পিতা-মাতা থেকে সেগুলি সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং সমপ্রকৃতির জীনের সংগে মিলিত হলে প্রভাবশীল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

ক্রোমোসোমযুগ্মগুলির মত জীনযুগ্মগুলিরও একটি আসে মায়ের কাছ থেকে এবং অন্যটি আসে পিতার কাছ থেকে। প্রত্যেকটি মানব-কোষের মধ্যে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকলেও পিতা-মাতার কাছ থেকে সন্তানরা ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমই (৪৬ জোড়া নয়) পায় এই কারণে যে, প্রতেকটি মাতৃ-যৌন-কোষ (ovum) ও পিতৃ যৌন-কোষের (sperm) মধ্যে ২৩টি করেই ক্রোমোসোম থাকে, দেহের অন্যান্য কোষের মত এই কোষগুলির মধ্যে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে না।

উপরে দেখা গেল যে, জীনগুলির জটিল বিন্যাস ও প্রকৃতি, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন, প্রত্যেকটি লোকের বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে, এইগুলিই হল বংশধারার একক। এদের প্রকৃতি ও সংযোগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বংশধারার সুগভীর রহস্য।

সর্বশেষে এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, সোবিয়েত দেশের জীববিজ্ঞানীরা উপরের মতাবলীর আদৌ সমর্থক নন।

(খ) পরিবেশের প্রকৃতি

যে মুহূর্তে পিতৃযৌনকোষ ও মাতৃযৌনকোষ একসঙ্গে মিলিত হয় সেই মুহূর্তেই অলঙ্ঘ্যভাবে বংশধারা নির্ধারিত হয়ে যায়। এর পরে যে কোন কিছুর প্রভাবেই ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তিত হয় তাকেই বলা হয় পরিবেশ। ভ্রূণ হিসাবে শিশু মাতৃ-জঠরের পরিবেশে বাড়তে থাকে এবং জন্মের পরে সে বাড়তে থাকে এক অতি জটিল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে। অন্য জিনিষের সংগে সে আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থিতি, গৃহ, প্রতিবেশ, খাদ্য, আর্থিক অবস্থা, বিদ্যালয়, সমাজ ও জাতি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পরিবেশই ঠিক করে দেয় কোন্ ব্যক্তি, কি শুনবে, স্পর্শ করবে, দেখবে, ঘ্রাণ করবে, আস্বাদ করবে এবং এর প্রভাবেই বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত কিম্বা দ্রুততর হয়। পরিবেশই ঠিক করে দেয় কোন্ লোক কি শিখবে, মনে রাখবে, চিন্তা করবে এবং অনুভব করবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য মানুষ (যাদের আচরণ শিশুদের অবিরত প্রভাবিত করে) হল এই পরিবেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে মনে রাখা উচিত যে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সব কিছুই কোন মানুষকে প্রভাবিত করে না।

পরিবেশের যে অংশটুকু মানুষকে প্রভাবিত করে সেই অংশটুকুই হল তার কার্যকরী পরিবেশ, আর অন্য অংশগুলি হল তার সম্ভাব্য পরিবেশ।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্থের মতে অপরিসীম সুযোগসম্পন্ন পরিবেশ ব্যক্তিগত বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে এবং অসম পরিবেশগত প্রভাব ব্যক্তিগত বৈষম্যকে কমিয়ে দিয়ে সমস্ত মানুষকে একই পরিমাপের (standard) দিকে পরিচালিত করতে পারে।

শিক্ষা হল একটি পারিবেশিক শক্তি। সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাই শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাদানকারীরা হলেন অনিবার্যভাবে পরিবেশবাদী। সূক্ষ্মভাবে দেখলে শিক্ষা হল পরিবেশের সচেতন অংশের সজ্ঞান প্রয়াস।

বংশধারা ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব

বংশধারা ও পরিবেশের প্রশ্নালোচনার প্রারম্ভেই আমরা বলেছি যে, মানবের বিকাশে এদের পারস্পরিক গুরুত্ব নিয়ে ভীষণ বাদানুবাদ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এও বলা হয়েছে যে, এই প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে অনেক বিজ্ঞানবহির্ভূত প্রভাব কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটির বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। নিম্নে সেই সবের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে প্রশ্নটির উপর বৈজ্ঞানিক আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হল।

(১) কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ

সাধারণ লোকেরা প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সমর্থক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উচ্চ বংশের 'নীল রক্তের' গুণের উল্লেখ বহুকাল ধরে করে আসছে। কিন্তু এইরূপ উক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। আধুনিক কালে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনই প্রথম সৎ বংশের রক্তের সুফলের কথা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কার্ল পিয়ার্সন্, গডার্ড, ডাগডেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা উচ্চ বংশের গুণের কথা এবং নীচ বংশোদ্ভবদের দুর্গতির কথা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছেন। এঁদের সিদ্ধান্ত কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞানীই

মানেন না। তাঁরা পরিবেশের প্রভাবের দ্বারাই এঁদের অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা করেন।

(২) অরণ্য-শিশু পর্যবেক্ষণ

অরণ্যে লালিত-পালিত মানবশিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও বংশধারা ও পরিবেশসম্পর্কিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'এভিরণের' আরণ্য শিশু, বঙ্গদেশে প্রাপ্ত অমলা ও কমলা এবং সালভাডরের (Salvador) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক মনোবিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরিবেশের প্রভাব ভিন্ন মানবশিশু প্রায় জান্তব স্তরে অবনমিত হয়। তাঁদের মতে মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাব সীমাহীন। তবে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী যে এঁদের সঙ্গে একমত নন একথা সহজেই অনুমেয়।

(৩) বানর-শিশু ও মানব-শিশু পর্যবেক্ষণ

মানব-শিশুকে বন্য অবস্থায় রাখা কঠিন বলে মনোবিজ্ঞানী কেলগ্ (Kellog) ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের শিশু-সন্তানদের সঙ্গে একটি বানর-শিশুকে মানুষ করেছিলেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন একই প্রকার পরিবেশে লালন-পালনের ফলে এদের আচরণে কতটা সমতা আসে। এদের আচরণ পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছিল যে, বানর-শিশু মানব-শিশুর চেয়ে বিকাশের পথে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়েছিল এবং তার চরম উন্নতির পর্যায়েও দ্রুতগতিতে পৌঁছেছিল, কিন্তু মানব শিশুটি ধীরে অগ্রসর হলেও ক্রমে বিকাশের উন্নততর স্তরে উন্নীত হয়েছিল। বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল যে, ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানব-শিশু বানর-শিশুর চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ এবং বানর-শিশু কখনও হাতের কাজে মানবোচিত বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারে নি।

আরণ্য শিশুদের বন্য আচরণে বন্যদের তুলনায় কম দক্ষতা এবং মানব শিশুর তুলনায় বানর-শিশুর ভাষা প্রয়োগে বিশেষ কম দক্ষতার উপর নির্ভর করে অনেক বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিকাশের সীমারেখা বংশধারাই টেনে দেয় যাকে ছাড়িয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়।

(৪) যমজ পর্যবেক্ষণ

যমজ পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে সমকোষী যমজ পর্যবেক্ষণ, আলোচ্য প্রশ্নের

উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে এই কারণে যে, সমকোষী যমজের বেলায় বংশধারা হয় এক ও অভিন্ন। সমকোষী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, পরিবেশের প্রভাব বংশধারার চেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে, সমকোষী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে একই প্রকারের আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝতে হবে যে পরিবেশের অপেক্ষা বংশধারার প্রভাব বেশী। সমকোষী যমজ ও ভিন্নকোষী যমজের তুলনা করলেও কিছুটা বোঝা যায় যে কার প্রভাব বেশী। ভিন্নকোষী যমজদের চেয়ে যদি সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল বেশী থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, এই মিলের মূলে কাজ করছে বংশধারার প্রভাব। আবার এই মিল বেশী না হলে জানতে হবে যে, বংশধারার প্রভাব তত বেশী নয়। নিম্নে কয়েকটি পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করা হল :

(১) গ্যাল্টনই প্রথমে দুইপ্রকারের যমজ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ৮০টি যমজ-যুগ্ম (সমকোষী ও ভিন্নকোষী) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিলেন যে, বংশধারার প্রভাব হল অপরিসীম।

(২) মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইকই প্রথমে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবে যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি ৫০টি যমজ-যুগ্মের উপরে এক প্রকারের মানসিক পরীক্ষা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পরীক্ষিত বিষয়সমূহে (যেমন গণিতে যোগ সম্পর্কিত সমস্যা, প্রদত্ত শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে) একই পিতামাতার সাধারণ সন্তানদের অপেক্ষা সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল অনেক বেশী। সমকোষী যমজদের পরীক্ষার ফল সাধারণ সন্তানদের ফলের চেয়ে দুই-তিন গুণ বেশী বলেই তিনি দেখেন। এই পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষতঃ বংশধারার অধিকতর প্রভাবকে সমর্থন করে।

(৩) উইংফিল্ডের সমকোষী যমজ, ডিম্বকোষী যমজ ও একই মাতা-পিতার সাধারণ সন্তানসম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল এমনিই যে, একজনের আচরণ দেখে অন্যের আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এবং ভিন্নকোষী যমজদের মধ্যে মিল যদিও এদের চেয়ে অনেক কম, তবুও সাধারণ সন্তানদের চেয়ে বেশী।

(৪) মনোবিজ্ঞানী ব্লাজ সাহেব পাঁচটি সমকোষী সন্তানের (Dionne

quintuplets) আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ ব্যক্তিত্বের গঠনে এবং আচরণিক পার্থক্যের উদ্ভবে বিশেষভাবে কার্যকরী।

(৫) নিউম্যান, ফ্রিম্যান ও হলজিন্‌গার পৃথকভাবে লালিত-পালিত ১৯ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের পরীক্ষার ফলের সংগে একই সঙ্গে লালিত-পালিত সমকোষী যমজ সন্তানদের ফলের তুলনা করে নিম্নমত তালিকা রচনা করেছেন ঃ

	একসঙ্গে লালিত-পালিত সমকোষী যমজদের মধ্যকার পার্থক্য	বিভিন্ন স্থানে পালিত সমকোষী যমজদের মধ্যকার পার্থক্য
উচ্চতা	১'৭ সেন্টিমিটার	১'৮ সেন্টিমিটার
ওজন	৪'১ পাউণ্ড	৯'৯ পাউণ্ড
বুদ্ধ্যঙ্ক (২টি পরীক্ষা)	৫ কিম্বা ৬ পয়েন্ট	৮ কিম্বা ৯ পয়েন্ট

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেহের উচ্চতা ও বুদ্ধ্যঙ্ক বিষয়ে পরিবেশের প্রভাব গড়ে তত বেশী নয়, কিন্তু ওজন বিষয়ে ঐ প্রভাব খুব বেশী। তবে পৃথক ব্যক্তির হিসেব করলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধ্যঙ্কের উপর পরিবেশের প্রভাব বেশ ভালই রয়েছে। পরিবেশগত অন্যান্য বস্তুর চেয়ে শিক্ষার প্রভাবই বুদ্ধির বিকাশের উপর অনেক বেশী। শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষাহীন দুটি সমকোষী যমজের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য উক্ত তিনজন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষায় ২৪ পয়েন্ট বলে উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

(৬) পালিত সন্তানদের পর্যবেক্ষণ

মনোবিজ্ঞানী বার্বারা বার্কস্‌ পালিত সন্তানদের সংঙ্গে পালক পিতা-মাতার সাদৃশ্য খুব কমই পেয়েছেন, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে পালিত শিশুদের সংগে তাদের পিতা-মাতার সাদৃশ্য খুব বেশী বলেই লক্ষ্য করেছেন।

পক্ষান্তরে, ফ্রিম্যান দেখেছেন যে, ভাল প্রতিপালকের বাড়ীর প্রভাব পালিত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্কের উপর যথেষ্ট।

রোজার্স ও হিলির মতে ব্যক্তিত্ব ও আচরণসম্পর্কিত সমস্যাসমূহ নূতন পরিবেশে অনেকটা সমাধানের পথে এগিয়ে যায়। তবে গুরুতর মানসিক বা শারীরিক ত্রুটি থাকলে বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয় না।

(৬) ব্যাপক পরিবেশ-পরিবর্তনের ফল পর্যবেক্ষণ

আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েলম্যান ও তাঁর সঙ্গীরা পরিবেশকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন যে, পরিবেশ যত ভাল হয় বুদ্ধ্যঙ্ক তত বেশী বাড়ে এবং পরিবেশ যত খারাপ হয় বুদ্ধ্যঙ্ক তত বেশী কমে যায়।

ওয়েলম্যান ও তাঁর সঙ্গীদের এই পরীক্ষার বহু সমালোচনা হয়েছে। টারম্যান, গুডেনাফ্ ও এণ্ডারসনপ্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষাকে নিতান্ত ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পক্ষান্তরে, অধ্যাপক পল উইটির (Paul Witty) মত মনোবিজ্ঞানী আইওয়ার মনোবিজ্ঞানীদের সমর্থনে রায় দিয়েছেন। স্পষ্টতঃ এই পরীক্ষা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন এবং তাই তর্কও অবিরত চলে আসছে।

(৭) অনাথ আশ্রমের শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ

অনাথ আশ্রমে বিভিন্ন বংশধারাযুক্ত শিশু একই পরিবেশে মানুষ হয়, কিন্তু তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক সমাজের সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতই পার্থক্যযুক্ত। এর থেকে বংশধারারই বেশী প্রভাব সূচিত হয় এমনি অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন।

(৮) একই পরিবারের সভ্যদের পর্যবেক্ষণ

৫০ টির বেশী পরিবারের সমস্ত ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হিসেব করে উড্ওয়ার্থ নিম্নমত সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন :

(১) প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের শিশুদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং পার্থক্য রয়েছে পিতা-মাতার সংগে। অর্থাৎ কারুর বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে অন্য কারুর বুদ্ধ্যঙ্কের মিল নেই।

(২) মোটামুটিভাবে অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার ছেলে-পুলে অধিকতর বুদ্ধিমান।

(৩) খুব বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তানরা পিতা-মাতার চেয়ে কম বুদ্ধিমান হয় এবং সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তানরা পিতা-মাতার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হয়।

পরিবার সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে তার সমস্ত সভ্যের বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিম্নমত মন্তব্যগুলি করা যায় :

(১) সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল সর্বাপেক্ষা বেশী (সহপরিবর্তন '৯০)।

(২) ভিন্নকোষী যমজদের মধ্যে মিল অপেক্ষাকৃত কম (সহপরিবর্তন '৭৫)।

(৩) একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে মিল আরও কম (সহ-পরিবর্তন '৫০)।

(৪) পিতামাতার সংগে সন্তানদের মিল ভাই-বোনদের মধ্যকার মিলেরই মতন (সহপরিবর্তন '৫০)।

বংশধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বংশধারা ও পরিবেশের প্রকৃতি ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধসম্পর্কে অনেক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল আমরা উপরে আলোচনা করলাম। বাইরের প্রভাব দূরে রেখে নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত জিনিসটি দেখলে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিম্নমত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছান যায় ঃ

(১) মানবের বিকাশে ও বৃদ্ধিতে বংশধারা ও পরিবেশ এই দুইয়েরই প্রভাব অমোঘ।

(২) বংশধারা নির্ধারিত করে সম্ভাবনাকে; কিন্তু পরিবেশ নির্ধারিত করে সম্ভাবনার বস্তুজগতে রূপায়নকে। সুতরাং একটি হল অপরের পরিপূরক। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন এরা মোটেই কার্যকরী হয় না।

(৩) বংশধারা ও পরিবেশের সম্পর্ক গাণিতিক যোগের সম্পর্ক নয়, বরং তা অনেকটা গুণেরই মত। ব্যক্তির বিকাশে বংশধারা+পরিবেশকে দেখা যায় না, দেখা যায় বংশধারা×পরিবেশকে। অর্থাৎ বংশধারাকে যদি কোন আয়তক্ষেত্রের (rectangle) ভূমি (base) বলে মনে করা হয় এবং পরিবেশকে মনে করা হয় উচ্চতা বলে, তাহলে ব্যক্তিকে মনে করা যেতে পারে আয়ত-ক্ষেত্রের সমগ্র ক্ষেত্র বলে।

(৪) একটি বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলতে পারি না যে, সে বংশ-ধারা কিম্বা পরিবেশের দ্বারা বেশী করে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন বলা যেতে পারে বংশধারা কিম্বা পরিবেশের প্রভাব বেশী এবং ব্যক্তিগুলি বংশধারা কিম্বা পরিবেশ কিম্বা দুইয়ের সম্পর্কেই বিষম।

(৫) সকলের পরিবেশকে সমানভাবে উন্নত করলে ব্যক্তিগত বৈষম্য দূরীভূত হয় না, বরং বাড়ে। পরিবেশের প্রভাবকে অসমভাবে বাড়িয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশকে কিছুটা চেপে রাখা যায়।

(৬) জীনগুলি হল বংশধারার বাহক। পরিবেশ বলতে সব সময়ে কার্যকরী পরিবেশকে বোঝান উচিত। পরিবেশ বহুদূর ও বহুকালব্যাপী হতে পারে।

(৭) বংশধারা পিতৃযৌনকোষ ও মাতৃযৌনকোষের মিলনের সময়েই ঠিক হয়ে যায়। পরিবেশ কিন্তু সমগ্র জীবন ধরে পরিবর্তিত হতে পারে।

(৮) বংশধারার প্রভাব দৈহিক গঠন ও দেহসম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (যেগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে), গ্রন্থিনিচয়, বুদ্ধি, মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের গভীরতর দিকগুলির উপর মনে হয় অনেক বেশী। অন্যদিকে পরিবেশের প্রভাব মনে হয় সামাজিক-নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ও দেহের ওজনের উপর খুব বেশী। কয়েকটি দৈহিক ত্রুটির বিষয় (যেগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে) বংশধারার প্রভাব পরিস্ফুট। ডাইবিটিস্ রোগটি বংশধারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয় এবং ক্যান্সার, যক্ষ্মা, এলার্জি প্রভৃতি ব্যাধির দিকে প্রবণতাও বোধহয় বংশধারানির্ধারিত।

(৯) অর্জিত গুণ সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ সঞ্চালন ঘটে। এই বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোকপাত এখনও বিশেষভাবে প্রয়োজন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই প্রশ্নটি নিয়েই খুব বেশী।

(১০) বংশধারা ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানব-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠলেও তার আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতাও অনেকটা রয়েছে। বংশধারা ও পরিবেশের প্রকৃতি জেনে সে তাদের (কিছুটা হলেও) পরিবর্তিত করতে পারে এবং তাদের সর্বোৎকৃষ্ট পরিণতির পথেও পরিচালিত করতে পারে। অবশ্য একক ব্যক্তির অপেক্ষা এইদিক থেকে মানব সমাজের সমষ্টিগত শক্তি অনেক বেশী।

বংশধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানকারীদের কর্তব্য

আমরা দেখেছি যে, বিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষাদানকার্যে অংশ গ্রহণ করে। নিম্নে

বংশধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ কর্তব্য-সমূহের আভাস দেওয়া হল ঃ

(১) মানবের বংশধারাকে জন্মের পর সরাসরি এখনও পরিবর্তিত করা যায় না। সুতরাং বংশধারার উন্নয়ন সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা 'জাতি উন্নয়ন বিজ্ঞানের' (Eugenic) অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং ঐ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানদান এবং তার সিদ্ধান্তগুলির সপক্ষে মনোভাব গঠনের মাধ্যমে এখন বংশধারা উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ করা কর্তব্য। স্পষ্টতঃ বিদ্যালয় এই কার্যে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারে।

(২) বংশধারার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার উদ্দেশ্যে সকলের জন্য যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট পরিবেশ গঠন করা উচিত। এই কার্যেও বিদ্যালয়ের অবদান সুদূরপ্রসারী হতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাংগঠনিক কার্যাবলী, পরিচালনা, পরীক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই এমনভাবে নির্ধারিত করা উচিত যার দ্বারা শিশুর মনুষ্যত্বের সাধারণ বিকাশের সংগে সংগে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সার্থক স্ফূরণ হয়।

(৩) বিকৃত বংশধারা ও পরিবেশের কুফল একটুও প্রকাশ পেলে সংগে সংগে যতদূর সম্ভব যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষা

প্রবৃত্তির স্বরূপ

প্রাণিজগতের আচরণ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই আচরণের মধ্যে অনেকটাই হল সহজাত। সহজাত আচরণের সরলতম রূপ হল প্রতিবর্তী (reflex)। চোখের কাছে কিছু আনলেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কিম্বা নাকে ঝাঁঝাল কিছু গেলেই হাঁচি হয়। এই আচরণগুলি হল প্রতিবর্তীর উদাহরণ। সহজাত আচরণের অপেক্ষাকৃত জটিল রূপ হল প্রবৃত্তি (instinct)। প্রবৃত্তির জৈবিক ধারণার (biological conception) মধ্যে দুটি জিনিস দেখা যায়ঃ (১) কোন জৈবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষভাবে কাজ করবার সহজাত প্রেরণা এবং (২) সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের জন্য এক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সহজাত দৈহিক ব্যবস্থা (innate mechanism)। পোকা-মাকড়দের মধ্যেই প্রবৃত্তির অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়। উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজাত আচরণ অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রতিবর্তীর সংগে প্রবৃত্তির প্রভেদ হল ত্রিবিধঃ (১) প্রতিবর্তীর সংগে সচেতনতা যুক্ত থাকলেও প্রবৃত্তির মত তা সচেতনতার দ্বারা চালিত হয় না (২) প্রবৃত্তিগত আচরণ প্রতিবর্তীগত আচরণের অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল, (৩) প্রতিবর্তীগত আচরণ প্রবৃত্তিগত আচরণের মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয় না। প্রতিবর্তীগত আচরণ অবশ্য কখনও কখনও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু সেই পরিবর্তনের পরিমাণ খুব বেশী হয় না।

উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রবৃত্তিগত আচরণ পরিবর্তিত হয় একথা আমরা বলেছি। তবে প্রাণীদের আচরণে বুদ্ধি অপেক্ষা প্রবৃত্তিগত প্রেরণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় সাধারণতঃ বুদ্ধিই প্রবৃত্তিগত প্রেরণাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বস্তু লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) বিশেষ কতকগুলি বস্তুকে দেখা ও তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হবার সহজাত প্রেরণা।

(২) বিশেষ বস্তুগুলিকে দেখতে পেলে বিশেষ প্রকারের কাজ করার একটা প্রেরণা।

(৩) বস্তুগুলিকে দেখার প্রেরণা ও তাদের প্রতি কিছু করবার প্রেরণার সংগে কিছুটা উত্তেজনা ও বিশেষ আকর্ষণের ভাব।

মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলির সংগে অন্যান্য প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক মনোবিজ্ঞানী মানুষের বেলায় 'প্রবৃত্তি' কথাটি ব্যবহার করতে রাজী নন। তাঁরা 'সহজাত প্রেরণা' কথাটিকে আরও উপযোগী বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রবৃত্তি কথাটিকে মূলতঃ যান্ত্রিক, বুদ্ধির দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম পরিচালিত এবং আরও সার্বিক আচরণের বেলায় ব্যবহার করা উচিত। তাঁদের এই মত আমাদের খুবই যুক্তিসহ মনে হয়।

সহজাত প্রেরণাগুলিকে চেনবার উপায়

(১) সহজাত প্রেরণাগুলিকে অতি শৈশবেই প্রায় দেখা যায়, যখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের ব্যাখ্যা করা যায় না।

(২) সহজাত প্রেরণাগুলিকে পরে দেখা গেলেও দেখা যাবে যে, তাদের সাহায্য ভিন্ন অনেক কার্য বা অনুভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

(৩) সহজাত প্রেরণাগুলির তাড়নায় মানুষ নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের বিরুদ্ধেও কাজ করে।

(৪) সহজাত প্রেরণাগুলি সম্পর্কে পিতা-মাতা কিম্বা আত্মীয়দের সংগে ব্যক্তির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

(৫) সহজাত প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে মানুষকে এমন সব কাজে উদ্বুদ্ধ করে যার প্রেরণা পরিবেশের মধ্যে নেই।

মানুষের সহজাত প্রেরণাসমূহের মধ্যে কয়েকটি

মানুষের আচরণ লক্ষ্য করলে নিম্নমত সহজাত প্রেরণাসমূহকে লক্ষ্য করা যায়।

(১) কৌতূহল ও অনুসন্ধান।

(২) ক্রোধ ও যুদ্ধপ্রিয়তা।

(৩) বিপদকে ভয় ও বিপদের কাছ থেকে পলায়ন।

(৪) রক্ষণের প্রেরণা।

(৫) যূথভাব।

(৬) আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা।

(৭) আত্মঅবনমনের প্রেরণা।

(৮) যৌন আকর্ষণ ও যৌন কর্মাবলী।

(৯) সৃষ্টির প্রেরণা।

(১০) কতক প্রকারের খাদ্য, গন্ধ ও দৃশ্যের প্রতি বিরক্তির প্রেরণা।

উপরের তালিকাটি কিন্তু সর্বজনসমর্থিত নয়। তবে প্রেরণার সহজাতভাব মেনে নিলে মনে হয় উপরের তালিকাটিকে মোটামুটিভাবে ব্যাপক বলে গ্রহণ করা যায়। এই প্রেরণাগুলির সংগে আরও কয়েকটি সহজাত প্রেরণার নাম অবশ্য করা যায়। তবে সেগুলি উপরের প্রেরণাগুলি থেকে পৃথক প্রকৃতির, কেননা তাদের উদ্দীপকসমূহ উপরের প্রেরণাগুলির উদ্দীপকসমূহের মত তত বিশেষ প্রকারের (specific) নয়

সহজাত প্রেরণা বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত সহজাত প্রেরণা সম্পর্কেও যথেষ্ট ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। বিশেষ করে এই বৈষম্য পরিস্ফুট হয় সেই সব প্রেরণার বিষয়ে যেগুলি ব্যক্তি বা জাতির অস্তিত্বের সংগে গুরুতরভাবে জড়িত নয়। এই বৈষম্যের মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে প্রকৃতিগত অভিযোজনের ত্রুটি দেখা যায়, কেননা কখনও কখনও প্রেরণাগুলিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল অবস্থায় দেখা যায়।

সহজাত প্রেরণাগুলির বিস্তৃতি

সহজাত প্রেরণাগুলির আরেকটি লক্ষণও বিশেষ দ্রষ্টব্য। সেগুলিকে প্রথমে বিশেষ উদ্দীপকসমূহের সংগে যুক্ত অবস্থায় দেখা গেলেও, পরে অনুষঙ্গের (association) প্রভাবে অন্য উদ্দীপকের সংগে যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন বেড়াল দেখে যে ভয় পেল, সে বেড়ালের আওয়াজ শুনলেও ভয় পেতে পারে। কখনও কখনও এই বিস্তৃতি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ঘটে,

যেমন, রক্ষণের প্রেরণা প্রথমে সন্তানের সম্পর্কে প্রকাশ পেলেও পরে সমস্ত প্রাণীর সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে বিস্তৃতি অনুষঙ্গের জন্য ঘটে না, ঘটে অবস্থাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যের জন্য।

অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজাত প্রেরণার পরিবর্তন

অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলি অভিজ্ঞতার প্রভাবে অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়, যদিও উচ্চ স্তরের প্রাণীদের বেলায় অভিজ্ঞতার প্রভাব কখনও কখনও বেশ প্রবল হয়ে উঠে। কোন কর্মের ফল আনন্দপ্রদ হলে তার পুনরাবৃত্তি করতে মানুষ সাধারণতঃ সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, কর্মের ফল বেদনাদায়ক হলে কর্মটির পুনরাবৃত্তিতে মানুষের প্রেরণা থাকে না। মানব-মনের এই বিশেষ ধর্মের জন্য সহজাত প্রেরণাগুলির দ্বারা উদ্দীপ্ত কর্ম শিশুবয়স থেকেই হয় পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকে, না হয় বাধাপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলি সাধারণতঃ সংহতভাবে কাজ করে বলে সেগুলি পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত ও পরিবর্তিত হয়। সামাজিক প্রথা ও নীতিশিক্ষা অনেক সময়ে কোন কোন সহজাত প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ অবদমিত করে। এই অবদমনের ফলে অবশ্য সংশ্লিষ্ট প্রেরণাগুলি লুপ্ত হয় না। তারা নানাভাবে মানবাচরণকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যেও সমাজ অনেক সময়ে সহজাত প্রেরণাগুলির পরিবর্তন সাধন করে। প্রকাশের সুযোগের অভাবেও প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে স্তিমিত প্রেরণাও অনেক সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে।

সহজাত প্রেরণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ

সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্বে যে সব মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে প্রেরণাগুলির সংখ্যা সম্পর্কে যে মতভেদ রয়েছে, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বস্তুত জেম্‌স্, থর্ণডাইক, ম্যাক্‌ড্যুগ্যাল, ফ্রয়েড্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীরা প্রেরণাগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এমন অনেক মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী আছেন যাঁরা সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্বেই কম বেশী অবিশ্বাসী। তাঁরা (পরিবেশের বিপুল প্রভাবের মাধ্যমে) মানব প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার

উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ইয়ার্কিস (Yerkes), ব্লুমফিল্ড, ডান্‌ল্যাপ্‌, ওয়াট্‌সন, উড্‌ওয়ার্থ, গর্ডন অলপোর্ট ভার্নন্‌ প্রভৃতি হলেন সহজাত প্রেরণা তত্ত্বের কম বেশী সমালোচক। রিভার্স মিড্‌, বেনেডিক্ট, লিণ্টন্‌, বোয়াজ প্রভৃতি নৃবিজ্ঞানীরাও এই তত্ত্বের ঐরূপ সমালোচক। দু-চারজন বাদ সমস্ত প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানীই মানবাচরণে পরিবেশের প্রভাবের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন। এই অবস্থায় মানবাচরণের মৌল প্রেরণাগুলি কতটা সহজাত ও কতটা পরিবেশগত তা জানা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনোবিজ্ঞানী ভ্যালেণ্টাইন, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সমালোচনাগুলির আলোচনা করে, মৌল প্রেরণাগুলি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেই সিদ্ধান্তটি খুবই যুক্তিসহ মনে হয়। তাঁর মতে যৌন প্রেরণাগুলি প্রকৃতই সহজাত এবং মানবাচরণে তাদের প্রভাব বিশেষ প্রবল। সেগুলি বিভিন্ন সমাজে মোটামুটি একই প্রকারের হয়, যদিও প্রত্যেক সমাজে এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের সম্পর্কে প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের প্রচুর পরিবর্তনও ঘটে। এই মতের সংগে উড্‌ওয়ার্থ ও অলপোর্টের (গর্ডন) সংশ্লিষ্ট মতকে যুক্ত করলে মানবের কর্মপ্রেরণা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক ধারণা গড়ে উঠে। বিখ্যাত এই মনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে মানবাচরণে (বিশেষ করে পরিণত ব্যক্তিদের আচরণে) আদিম প্রেরণা অপেক্ষা অর্জিত প্রেরণার প্রভাব বেশী। বলা নিষ্প্রয়োজন, অর্জিত প্রেরণাগুলি মানুষ পরিবেশের প্রভাবে আয়ত্ত করে।

শিক্ষা ও সহজাত প্রেরণা

সহজাত প্রেরণাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করলে শিক্ষা ক্রিয়া অনেকটা সহজে সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রেরণাগুলিকে কার্যে প্রয়োগ করলে শিক্ষাক্রিয়ায় নিম্ন প্রকারের সুবিধাসমূহের উদ্ভব হবে :

(১) প্রকৃতিবিরোধী হবে না বলে শিক্ষা অন্তর্বিরোধ গড়ে তুলবে না এবং শিক্ষার্থীর বিকাশ হবে সহজ ও অব্যাহত। বিশেষ করে, শিক্ষার্থীর দৈহিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(২) প্রকৃতির অনুকূল বলে মনোযোগ ও প্রয়াস ইত্যাদি মানসিক

প্রক্রিয়া সহজে দেখা দেবে এবং ফলে সর্বদিকের শিক্ষা হবে সহজ ও উন্নত ধরণের।

(৩) সহজাত প্রেরণাগুলির পরিকল্পিত ও সংযত বিকাশ সাধন করলে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সহজ হবে, কেননা এগুলিই হল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রাথমিক উপাদান।

তবে সহজাত প্রেরণাগুলিকে শিক্ষক যে শুধু অবিকৃতভাবে ব্যবহার করবেন তা নয়। তাদের রূপান্তর ঘটান ও পরিশুদ্ধ করাও তাঁর কাজ। সহজাত প্রেরণাগুলি মানুষের আচরণের মৌল প্রেরণা হলেও অন্য প্রাণীদের মত মানুষ এদের দাস নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এগুলি অনেকটা নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়ায় সে এদের রূপান্তর ঘটাতে পারে এবং তাই এদের বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্তও হতে পারে। অর্থাৎ অনেকটা ইচ্ছামতই মানুষ তার সহজাত প্রেরণাগুলিকে ব্যবহার করতে পারে, যা অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্ব, প্রসার ও উন্নয়নে বিশ্বাসী তাঁদের অনেকের মতে শিক্ষার একমাত্র কর্তব্য হল সহজাত প্রেরণাগুলির উন্নয়ন সাধন। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহজাত প্রেরণাকে তার আদিম জৈব উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলবিধায়ক উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করা হয়। লেখকের মতে উপরোক্ত মনোবিজ্ঞানীদের মত কেবলমাত্র আংশিকভাবেই সত্য, পূর্ণভাবে নয়, কেননা শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সহজাত প্রেরণার উন্নয়ন সাধন করা হতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শুধু সহজাত প্রেরণার উন্নয়ন সাধন নয়, আরও অনেক কিছুই করতে হয় যেমন, সহজাত প্রেরণাগুলির সংহতি সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন, নূতন প্রেরণার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন এবং বহু প্রকারের শক্তির নিয়ন্ত্রণ, সংহতি ও বিকাশ সাধন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের শক্তিনিচয়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) অংগসঞ্চালনগত শক্তিনিচয়। (২) প্রত্যক্ষণসম্পর্কিত শক্তিনিচয় ও (৩) বৌদ্ধিক শক্তিনিচয় (সাধারণ ও বিশেষ)। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মানুষের শক্তিনিচয়কে প্রথমোক্ত দুই ভাগেই ভাগ করেন। তাঁরা বৌদ্ধিক শক্তিনিচয়কে প্রত্যক্ষণসম্পর্কিত শক্তিনিচয়ের অন্তর্গত করে দেখেন।

খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা

সংস্কৃতি ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক যুগে শিক্ষাকে শিশুপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু খেলা হল শিশুপ্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ সেই হেতু আধুনিককালে শিক্ষাকে খেলানির্ভর করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু খেলার প্রকৃতি ও হেতু সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্ ও মনস্তাত্ত্বিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাই খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রকৃতি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে হলে প্রথমে খেলার প্রকৃতি ও হেতু সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। নিম্নে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

খেলার হেতুসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবলী

বড় বড় দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অনেকেই খেলার কারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকারের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। সেই সব তত্ত্বের মধ্যে যে কয়টি বর্তমানেও শিক্ষাজগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সে কয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হল।

(১) অতিরিক্ত শক্তিতত্ত্ব (Theory of Surplus Energy)

এই তত্ত্বটির প্রধান দুটি সমর্থক ছিলেন জার্মাণ কবি শিলার ও ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট্ স্পেন্সর। এই তত্ত্বানুসারে খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর অতিরিক্ত শক্তি বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। শৈশবকালে জীবনধারণের উপ-যোগী কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তি বিশেষ ব্যয়িত হয় না। তাই খেলার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত শক্তির প্রকাশ হয়।

(২) পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব (Theory of Recapitulation)

এই তত্ত্বটির আধুনিককালের প্রধান সমর্থক ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক ষ্ট্যানলী হল। হলের মতে খেলার মাধ্যমে শিশু মানব জাতির অতীতানুষ্ঠিত কর্মাবলীর পুনরাবৃত্তি করে। হল মনে করতেন যে, মানবজাতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং মানব শিশুর জীবনেও সেই সব স্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং খেলা হল একটি অতীতাভিমুখী কর্ম। তাঁর তত্ত্বের

সমর্থনে ষ্ট্যানলী হল শৈশবের কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন।

(৩) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব (Anticipatory Theory)

মেল ব্যাঙ্ক ও কার্ল গ্রুস্ ছিলেন এই তত্ত্বের দুটি বিখ্যাত সমর্থক। এই তত্ত্বানুযায়ী খেলার মাধ্যমে শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। এই তত্ত্বে সমর্থকরাও কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। স্পষ্টতঃ এই তত্ত্বের অনুযায়ী খেলা হল ভবিষ্যৎমুখী।

(৪) বিরেচন তত্ত্ব (Cathartic Theory)

এই তত্ত্বটির অতি প্রভাবশীল আধুনিক সমর্থক হলেন মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড্ ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁদের মতে খেলার মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছাগুলি আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং রুদ্ধ কামনার এই প্রকাশ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়ক হয়।

(৫) নবায়ন তত্ত্ব (Theory of Recreation)

এই তত্ত্বটির সর্বাপেক্ষা নামকরা সমর্থক হলেন ল্যাজেরাস্। এই তত্ত্বানুযায়ী খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণী তার ব্যয়িত শক্তির পরিপূরক শক্তি লাভ করে।

(৬) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব (Rivalry Theory)

এই তত্ত্বটির প্রবর্তক হলেন মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগ্যাল। তাঁর মতে খেলার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবৃত্তির মূল কথা হল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা, তাকে ধ্বংস করা নয়।

(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি তত্ত্ব (Theory of Overflowing Vital Energy)

এই তত্ত্বানুযায়ী খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর উপছিয়ে পড়া প্রাণশক্তি প্রকাশ করা। সাধারণতঃ প্রাণশক্তি সহজাত প্রেরণার (instinct) খাতে প্রবাহিত হয়, কিন্তু যখন তা ঐ খাতে প্রবাহিত না হয়ে উপছিয়ে পড়ে, তখন খেলার মধ্য দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে।

খেলার তত্ত্বাবলীর মূল্যায়ন

(১) অতিরিক্ত শক্তিতত্ত্ব

এই তত্ত্বটি সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। এর প্রথম দোষ হল এই যে, এই তত্ত্ব

খেলার একটি অতিমাত্রায় যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দান করে এবং এটির দৃষ্টি খেলার শারীরিক দিকের প্রতিই নিবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রান্ত ও অসুস্থ ব্যক্তির খেলার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়।

(২) পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব

এই তত্ত্বটির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও এটি ত্রুটিযুক্ত। এর প্রথম ত্রুটি হল এই যে, এটির ভিত্তিতে রয়েছে কল্পনা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। আধুনিক বিজ্ঞান পুনরাবৃত্তিবাদকে সমর্থন করে না। দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব অতীতের প্রভাবকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের অপেক্ষা মানব জীবনে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ এই তত্ত্বে পরিবেশকে বংশধারা অপেক্ষা শিশুর জীবনে অনেক কম কার্যকরী বলে মনে করা হয়েছে।

(৩) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব

এই তত্ত্বটির মধ্যে সত্য অনেকাংশে থাকলেও এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। খেলার মধ্য দিয়ে সত্যই শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে এবং সেই বিকাশ ভবিষ্যতের কাজে লাগে। তথাপি ভবিষ্যতের দ্বারা বর্তমান পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এই ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়।

(৪) বিরেচন তত্ত্ব

এই তত্ত্বটিও ত্রুটিযুক্ত। খেলার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই অবদমিত প্রবৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু খেলার কাজ শুধু তাই নয়। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্য দিয়ে সে সাধারণভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতও হয়। খেলা অন্যান্য কাজও করে।

(৫) নবায়ন তত্ত্ব

এই তত্ত্বটিও আংশিকভাবে সত্য, কেননা এর দ্বারা সর্বপ্রকারের খেলার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব শুধু এক প্রকার খেলার প্রকৃতি উদ্ঘাটনেই সাহায্য করে।

(৬) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব

এই তত্ত্বটির দ্বারাও খেলার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত প্রকারের খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয় এবং খেলার কাজও শুধু প্রেরণার প্রকাশ সাধন নয়।

(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি তত্ত্ব

এই তত্ত্বটিও খেলার পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করতে সমর্থ নয়, কারণ খেলার মধ্য দিয়ে অবদমিত প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি ঘটে এবং খেলা শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশেরও প্রধান উপায়স্বরূপ।

(৮) ক্ষমতালাভের ইচ্ছানির্ভর তত্ত্ব

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে শৈশবের সর্বাপেক্ষা বড় অন্তঃপ্রেরণা হল ক্ষমতা-লাভের ইচ্ছা এবং খেলার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালাভের এই ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করে।

এই মতটিও পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। খেলার মধ্য দিয়ে শুধু শক্তি-লাভের ইচ্ছা প্রকাশ পায় একথা ঠিক নয়। এই তত্ত্বের দ্বারা সর্বপ্রকারের খেলার ব্যাখ্যা স্পষ্টতঃ অসম্ভব।

(৯) সক্রিয়তার তত্ত্ব (Activity Theory)

ফ্রোয়েবেল ও ডিউই দু রকম ভাবে এই মতের সমর্থন করেছেন। ফ্রোয়েবেলের মতে জীবনের মূল কথা হল আত্মসক্রিয়তা। এই আত্মসক্রিয়তার সাহায্যেই শিশু আপন সত্তাকে প্রকাশ করে ও বিকশিত করে। নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করে কিম্বা বাইরের জগতের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং এদের দুটিকে মিলিত করে। শৈশবে খেলা হল আত্মসক্রিয়তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রকাশ। সুতরাং এই স্তরে খেলার মাধ্যমেই শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ ঘটে। জন ডিউইর মতে জীবনের মূল কথা হল সক্রিয়তা এবং শৈশবে এই সক্রিয়তা খেলার মাধ্যমেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। তাঁর বিশ্বাস খেলারূপ সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে। তিনি বলেন, বিকাশের ধারাপথে জীবনের মৌল সক্রিয়তা খেলা ও কাজ এই দুটি রূপে প্রতিভাত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, জন ডিউই ফ্রোয়েবেলের আত্মসক্রিয়তার ধারণাকে ও তাঁর খেলার আধ্যাত্মিক সংব্যাখ্যানকে গ্রহণ করেন নি।

খেলার এই তত্ত্বটি অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। কেননা তত্ত্বটির মধ্যে সক্রিয়তার মাধ্যমে জীবনের যে বিকাশের কথা বলা হয়েছে সেটি একটি মৌল সত্য এবং খেলা যে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সক্রিয়তার প্রধান রূপ সে কথাও অভ্রান্ত। তবে সক্রিয়তা তত্ত্বের ফ্রোয়েবেলপ্রদত্ত রূপটি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তার অতিপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয়তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর নয়।

সিদ্ধান্ত

উপরে দেখা গেছে যে, সক্রিয়তা তত্ত্বটিই (ডিউইর সমর্থিত রূপে) হল সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই তত্ত্বটির সংগে অন্যান্য তত্ত্বের সত্য অংশগুলির মিলনও সহজেই ঘটে। বস্তুতঃ এটা বোঝা খুব কঠিন নয় যে, খেলারূপ সক্রিয়তার মাধ্যমে অতিরিক্ত শক্তির প্রকাশ ঘটতে পারে, উচ্ছলিত জীবনশক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে, অবদমিত প্রেরণাগুলি বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ পেতে পারে, নূতন শক্তি লাভ করা যেতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা প্রকাশ পেতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য সাধারণ প্রস্তুতি ঘটতে পারে এবং শক্তিলাভের ইচ্ছাও চরিতার্থতা লাভ করতে পারে।

খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলী

খেলার কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলির আলোচনার সময়ে আমরা খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলীর সংগেও কিছুটা পরিচয় লাভ করেছি। এখন আরও ভাল করে আমরা খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলীর আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

শৈশবের প্রধান লক্ষণ হল খেলা। সুতরাং শিশুশিক্ষার সংগে যাঁদের সম্বন্ধ তাঁদের খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে খেলার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কাজের কিছুটা পরিচয় সংক্ষেপে সূত্রাকারে দেওয়া হল ঃ

(১) খেলা শৈশবের একটি সার্বিক আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য। এই জন্য কেউ কেউ বলেছেন, শৈশব ও খেলার সময় হল সমার্থক ('childhood is play-hood')।

(২) খেলা হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলার জন্য শিশুকে তাড়না করতে হয় না। শিশু নিজের অন্তরের তাগিদেই খেলা করে।

(৩) খেলা হল একটি আনন্দপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বলেই খেলার মধ্য দিয়ে শিশু প্রচুর আনন্দ লাভ করে।

(৪) খেলা হল একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া। স্বতঃস্ফূর্ততা খেলার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য বলে খেলা একটি স্বাধীন প্রক্রিয়াও বটে।

(৫) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাণশক্তির সর্বাপেক্ষা সার্থক বিকাশ ঘটে।

(৬) শিশুর কর্মলিপ্সা খেলার মধ্য দিয়েই মুখ্যতঃ তৃপ্ত হয়।

(৭) খেলার মাধ্যমে শিশুর সৃজনীশক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পায়।

(৮) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত প্রেরণা ও ইচ্ছাগুলির ক্ষতিহীন প্রকাশ ঘটায় এর মাধ্যমে তার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়।

(৯) খেলার মাধ্যমে সাধারণভাবে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি সংসাধিত হয়।

(১০) খেলার সাহায্যে পরিশ্রান্ত মনের নবায়ন সম্ভব হয়।

(১১) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ হয়।

(১২) খেলার মাধ্যমে শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর দেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের, বুদ্ধির, সামাজিকতার, নীতিবোধের এবং সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির যুগপৎ বিকাশ খেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়, কেননা খেলার মধ্যে এই সব-কিছুরই প্রয়োগ সম্ভব হয়।

(১৩) উন্নততর প্রাণীরাই বেশী সময় ও বেশী প্রকারে খেলে।

(১৪) খেলা নানাপ্রকারের হয় এবং খেলার প্রকৃতিও শিশুর বিকাশের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়।

(১৫) খেলা ও কাজের মধ্যকার প্রচলিত সংঘাতে প্রতিফলিত হয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্তর্সংঘাত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং স্বাধীনতা ও আনন্দবর্জিত হওয়ায় কাজ ও খেলার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমাজে কাজ ও খেলা দুই-ই তাদের আসল প্রকৃতির অনেকটা হারিয়েছে, কাজ হারিয়েছে তার আনন্দ এবং খেলা হারিয়েছে তার উচ্চাংগের সৃজনক্ষমতা।

(১৬) বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে খেলার মধ্যে শিশুর সমগ্র সত্তা প্রকাশ পায়।

(১৭) শিশুর খেলার মধ্যে ক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রমিক ধারা অনুসরণ করে বোঝা যায় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ঠিকভাবে ঘটছে কিনা।

(১৮) খেলার মাধ্যমে শিশুর আচারণিক ক্রটি সংশোধন করা যায় এবং মানসিক চিকিৎসাও করা যায়।

(১৯) খেলার মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটে।

(২০) খেলা সর্বরকমের মানুষের আচরণেরই একটি বৈশিষ্ট্য, যদিও শৈশবেই তার প্রকাশ সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়।

(২১) খেলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে ফুটে উঠে।

(২২) ছেলে ও মেয়েদের খেলার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় দেখা যায়।

খেলার বিভিন্ন প্রকার

খেলা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটে। তবুও সব খেলার মধ্যেই শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ কিছুটা ঘটে, যদিও কোন কোন দিকের বিকাশ কোন কোন খেলার মধ্যে বিশেষভাবে সাধিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের খেলার পরিচয় দেওয়া হল।

(১) দেহব্যবহারকারী খেলা

ঝাঁপাঝাঁপি করা, বেড়ানো, ডিগবাজী খাওয়া, দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদি খেলা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। যদিও এই জাতীয় খেলার প্রাদুর্ভাব দুই-তিন বছরের ছেলের মধ্যেই বেশী হয়, তবুও সমগ্র শৈশবকালেই এদের দেখা যায়। এই সব খেলার সময়ে শিশুর কোন সচেতন উদ্দেশ্য থাকে না। শুধু আনন্দের জন্য তারা এইসব খেলায় লিপ্ত হয়। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলেও এই খেলাগুলি অর্থহীন নয়, কেননা এদের মধ্য দিয়েই শিশু প্রকৃতির বিকাশের পরিকল্পনায় আপনার স্থান করে দেয়। এইসব খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও স্নায়ু-পেশী সংযোজন (neuro-muscular co-ordination), সংসাধিত হয় এবং নিজ গতিবিধির উপর তার নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) নির্মাণমূলক ও ধ্বংসমূলক খেলা

সৃষ্টির ইচ্ছা শিশুদের মধ্যে খুব প্রবল, তাই নির্মাণমূলক খেলা শিশুদেব আচরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নানাপ্রকারের বস্তুর সাহায্যে শিশু তার সৃষ্টির ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে। এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশু হাতের দক্ষতা অর্জন করে, বস্তুজগৎকে আয়ত্তে আনে, বস্তুজগতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়।

ধ্বংসমূলক খেলাও শৈশবে দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই খেলা আসলে ধ্বংসমূলক বলে মনে হয় না। বস্তুনিচয়ের সংগে পরিচিতিই সাধারণতঃ এই খেলার মর্মকথা বলে মনে হয়। সুতরাং এগুলি আসলে সৃজনধর্মী।

(৩) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক খেলা

শিশু খেলার মধ্য দিয়ে নানাপ্রকারের বস্তু নেড়ে চেড়ে দেখে এবং পরীক্ষা করে। বিশ্বের বস্তুনিচয়ের রহস্যোদ্ঘাটনই হল এই প্রকার খেলার মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বিশ্বের বস্তুনিচয়ের সংগে এই পরিচিতি তাদের আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে।

(৪) নাটকীয় ও অনুকরণমূলক খেলা

ছেলেরা একটু বড় হলে এই জাতীয় খেলায় বেশীর ভাগ সময় কাটায়। এই খেলায় শিশুরা নানাপ্রকারের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই খেলায় জটিল অভিযোজন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর প্রেরণা, ইচ্ছা ও প্রক্ষোভগুলি সহজেই প্রকাশপথ খুঁজে পায়। সুতরাং এই জাতীয় খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে অনেক কিছু করা যায়। এই জাতীয় খেলাকে কল্পনামূলক খেলাও বলা হয় এবং এর সংগে পরীক্ষামূলক খেলার সম্পর্কও খুব নিবিড়। প্রায়ই শেষোক্ত খেলার সংগে একে যুক্তভাবে দেখা যায় এবং একটির স্থানে অন্যটি প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়।

খেলা ও কাজ

খেলার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে নির্ধারণ করতে গেলে কাজের সংগে তার তুলনা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাজ ও খেলার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্ ও মনস্তাত্ত্বিকরা ঠিক একমত নন। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে কয়েকজনের সংশ্লিষ্ট মতের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল ঃ

(১) ড্রেভারের মত

মনস্তাত্ত্বিক ড্রেভারের মতে খেলার মূল্য খেলার মধ্যেই নিহিত, কিন্তু কাজের একটা বাইরের উদ্দেশ্য সবসময়েই থাকে। অর্থাৎ তাঁর মতে খেলার উদ্দেশ্য হল খেলা করা, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য শুধু কাজ করা নয়। কাজের উদ্দেশ্য হল কোন বস্তু উৎপাদন করা বা লাভ করা।

(২) ডাঃ হ্যারিসের মত

ডাঃ হ্যারিসের মতে খেলার মধ্যে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশীকে পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু কাজের মধ্যে মানুষ সমাজের কোন সাধারণ প্রয়োজনের কাছে

আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ কাজ হল সমাজের প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া, কিন্তু খেলা হল ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের উপায়স্বরূপ।

(গ) জন ডিউয়ই মত

ডিউইর মতে খেলার সংগে কাজের মিলও আছে, আবার পার্থক্যও আছে। কাজের সংগে খেলার মিল এইখানে রয়েছে যে, দুয়েরই উদ্দেশ্য আছে। দুয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে এই খানে যে, কাজের মত খেলার লক্ষ্য নেই জীবিকার্জনের দিকে, কাজের মত খেলা দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং কাজের মত তা কোন বস্তুগত ফলের দিকে অগ্রসর হয় না।

(ঘ) ব্র্যাড্‌লী ও পার্শি নানের মত

পার্শি নান্ ব্র্যাডলির মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, খেলা ও কাজের মধ্যকার পার্থক্য হল খুব সীমিত। কোন কর্মকে মানুষ যদি স্বেচ্ছায় করতে পারে, কিম্বা ত্যাগ করতে পারে, কিম্বা তার সংশ্লিষ্ট অবস্থাসমূহকে পরিবর্তিত করতে পারে, তাহলে সেই কর্মটি হল খেলা। কিন্তু কোন কর্মকে যদি অপরিহার্যভাবে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিম্বা যদি কর্তব্যবোধে বা পেশাবোধে কেউ কোন কর্ম করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা হল সেই ব্যক্তির পক্ষে কাজ।

সিদ্ধান্ত

খেলার সংগে কাজের **মিল** হল নিম্নরূপ :

(১) খেলা উদ্দেশ্যমূলক, কাজও উদ্দেশ্যমূলক।

(২) খেলা ও কাজ দুয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের নির্বাচন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

(৩) কিছুটা সময় দুয়ের জন্যই প্রয়োজন হয়।

খেলা ও কাজের মধ্যকার **পার্থক্য** হল নিম্নরূপ :

(১) খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য হল বহিরাগত।

(২) খেলা অপেক্ষা কাজে অনেক বেশী সময় খরচ হয়।

(৩) খেলার মধ্যকার স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ, সহজ আগ্রহ, আভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা, স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ ইত্যাদি কাজের মধ্যে অনুপস্থিত।

(৪) খেলায় ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু কাজের মধ্যে সমাজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন প্রবল।

সর্বশেষে পুনরায় বলা প্রয়োজন যে, কাজ ও খেলার মধ্যকার এই আংশিক দ্বন্দ্ব তাঁদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে উদ্ভূত হয় নি। এই দ্বন্দ্বের মূল রয়েছে আজকের সমাজে। এই সমাজে কাজ স্বনির্বাচিত নয় বলে তা স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও সৃজনীশক্তিবিহীন এবং খেলা (বিশেষ করে বড়দের বেলায়) শুধু অপ্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত বলে তা প্রধানতঃ চাপল্য ও খামখেয়ালী ভাবের প্রকাশস্থল হয়ে উঠেছে। কোন সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থায় খেলা ও কাজের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। সেইরূপ ব্যবস্থায় জীবন হয়ে উঠে স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও সৃজনীশক্তিতে ভরপুর।

শিক্ষায় খেলার পদ্ধতি

আমরা দেখেছি যে, খেলা হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীন, সৃজনীশক্তিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ কাজ, যে কাজের উদ্দেশ্য বহিরাগত নয় এবং যে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সমগ্র সত্ত্বা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগের শিক্ষায় খেলার পদ্ধতিকে অনুসরণ করবার কথা উঠেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই দিকে বহু প্রয়াসও হয়েছে। কল্ডওয়েল কুক-ই (Caldwell Cook) অবশ্য প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে 'খেলার পদ্ধতি' ('play-way') কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই কথার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার মর্মকথা অনেকটা ফুটে উঠেছে।

আধুনিক শিক্ষাজগতে যে সব নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে (যেমন 'প্রোজেক্ট পদ্ধতি', 'ড্যাল্টন প্ল্যান্', 'ডেন্‌ভার প্ল্যান্' ইত্যাদি), সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্যার জন অ্যাডামস্ দেখিয়েছেন যে, সে সবগুলিরই মর্মকথা হল শিশুর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ সবগুলিই হল শিশুকেন্দ্রিক। যেহেতু শিশুচরিত্রের মূল কথা হল ক্রীড়াশীলতা, সেইহেতু এ কথাও খুব যৌক্তিকতার সংগেই বোধ হয় বলা যায় যে, আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক সমস্ত ক্রিয়াকলাপই হল মূলতঃ খেলানির্ভর, অর্থাৎ খেলার মৌল সত্ত্বা সকলেরই মধ্যেই বর্তমান।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, খেলায় মৌল সত্ত্বার অনুপ্রবেশের ফলে শিক্ষাকার্য স্নায়ুহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। স্বেচ্ছাপূর্ণ, স্বাধীন

ও আনন্দপূর্ণ কার্য বলে খেলা বা খেলাজাতীয় কাজে কঠিন প্রয়াসের অভাব হয় না বা চারিত্রিক দৃঢ়তাও খর্ব হয় না। পক্ষান্তরে, নিরানন্দ ও স্বাধীনতা-বর্জিত কর্মে সৃজনীশক্তি প্রকাশ পায় না এবং যে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জিত হয় সেও হয় সাধারণতঃ প্রাণহীন ও মানবতাবর্জিত।

শিক্ষায় খেলার সত্ত্বার সার্থক অনুপ্রবেশের উপায়সমূহ

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান। তাই শিক্ষায় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ মূল্য স্থাপন। যেহেতু শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খেলা, সেইহেতু শিক্ষায় গণতন্ত্র বলতে বোঝায় অনেকাংশে শিক্ষাকে খেলানির্ভর করে তোলা। শিক্ষাকে খেলানির্ভর করার অর্থ হল খেলার মৌল সত্ত্বার দ্বারা সমস্ত শিক্ষাকর্মকে অভিষিক্ত করা, অর্থাৎ শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ইত্যাদি সব কিছুকেই তার বয়স, শক্তি প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষাকে খেলানির্ভর করে তোলবার আধুনিক প্রচেষ্টার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ঐ সব প্রচেষ্টা কিরূপে সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

(১) শিক্ষার লক্ষ্যকে শিশুর বয়স, শক্তি, প্রবণতা ও আগ্রহ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

(২) পাঠক্রমকেও শিক্ষার লক্ষ্যের মত শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অর্থাৎ পাঠক্রম হবে আনন্দপূর্ণ বিচিত্র কর্মের সমষ্টি।

(৩) শিক্ষার পদ্ধতি হবে আনন্দপূর্ণ কর্মনির্ভর। অর্থাৎ শিখন হবে আনন্দপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে (learning through joyful living)।

(৪) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও উপকরণসমূহকে বিচিত্র আনন্দপূর্ণ জীবনের পূর্ণ সহায়করূপে গড়ে তুলতে হবে।

(৫) বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা হওয়া উচিত যতদূর সম্ভব অন্তর্জাত। আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালবাসার ভিত্তিতেই একে গড়ে তোলা উচিত। বিদ্যালয়-জীবনে আত্ম-শাসন তত্ত্বের প্রয়োগ যতদূর সম্ভব করা উচিত। যোগ্য শিক্ষণপদ্ধতির মধ্য দিয়েও অন্তর্জাত নিয়মানুবর্তিতার উদ্ভব হয়।

(৬) বিদ্যালয়ের সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিশুপ্রকৃতি ও শিশুজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা বিদ্যালয়ের সব কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠা উচিত।

খেলার পদ্ধতির সীমারেখা

গণতান্ত্রিক শিক্ষায় খেলার সত্তার অনুপ্রবেশের ও খেলার পদ্ধতির প্রয়োগের উপযোগিতার কথা উপরে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, অতি শৈশব (babyhood) ভিন্ন অন্যান্য স্তরে গঠনমূলক (ও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী) খেলার সত্তা ও পদ্ধতিকেই শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় এবং উচিতও। অতি শৈশবের ক্ষণস্থায়ী খেলা ঐসব স্তরের শিক্ষাকে বিশেষ কিছু দান করতে পারে না। তারপর জগৎ যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, বোধ হয় বহুকাল ধরেই মানব-সমাজে কিছু কাজ থাকবে যা খেলার মত আনন্দদায়ক হবে না বা স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশের অত সহায়ক হবে না এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছু শিখনের ক্ষেত্র থাকবে যা খেলার মত সৃজনমূলক, আনন্দপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সহায়ক হবে না। বলা বাহুল্য, ঐরূপ কাজ বা শিখনের ক্ষেত্র খেলার সত্তার জয়ের সীমারেখা টেনে দেবে। তবে জীবন ও শিক্ষার প্রগতিবাদীদের সর্ব সময়ের কর্তব্য হচ্ছে খেলার সত্তাকে যতদূর সম্ভব জয়ী করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কেননা খেলা হল মুক্ত জীবন ও শিখনের প্রকাশস্থল।

শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র
রানীপুর
পো: বৈগাছি, ২৪ পরগণা

শিক্ষার নবতম ধারাসমূহ

নিত্যপরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই স্থাণু নয়। তাই শিক্ষাজগতেও অবিরত পরিবর্তন ঘটছে। তবে সব সময়ে পরিবর্তন মৌলিক বা গুণগত (qualitative) হয় না, অনেক সময়ে হয় তা শুধু পরিমাণগত (quantitative)। আধুনিক যুগে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক যুগে) শিক্ষাজগতে যে সব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলিকে আমরা মোটামুটি দুটি স্তরের অন্তর্গত করে দেখতে পারি—এক হল ব্যক্তিনির্ভর স্তর, অন্যটি হল সমাজনির্ভর স্তর। রুশোর সময় থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর স্তরই বলবৎ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজ-নির্ভর স্তর। গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রথম স্তরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হত শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশের উপর এবং এর দ্বিতীয় স্তরে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা সুরু হয়েছে সামাজিক পটভূমিকায় শিশুর, বিকাশের উপর। গণতান্ত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু এই পরিবর্তন অবশ্য আসে নি, এসেছে সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে। এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মৌল পরিবর্তনের ফলে। গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আর শুধু ব্যক্তিনির্ভর নয়, সংহত সামাজিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ সে টিঁকে রয়েছে এবং এই প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করেই তার বিকাশও ঘটছে।

গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এই স্তরের আর একটি প্রধান লক্ষণ হল তার সমন্বয়ী মনোভাব। বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সভ্যতার প্রয়াসের সংগে পরিচিতির ফলে বর্তমান সময়ে সমন্বয়ী মনোভাব ও প্রচেষ্টা বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই সমন্বয়প্রচেষ্টা বর্তমানে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিক জগতের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সমন্বয় প্রচেষ্টার দ্বারা যে পরিবর্তিত হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞাননির্ভর। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, মনোভাব ও পদ্ধতি আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল। তাই স্বভাবতই শিক্ষা-ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। সুতরাং **বিজ্ঞান-**

নির্ভরতা হল আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ।

আজকের জগতে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকলেও সমস্ত জগৎ ও মানব সমাজ এক হওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক মনোভাব সমাজবিকাশের এই স্তরে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রেও এই **আন্তর্জাতিক মনোভাব বিশেষ প্রভাবশীল হয়ে উঠেছে।**

বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন অবিরতই চলেছে এবং তাই মানুষের **মনোভাবও পরীক্ষা ও পরিবর্তনমুখী হয়ে উঠেছে।** শিক্ষাক্ষেত্রেও এই মনোভাব বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আধুনিক জগতে **ভাববাদী দর্শন ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীয়মাণ হয়ে উঠেছে।** শিক্ষাক্ষেত্রেও আধুনিক জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান মানুষের শক্তিকে আধুনিক যুগে অনেকটা বাড়িয়ে তোলায় সমগ্র জীবনের প্রতিই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে গেছে। মানুষ আজ প্রকৃতি ও মানব-জীবনকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে চায়। ফলে কর্মের উপর খুব জোর পড়েছে এবং জীবনের প্রতি **দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে কর্ম-নির্ভর (activistic) এবং সংগ্রামী (aggressive)।** শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাননির্ভর জড়বাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাবে মনের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন্তর্হিত হতে চলেছে। ফলে বৌদ্ধিক দিক ভিন্ন মানবসত্তার অন্যান্য দিকের প্রতিও সমান দৃষ্টি পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের প্রতিফলন **দেহের উপর এবং প্রয়াসগত ও প্রক্ষোভগত দিকগুলির উপর গুরুত্ব স্থাপনের** মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘাতের সম্ভাবনাও শিক্ষার্থীদের দেহ ও অন্যান্য দিকগুলির চর্চার দিকে শিক্ষাবিদ্‌দের বিশেষভাবে প্রণোদিত করছে।

সাধারণ সামাজিক জীবনে পরিকল্পনার ধারণার প্রসারের ফলে বিদ্যালয়েও **শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের পরিকল্পিত বিকাশের দিকে ঝোঁক** পড়েছে।

কেন্দ্রীয় ও মুখ্য শিক্ষাদানকারী সংস্থা হিসাবে **বিদ্যালয়ের কর্ম-পরিধি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে।** শিক্ষাদানকারী অন্যান্য সংস্থার কর্মপরিধির সঙ্কোচনের ফলে এই দিকে প্রবণতা বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে।

আধুনিক জীবনের জটিলতার জন্য মানবিক অভিযোজনও খুব জটিল ও কঠিন হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় জীবনের সংগে গভীর যোগসাধন বিদ্যালয়ের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। **আজকের বিদ্যালয় তাই জীবনের সংগে নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ।** বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের জীবন বাইরের জীবনের সংগে এর পূর্বে কখনও এই প্রকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেনি।

জীবনের সংগে বিদ্যালয়ের নিবিড় সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে **স্থানীয় সমাজের সংগে শিক্ষার যোগ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে।**

আজকের জীবনের জটিলতার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই **মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিদ্যালয়কে অনেক বেশী লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে।**

দ্রুতপরিবর্তনশীল আধুনিক জীবনের সংগে সমতালে চলবার জন্য **বিদ্যালয়েও অবিরত পরিবর্তন** সংঘটিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন শিক্ষার লক্ষ্য থেকে সর্বদিকেই আত্মপ্রকাশ করছে।

জীবনের অর্থনৈতিক দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান জগৎ বিশেষ অবহিত হওয়ায় **অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে।**

বিজ্ঞাননির্ভর সমাজে অবসরের অধিকতর সুযোগ হওয়ায় এবং আরও বেশী সম্ভাবনা থাকায় **অবসরের জন্য বিশেষ শিক্ষার উপরও বর্তমানে জোর দেওয়া হচ্ছে।**

গণতান্ত্রিক আদর্শের অধিকতর ব্যাপ্তির ফলে জীবনে সাধারণ সুযোগের সংগে **শিক্ষার সুযোগের সমতার উপরও** বর্তমানে বিশেষ **জোর দেওয়া হচ্ছে।**

বাইরের জীবন বহুবিচিত্র হয়ে উঠায়, **বিদ্যালয়ের জীবনও বহুবিচিত্র হয়ে উঠেছে।**

আধুনিক শিক্ষার কর্মপরিধি ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাওয়ায় **শিক্ষকের কর্মের গুরুত্বও অনেক বেড়ে গেছে।** সার্থক শিক্ষককে আজ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে হবে। আরও হতে হবে মানব-প্রেমিক ও বিশেষ করে শিশু-প্রেমিক। এই কারণে শিক্ষকতার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়ে উঠছে।

* * * *

উপরের ধারাগুলি শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (অর্থাৎ প্রকৃতি, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকের দায়িত্ব ইত্যাদিতে) কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আমরা যথাস্থানে দেখেছি।

মহান্ শিক্ষানায়কদের অবদানসমূহ

Jean Jacques Rousseau

(ক) রুশো (১৭১২—১৭৭৮)

মানব সভ্যতায় রুশোর অবদান সম্পর্কে দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ করা হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে যে, রুশো ছিলেন গণতান্ত্রিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ, নূতন জগতের জনক, মহান্ ফরাসী বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা, নূতন চিন্তা-ভাবনার বহুদিকের দিশারী এবং শিক্ষাজগতের কেপোর্নিকাস্। অন্য দিকে বলা হয়েছে যে, রুশো ছিলেন দুশ্চরিত্র অসাধু চিন্তানায়ক, বাস্তব অভিজ্ঞতা-বর্জিত অসংলগ্ন চিন্তার জনক, বল্গাহীন রোমাণ্টিক্ এবং শিক্ষাজগতের কুগ্রহ। কিন্তু এই দুই প্রকার মতই আতিশয্যদোষযুক্ত। তবে রুশোর অবদানের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উপাদানের প্রাচুর্য দেখা যায় এবং সেই কারণেই উপরোক্ত বিরোধী মত দুটি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রথম মতটির মধ্যেই সত্য বেশী রয়েছে। একথা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনদোষযুক্ত যে, রুশো ভিন্ন ফরাসী বিপ্লব সম্ভব হত না। এ কথাও সত্য যে, রুশোর গণতান্ত্রিক চিন্তার মূলসূত্র ছিল তাঁর পূর্বতন ও সমসাময়িক গণতান্ত্রিক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে এবং তাঁর সমস্ত চিন্তায় অভিজ্ঞতার ছাপ ও যাথার্থ্যের অভাব যথেষ্ট ছিল। আবার এ কথাও সত্য যে, রুশোর উচ্ছল রোমাণ্টিকতার প্রভাবে সাহিত্যে ও শিল্পে অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা ও কল্পনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল এবং শিক্ষাজগতে তাঁর অপেক্ষাকৃত চিন্তাহীন অনুবর্তীরা বহু উদ্ভট পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছিল। তথাপি এ কথা মূলতঃ সত্য যে, রুশো ছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পথিকৃৎ, মহান ভাবুক ও স্বপ্নদ্রষ্টা, জীবনের বহুক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রভাবশীল চিন্তানায়ক এবং নূতন শিক্ষার ভাগীরথী ধারার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। আমরা এখানে রুশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবদানের সংগেই সম্পর্কিত। সুতরাং নিম্নে তাঁর এই দিককার অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রধানতঃ পাঁচটি গ্রন্থে রুশোর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই পাঁচটি গ্রন্থ হইল : (১) 'Project for the Education of M. de Sainte Marie', (২) 'Discourses on Political Economy', (৩)

'Nouvelle Heloise', (৪) 'Considerations on the Government of Poland' এবং (৫) 'Emile'।

প্রথম পুস্তকটিতে জন্ লকের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কেননা এখানে রুশো লকের মত সদাচারকে শিক্ষার মহত্তম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় পুস্তকটিতে তিনি গৃহশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ উদ্ঘাটনে কিছুটা প্রবৃত্ত হয়েছেন। তৃতীয় পুস্তকটিতে রুশো পরবর্তীকালের ব্যক্তিগত শিক্ষা সম্পর্কিত মতের প্রচুর আভাস দিয়েছেন। চতুর্থ পুস্তকটিতে তিনি কর্মক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার তত্ত্বগুলি কি রূপ পরিগ্রহ করে তার চিত্র দেবার প্রচেষ্টা করেছেন এবং পঞ্চম ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'Emile'-তে তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যাপকতম আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। রুশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতাবলীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে তাঁর উপরোক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুস্তকটি বিশেষভাবে পড়া উচিত। কারণ, ব্যক্তিগত শিক্ষার পূর্ণ চিত্র পেতে হলে তৃতীয় ও পঞ্চম পুস্তকটির পাঠ অপরিহার্য হয়ে উঠে এবং রুশো যে শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না এ কথা ভালভাবে জানবার জন্য চতুর্থ পুস্তকটি পাঠ করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হলে তাঁর 'Emile' গ্রন্থকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়, কেননা এই গ্রন্থনিবদ্ধ তত্ত্বই শিক্ষাজগতে নবযুগের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিল এবং শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রুশোর খ্যাতি বিস্তার করেছিল। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই শিক্ষাতত্ত্ব হল ব্যক্তিগত শিক্ষার তত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় শিক্ষার তত্ত্ব নয়। রুশোর ব্যক্তিগত শিক্ষার তত্ত্ব এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং প্রভাবশীল হয়েছে এই কারণে যে, তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ছিল অত্যাচারী ও জনগণবিরোধী। এই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তখন সর্বব্যাপী বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল এবং রুশোর চিন্তা এই সমাজের ভিত্তিকে অমিত বলে আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়েছিল বলেই তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল। সুতরাং নিম্নের তত্ত্বাবলী হল রুশোর 'Emile' গ্রন্থনির্ভর। পরে 'Emile' গ্রন্থটিরও সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হবে ঐ তত্ত্বাবলীর অনুধাবনের সুবিধার জন্য।

রুশো শিক্ষাকে জীবন-প্রক্রিয়া বলেই মনে করতেন। তাঁর মতে শিক্ষার উৎসস্থান হল মানুষের অন্তর। স্বাভাবিক শক্তি, প্রেরণা, অনুভূতি ও বোধ-

সমূহের বিকাশের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম প্রকাশ। শিক্ষার লক্ষ্যস্থল হল বর্তমানের জীবন ও তার বিকাশ। তাই তাঁর মতে শিক্ষা কোন মতেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি সাধন নয়।

রুশো সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজের মত মানব-শিশুর বিকাশও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। তাঁর মতে শিক্ষকদের উচিত শিশুর বিকাশের পর্যায় হিসেব করে তাকে পরিচালিত করা। রুশো আরও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শক্তিসমূহ একই সংগে বিকশিত হয় না, হয় একের পর এক। সুতরাং শিক্ষকদের আরেকটি কর্তব্য হল পর্যায়ক্রমে বিকাশশীল শক্তিসমূহের যথোপযুক্ত বিকাশ সাধন। তিনি মনে করতেন যে, শৈশবকালে প্রয়োজন হল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার, বাল্যে বৌদ্ধিক শিক্ষার এবং কৈশোরে সমাজগত, নীতিগত, প্রক্ষোভগত ও ধর্মীয় শিক্ষার।

রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিশু ও তার শিখনের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। ফলে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণাই মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষাক্রিয়ায় এখন শিক্ষাদান আর বড় কথা নয়, শিখন ও তার পরিচালনাই হল মূল কথা। বলা বাহুল্য, শিশুকে এই ভাবে শিক্ষাক্রিয়ার কেন্দ্রবস্তু করে তোলার মধ্য দিয়েই রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে 'Copernican Revolution' সংঘটিত করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ্‌কদের যোগ্য গুরু হিসাবে রুশোই প্রথম সার্থকভাবে শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশসাধনকে শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এমিলের বিকাশের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন তাতে সুপরিস্ফুট যে, রুশো একের পর এক এমিলের (অর্থাৎ সমস্ত শিশুর) সর্বাংগীণ বিকাশই চেয়েছেন। এই সুপরিব্যাপ্ত বিকাশের ধারণার মধ্যে স্থান রয়েছে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশের, বৌদ্ধিক বিকাশের, সামাজিক, নীতিগত, প্রক্ষোভগত ও ধর্মীয় বিকাশের। সুতরাং মানব-জীবনের কোন মহৎ দিকই বাদ যায় নি।

শিক্ষার সর্বাংগীণ বিকাশের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুশো নানাপ্রকারের কর্মের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং এই বহুবিচিত্র কর্মই হল রুশোর মতে শিক্ষার মৌল বিষয়বস্তু। রুশোর সমসাময়িক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা ছিল অলংকরণের সামগ্রী ও কর্মবিমুখ। পুস্তক

পাঠই ছিল তার মূল কথা। ভাষানির্ভর, কর্মবিমুখ এই শিক্ষার প্রতিবাদে রুশো বহুবিচিত্র কর্মনির্ভর নূতন শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুতরাং আজকের শিক্ষার সমস্ত কর্ম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু হল রুশোর স্বপ্নপ্রসূত দূরবর্তী ফল।

শিশুর বিকাশধারার স্তরানুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের নির্দেশ রুশো দিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর মতে বহুমুখী কর্মই হল শিক্ষার মৌল বিষয়বস্তু, সেইহেতু তাঁর মতে মৌল শিক্ষাপদ্ধতি হল কর্মপরিচালনার পদ্ধতি। ইন্দ্রিয়নিচয় ও বৌদ্ধিক শিক্ষার বিষয়েই অবশ্য প্রধানতঃ তাঁর এই মত প্রযোজ্য, কেননা নীতিগত শিক্ষার বেলায় উপদেশদান ও বই-পড়ায় নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।

রুশোর মতে নীতি হল শেষ পর্যন্ত ধর্মনির্ভর এবং নীতিগত শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় হল বয়ঃসন্ধিকাল। ধর্মশিক্ষারও সময় হল তাঁর মতে একই, কেননা ঐ একই সময়ে শিশু এই দুই প্রকার শিক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। রুশো অবশ্য ধর্মশিক্ষাকে প্রচলিত ধর্মাবলীর উপর নির্ভরশীল করতে চান নি। তিনি এক যুক্তিনির্ভর প্রাকৃতিক ধর্মের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং ধর্মশিক্ষাকে তার অনুযায়ীই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। অনুভূতিগত (সৌন্দর্যগত) শিক্ষাও রুশো এই বয়ঃসন্ধিকালে দিতে চেয়েছিলেন এবং এই দিক থেকে প্রাচীন সাহিত্যপাঠকে তিনি বিশেষ সহায়ক মনে করতেন।

সমগ্র শিক্ষাকার্যকে নূতন দৃষ্টিতে দেখার জন্য শিক্ষকের কাজকেও রুশো নূতন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। দক্ষভাবে পরিবেশ পরিচালনার মাধ্যমে শিখন পরিচালনাকেই রুশো শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে নিম্নের মন্তব্যসমূহ করা যায়।

শিক্ষা মূলতঃ জীবন প্রক্রিয়া নয় বা শুধু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও নয়, কেননা শিক্ষা নূতন আদর্শের আলোকে জীবনকে পরিবর্তিত করতে চায়, তাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখতে চায় না। বর্তমানের সুষ্ঠু বিকাশ শুধু ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে। সুতরাং নিছক ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিসাধন না হলেও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিসাধন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব ও শিশুর শক্তিনিচয়ের ক্রমিক বিকাশের ধারণা ভ্রমাত্মক। সুতরাং এই দুই ধারণার উপর নির্ভরশীল নির্দেশাবলীও ত্রুটিযুক্ত।

শিশু ও সমাজের মধ্যে কোন অপরিহার্য সংঘাত নেই। প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র ও উৎস সমাজ ও শিশু দু-ই।

সর্বাংগীণ বিকাশসাধন শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্ভুল হলেও শিশুর বিকাশ সর্বদাই সামাজিক পরিবেশে হওয়া উচিত। কৈশোর পর্যন্ত সামাজিক বিকাশ বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়ে রুশো গুরুতর ভুল করেছিলেন। সমসাময়িক সমাজের ত্রুটিই অবশ্য রুশোকে এই রকম নির্দেশ দানে প্রণোদিত করেছিল।

কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়বস্তু মূলতঃ যুক্তিসহ হলেও রুশোর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর অনেক ত্রুটি আছে। শুধু কর্মনির্ভর বিষয়-বস্তু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের দিক থেকে এবং বিমূর্ত চিন্তার দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তার উপর ভাষার-উপর অতিনির্ভরশীলতাও যেমন দোষযুক্ত, ভাষাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও তেমনি দোষযুক্ত। পুস্তক ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ করেও রুশো ভুল করেছেন, কেননা ঐরূপ ব্যবস্থার ফলে শিশু পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবে। লেখা, পড়া ও গণিতের মত মৌল বিষয়গুলির শিক্ষার উপর জোর না দিয়েও রুশো ভুল করেছেন, কেননা এই গুলির সাহায্যেই মানুষ বহুমুখী বিকাশের পথে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যায়।

শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর বিকাশের স্তরানুযায়ীই নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং শিশুর কর্মপরিচালনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান বিশেষ সার্থকতা অর্জন করে। তথাপি বিমূর্ত চিন্তাশক্তির বিকাশের উপর আরও জোর দেওয়া উচিত এবং মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্মীকরণের উপরও যথাযোগ্য গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত।

নীতিকে সম্পূর্ণ ধর্মনির্ভর করা ঠিক নয় এবং নীতিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর আপন অভিজ্ঞতার উপর আরও জোর দেওয়া উচিত। তারপর নীতিগত, অনুভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা ঠিক নয়। নীতিগত, অনুভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপকতা ও উপকরণগত বৈচিত্র্যের বিষয়েও রুশো পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন না। নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে নানা প্রকার উপকরণের সাহায্যে এবং বহু সময় ধরে এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করতে হয়।

উপরোক্ত মূল্যায়ন-প্রয়াসের শেষে কিন্তু দৃঢ়ভাবে রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক প্রগতিমুখিনতার কথা স্বীকার করতে হয়। রুশোই শিক্ষাক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে সার্থকভাবে শিশুকে বসিয়েছেন, শিশুর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত শিক্ষাক্রিয়াকে পরিচালিত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সকলের জন্য পূর্ণাংগ বিকাশের দাবী জানিয়েছেন, সক্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শিক্ষালয়ের পূর্বতন নিষ্ঠুরতার অবসানে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করেছেন। এই মৌলিক প্রগতিশীলতার জন্যই সমস্ত পরবর্তী প্রগতিশীল শিক্ষানায়ক রুশোর নেতৃত্ব অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন।

'এমিল' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার

এই গ্রন্থে 'এমিল' নামক শিশুর শিক্ষার মাধ্যমে রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

এই পুস্তকে রুশোর সমাজবিরূপতা তীব্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই সমাজ বিরূপতা সুবিখ্যাত 'নেতিবাচক শিক্ষা' রূপেই প্রধানতঃ এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে নেতিবাচক শিক্ষাই এই পুস্তকের সবটুকু নয়। নেতিবাচক শিক্ষার শেষে রুশো ইতিবাচক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজের প্রতি সাধারণ লোকের প্রবল বিরূপ মনোভাবের জন্য রুশো-ব্যাখ্যাত নেতিবাচক শিক্ষাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এমনকি ইহা জনগণের মন থেকে রুশো-বর্ণিত ইতিবাচক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করেছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও রুশো একটি শিশুর ('এমিলের') শিক্ষার কথাই বলেছেন, তথাপি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত শিশুর পক্ষেই প্রযোজ্য। আবার এমিল বড়লোকের ছেলে হলেও রুশো-ব্যাখ্যাত শিক্ষা গরীব বড়লোক সকলের জন্যই উপযোগী, গৃহশিক্ষকেরও অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা নেই। 'এমিল' পুস্তকে গৃহশিক্ষকের অবতারণা করা হয়েছে শুধু নূতন শিক্ষাব্যবস্থার সংহত উপস্থাপনের জন্য।

রুশোর শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা এক থেকে চার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এই পর্যায়ের শিক্ষা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রথম ভাগের শিক্ষা 'বলবৎ

থাকবে এবং পাঁচ থেকে বার বছর পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা চলতে থাকবে।

প্রথম পর্যায়ের প্রথম ভাগের শিক্ষার লক্ষ্য হল দৃঢ় দেহ গঠন। দৈহিক দুর্বলতাকে রুশো নৈতিক অবনতির মূল কারণ বলে মনে করতেন। এই ভাগে শিশুদের স্বাধীনভাবে, গ্রাম্য পরিবেশে, খেলাধূলার মাধ্যমে দৈহিক বিকাশ হোক এই ছিল রুশোর মত। তিনি অত্যধিক জামা-কাপড় ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতেও তিনি এই ভাগে নারাজ ছিলেন। শিশুরা যে সব কথার অর্থে বোঝে না সেই সব কথা শেখারও রুশো বিরোধী ছিলেন।

প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা দুই দিক থেকে অগ্রসর হবে। একটি হল নেতিবাচক দিক, অন্যটি হল ইতিবাচক দিক। এই ভাগের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল স্বাধীনতা অর্জন। নেতিবাচক শিক্ষা আবার মানসিক ও নৈতিক এই দুই দিকে কাজ করবে। মানসিক দিকের বিকাশের জন্য এই শিক্ষা শিশুকে বস্তুনির্ভর করে তুলবে, কেননা রুশোর মতে বস্তু-নির্ভরশীলতা শিশুর স্বাধীনতাকে আদৌ খর্ব করবে না। বস্তুনির্ভরশীলতার প্রধান অর্থ হল এই যে, এর দ্বারা পুস্তক-সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা যায়। রুশো বস্তুকে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সংগীতের উপযোগিতার কথাও বলেছেন। নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য হল এই যে, এই সময়ে নীতিজ্ঞান দানের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে শুধু শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়কে পাপের প্রভাব হতে দূরে রাখার।

সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য হল এমনি ঃ "নীতি বা সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান নয়, বরং হৃদয়কে পাপ থেকে এবং মনকে অসত্য থেকে রক্ষা করা"।

দ্বিতীয় ভাগের ইতিবাচক শিক্ষাও দুটি দিক থেকে অগ্রসর হবে। একটি হল দৈহিক শিক্ষার দিক, অন্যটি হল ইন্দ্রিয়নিচয়ের শিক্ষার দিক। অতীতের স্পার্টার আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই রুশো প্রাধানতঃ দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। তবে প্লেটোর দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কেননা দেহের শিক্ষাকে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চান নি,

চেয়েছিলেন মানসিক শিক্ষার সহায়ক শিক্ষা হিসাবে গড়ে তুলতে। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার জন্য পরবর্তী শিক্ষাবিদ্‌দের মত রুশো শিক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি (didactic apparatus) ব্যবহার করতে চান নি। তিনি স্বাধীন, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তবে রুশো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিচারক্ষমতার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন।

দেখা গেল রুশোনির্দেশিত প্রথম পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাই প্রধানতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশ সাধনে ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশের মাধ্যমে মানসিক বিকাশ সাধনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা এবং স্বাভাবিক ফলভোগের মধ্য দিয়ে নীতিগত শিক্ষার প্রয়াস অবশ্য করা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার এই দিকগুলি প্রথম স্তরে স্পষ্টতঃ মুখ্য নয়।

শিক্ষার পরবর্তী স্তরে (বার থেকে পনের বছর পর্যন্ত) শিশুর কৌতূহল ও দূরদৃষ্টি বাড়ে এবং তাই বিজ্ঞান পাঠের সূচনা করা যায়। চারপাশের জগতের প্রতি এবং সূর্যের প্রতি শিশুর মন স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার মধ্য দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের দিকে শিশুর জ্ঞানকে পরিচালিত করা যায়। অবশ্য শিশুকে বিজ্ঞানের জ্ঞানদান করা আসল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তার জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন। পদ্ধতি হিসাবে রুশো ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের নির্দেশ দিলেও তা ঠিক প্রচলিত অর্থে উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতি নয়, কেননা এই পদ্ধতিতে আবিষ্কারকদের সর্ববিষয়ে অনুসরণের করতে বলা হয়। রাস্ক বলেছেন যে, রুশো নির্দেশিত বিজ্ঞান-শিক্ষণপদ্ধতির সংগে জন ডিউইর সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতির খুব বেশী মিল রয়েছে। সমাজগত শিক্ষার জন্য জন্ লক্‌কে অনুসরণ করে রুশো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই একটি হাতের কাজ শেখাতে চেয়েছেন। রুশো এই দিক থেকে ছুতারের কাজকে অবশ্য সবচেয়ে বেশী উপযোগী মনে করেছেন, কেননা তাঁর মতে ছুতারের কাজ শিশুকে সার্থকভাবে অর্থনৈতিক মুক্তিদান করবে, শ্রম সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগরূক করবে এবং তার বৌদ্ধিক উৎকর্ষসাধনও করবে। পূর্ব স্তরের মত এই স্তরের শিক্ষাও মূলতঃ কর্মনির্ভর হলেও রুশো এই পর্যায়ে একটি পুস্তক ('Robinson Crusoe') পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা

বলেছেন। তাঁর মতে একমাত্র এই পুস্তকটিতেই আত্মনির্ভর স্বাভাবিক শিক্ষার অবিমিশ্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং রুশোর মতে শিশুর দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হল প্রধানতঃ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিক্ষা।

শিক্ষার তৃতীয় স্তরে (১৫ বছর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত) রুশো সামাজিক ও নৈতিক, অনুভূতিগত এবং ধর্মীয় শিক্ষা দানের কথা বলেছেন। ইতিপূর্বে এই সব দিকের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর মত লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এখানে আর ঐ সবের পুনরালোচনা করা হল না। এখানে শুধু এইটুকু বলার প্রয়োজন রয়েছে যে, এই পর্যায়ের পূর্বে রুশো শিশুকে এই সব দিকের শিক্ষার উপযুক্ত মানসিক পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে করতেন না। এই স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ বয়েড্ নিম্নলিখিত মূল্যবান মন্তব্যসমূহ করেছেন।

"কৈশোরেই প্রকৃত শিক্ষা সুরু হয়, যখন সাধারণ ব্যবস্থায় শিক্ষার শেষ সূচীত হয়। এই পর্যায়ে শিশুর প্রথম প্রয়োজনীয় শিক্ষা হল সামাজিক রসসমূহের অর্জনের মাধ্যমে রিপুগুলির নিয়ন্ত্রণ, কারণ এই সময়েই রিপুগুলি প্রথমে উচ্ছলিত হয়ে উঠে। আঠার বছর বয়সের সময়ে সে প্রথম ইতিহাস-বর্ণিত মানুষকে অনুধাবন করতে সুরু করে এবং ধর্মজগতের বিমূর্ত ভাবরাজির সংগে পরিচয় লাভ করে। কুড়ি বছর বয়সে সে সমাজে প্রবেশ করে এবং রঙ্গমঞ্চ ও মহৎ সাহিত্য (বিশেষ করে চিরায়ত সাহিত্য) থেকে সামাজিক সম্পর্করাজি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা করে। তারপর সে আদর্শ নারীর সাক্ষাৎলাভ করে, রাষ্ট্রনীতি অনুধাবনের জন্য এবং জগৎকে দেখার জন্য ভ্রমণে বাহির হয় এবং পরিশেষে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। এইবার তার শিক্ষা হয় শেষ।"

রুশো মনে করতেন যে, প্রথম থেকেই নারী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং তাই তাদের শিক্ষাও হওয়া উচিত ভিন্ন প্রকারের। তিনি আরও মনে করতেন যে, নারী হল সর্বদাই নারী, কিন্তু পুরুষ তার যৌন প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণেই তিনি পুরুষদের জন্য পূর্ণাংগ বিকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু নারীর জন্য শুধু সহধর্মিণী ও মাতার শিক্ষাই উপযোগী বলে মনে করতেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই 'এমিল' গ্রন্থের কেবলমাত্র শেষপাদে রুশো 'সোফির' শিক্ষার চিত্রের মাধ্যমে নারীশিক্ষার চিত্র দেওয়ার প্রয়াস

করেছেন। কিন্তু এই শিক্ষার কোন নূতনত্ব না থাকায় এখানে সে সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ হল না। নারীশিক্ষা সম্পর্কে রুশোর ধারণা তাঁর একটি সুপরিচিত উক্তি থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উক্তিটি হল,

"নারীজাতির সমগ্র শিক্ষাই হওয়া উচিত পুরুষ জাতির শিক্ষার অনুপূরক হিসাবে" ("The whole education of woman should be relative to man.")

শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র
বাণীপুর
পো: বৈগাছি, ২৪ পরগণা

(খ) Johann Heinrich Pestalozzi

পেস্তালৎসী (১৭৪৬—১৮২৭)

শূন্যচারী স্বপ্নদ্রষ্টা রুশোর প্রথম সার্থক শিষ্য পেস্তালৎসী স্বপ্ন দেখলেও প্রধানতঃ কর্মী ছিলেন এবং তাই রুশোর বাণীও অতি অল্প সময়ের মধ্যে (আংশিকভাবে হলেও) বাস্তব জগতে রূপলাভ করেছিল। রুশোর মহান্ বিপ্লবাত্মক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার প্রচেষ্টাই ছিল পেস্তালৎসীর সমগ্র জীবনের মূলসূত্র। যদিও বহুলাংশেই তিনি এই প্রচেষ্টায় সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি, তথাপি এই মহৎ প্রয়াসের উজ্জ্বল আলোকে তাঁর সমস্ত জীবন ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

পেস্তালৎসীর শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল তাঁর অমিত শিশু ও মানবপ্রেম। প্রেমের এই মহান্ আবেগেই তিনি রুশোর মানবতাবাদী বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত জীবন এক দিব্য উন্মাদনায় বিভোর হয়ে একের পর এক নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

মুখ্যতঃ কর্মীর শিক্ষাচিন্তা বলে পেস্তালৎসীর শিক্ষাচিন্তায় দার্শনিক প্রসার ও সংহতির অভাব ছিল। কিন্তু বাস্তব কর্মপ্রসূত বলে এই চিন্তার ব্যবহারিক মূল্য ছিল খুবই বেশী এবং তাই সমগ্র প্রগতিশীল দেশে তা অতি সহজে বিস্তার লাভ করেছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ্। পেস্তালৎসী রুশোর মত সমাজবিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমাজবিরোধিতা ছিল তুলনায় অনেক কম উগ্র। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁর প্রভাব অধিক প্রসারলাভ করেছিল এবং সমাজরক্ষকেরা তাঁর বাণী ও কর্মের প্রভাব বিস্তারে ততটা ভীত ও সন্ত্রস্ত বোধ করে নি।

কর্মী পেস্তালৎসীর কর্মে বিশেষ দক্ষতা ছিল না। স্বপ্নও তাঁর রুশোর মত বর্ণাঢ্য ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসম্বাদিত এবং সে হল তাঁর মানব ও শিশুপ্রেম। এই প্রেমই তাঁর চরিত্রের মূল প্রেরণা ছিল এবং এরই জন্য তিনি 'পিতা পেস্তালৎসী'

এই সার্থক নামের দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ যে কোন ব্যক্তিই এই মহাপ্রাণ শিক্ষাবিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনিই তাঁর মহান্ প্রেমোন্মাদনার তড়িৎস্পর্শে চকিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর পেস্তালৎসী পুস্তক-রচনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'Leonard and Gertrude' ও 'Evening Hours of a Hermit' হল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত, তবে অনেকের মতে বার্গডর্ফে রচিত 'How Gertrude Teaches her Children' পুস্তকটিই হল তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ শুধু শিক্ষাদর্শন নয়, পেস্তালৎসীর মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় সমস্ত প্রধান মতাবলীর এই পুস্তকটিই হল আকর।

রুশোর মত পেস্তালৎসীরও মতে শিক্ষার সুদূরের লক্ষ্য হল সমাজের পুনরুজ্জীবন। এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষার আশু লক্ষ্য হিসাবে তিনিও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণবিকাশের কথা বলেছেন। তবে তিনি গ্রীকদের অনুকরণে সুসমঞ্জস বিকাশের উল্লেখ ও প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে পেস্তালৎসী একটি জৈবিক প্রক্রিয়ারূপে দেখেছেন। তাঁর মতে শিশুর শক্তিগুলির বিকাশ আনন্দপূর্ণ ও স্বতস্ফূর্ত কর্মাবলীর মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনি এই জীবন-প্রক্রিয়ার অনুপূরক প্রক্রিয়ারূপেই দেখেছেন। মন্‌রোর মতে পেস্তালৎসী তাঁর বিকাশের ধারণাটি জীববিজ্ঞানী লামার্কের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, কেননা লামার্কই আলোচ্য সময়ে স্বতস্ফূর্ত কর্মের মধ্য দিয়ে বিকাশের ধারণাটিকে বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন। তবে রুশোর চিন্তাধারার মধ্যেই এই সমস্ত চিন্তার সূত্র পাওয়া যায়। সুতরাং উৎসানুসন্ধানে লামার্ক পর্যন্ত যাওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না।

রুশোর চিন্তার প্রভাব ছিল সাধারণ শৈশবকালের সমগ্র শিক্ষার উপর, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার প্রভাব ছিল প্রায় নগণ্যই। পক্ষান্তরে, পেস্তালৎসীর প্রভাব ছিল শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপরই বেশী এবং এই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই, কেননা শিক্ষার এই স্তরেই তিনি নানা প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

বস্তুতঃ এই স্তরের শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি পেস্তালৎসীর প্রভাবে প্রায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। বিষয়বস্তুর প্রচলিত সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে তিনি বহু নূতন বিষয়কে প্রবেশাধিকার দান করেছিলেন যেমন, প্রকৃতিপাঠ, অঙ্কন, ভূগোল, সঙ্গীত ইত্যাদি। কিন্তু এখানেও রুশোকে অনুসরণ করে তিনি অভিজ্ঞতা ও কর্মের রূপেই বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরও বিষয়বস্তুসম্বন্ধীয় ধারণা ছিল কর্ম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

'শিক্ষাকে আমি মনোবিজ্ঞান-নির্ভর করতে চাই' পেস্তালৎসীর এই প্রখ্যাত উক্তি তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপরে মূল্যবান আলোকপাত করলেও শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়েই এটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য। তবে পেস্তালৎসী যে আধুনিক অর্থে মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন না এ কথা বলাই বাহুল্য, কেননা বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্বের জন্ম পেস্তালৎসীর সময়ের অনেক পরে হয়েছে। পেস্তালৎসীর মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় ধারণাবলী লক্ ও রুশোর মনস্তাত্ত্বিক ধারণাবলীর উপর মোটামুটি নির্ভরশীল ছিল। লকের অনুসরণে রুশো প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে বস্তুনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। পেস্তালৎসীও রুশোর অনুসরণে এই স্তরের শিক্ষায় বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। এর থেকেই জন্ম হয় তাঁর সুবিখ্যাত 'বস্তু-পাঠের' ('object lesson')। পেস্তালৎসী বস্তু-পাঠের এক ক্রমিক ধারার উদ্ভাবন করেছিলেন এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং নানা প্রকারের 'মডেল' ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বনির্ভর করতে গিয়ে পেস্তালৎসী পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছুর প্রবর্তন করেছিলেন। শিশুদের শ্রেণী বিভক্ত করে পাঠদান, বিকাশের ধারা ও স্তরানুযায়ী বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা, শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রেরণাগুলিকে শিক্ষার কর্মে প্রয়োগ করা ইত্যাদি কর্মও পেস্তালৎসীর মহান কীর্তির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তত্ত্বনির্ভর করতে গিয়ে পেস্তালৎসী প্রতিটি ব্যাপারে সরলতম উপাদানসমূহ থেকে অগ্রসর হবার নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কোনগুলি হল সরলতম উপাদান সে সম্বন্ধে তাঁর সুষ্ঠু ধারণা ছিল না। ফলে যৌক্তিক বিশ্লেষণের দিক থেকে যা সরল তাকে তিনি মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও অনেক সময়ে সরল বলে মনে করতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পেস্তালৎসী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যদিও পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস বিকাশের ধারণা তাঁর সব সময়েই বলবৎ ছিল। অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মত পেস্তালৎসীর নৈতিক ধারণাও ধর্মীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি মনে করতেন যে, শিশু ও তার মাতার মধ্যকার সম্পর্কের উপর নৈতিক ও ধর্মীয় উভয় প্রকার বিকাশই নির্ভর করে। মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশ তাঁর মতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংঘটিত হতে পারে, কেননা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে বিবেকযুক্ত করে পাঠিয়েছেন এবং বিবেকের নির্দেশে কাজ করবার ক্ষমতাও প্রত্যেককে দিয়েছেন। তবে এই দুই ক্ষেত্রে শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই শিক্ষার জন্য তিনি বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রের মত এক সম্পূর্ণ ক্রমবিন্যস্ত কর্মধারার নির্দেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে পেস্তালৎসী লক্‌, রুশো ও ক্যাণ্টের অনুকরণে বিখ্যাত 'Anschauung' ('প্রত্যক্ষ ধারণা')-তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশেষ ধরণের 'Anschauung'-এর কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর তিনি গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, বস্তু পাঠ Anschauung তত্ত্বেরই উপজাত ফল।

পেস্তালৎসীর প্রভাব বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও সংগঠন এবং শিক্ষকের ভূমিকার উপরও যথেষ্ট বিকীর্ণ হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রকৃতিকে তিনি পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন উত্তম গৃহের সম্পর্কাবলী ও আবহাওয়াকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। পেস্তালৎসী গৃহ ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখেন নি। উত্তম গৃহে যেমন সকলের বিকাশই হল সকলের লক্ষ্য, তেমনি বিদ্যালয়েরও লক্ষ্য হওয়াই উচিত সমস্ত সভ্যের পূর্ণাংগ বিকাশসাধন। উত্তম গৃহজীবনের ভিত্তি যেমন প্রেম ও সহযোগিতা বিদ্যালয়ের জীবনও ঐ দুটি স্তম্ভের উপর গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই মতই পেস্তালৎসী পোষণ করতেন এবং এই মতের প্রভাবেই ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পূর্বতন নিষ্ঠুর আবহাওয়া পরিবর্তিত হতে সুরু করেছিল।

নূতন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন নূতন শিক্ষকের, এ সত্য ভালভাবেই পেস্তালৎসী বুঝেছিলেন। সেইজন্য তিনি নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং সুশিক্ষকের গুণাবলী

কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর মতও বিশেষভাবে প্রকাশ করেছিলেন। সংক্ষেপে, তাঁর মতে, শিক্ষকের শিশুপ্রেম, শিশুমনের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য অতন্দ্রসাধনা, শিশুদের শক্তি, প্রবণতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি গুণ থাকা প্রয়োজন। পেস্তালৎসীই প্রথমে শিক্ষকতা কার্যের জন্য যোগ্য প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন এবং তত্ত্ব ও কর্মের প্রভাবে এই কার্যকে একটি উচ্চাঙ্গের পেশাতে পরিণত করেছিলেন। পেস্তালৎসীর এই দিককার অবদানের মূল্য অসীম। বস্তুতঃ আজকের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা যে পেস্তালৎসীর চিন্তা ও কর্মেরই দূরজাত ফল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

রুশো হাতের কাজকে সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান দিয়েছিলেন, কেননা আমরা দেখেছি যে, এই বিষয়ে তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে তোলা এবং দৈহিক শ্রমজীবী ও মানসিক শ্রমজীবীদের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত করা। পেস্তালৎসীও হাতের কাজকে তাঁর শিক্ষার কার্যসূচীতে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। তাঁর মতে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে মানসিক শক্তিনিচয় ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু নৈপুণ্যও অর্জন করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পেস্তালৎসী হাতের কাজে দক্ষতা অর্জনকে দৈহিক শিক্ষার অন্তর্গত কর্ম বলে মনে করতেন এবং ভাবতেন যে, শিল্পনৈপুণ্য বিকাশের নিয়মসমূহ হল জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশের নিয়মসমূহেরই মত।

পেস্তালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এর মৌল কাঠামোর দৃঢ়তা, এমনকি অবিনশ্বরতা, অবিসম্বাদিত। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুসমঞ্জস (harmonious) বিকাশ সাধনের আদর্শ ব্যক্তিতার বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক অংশের সংগে মানবতানির্ভর বিষয়বস্তুরও স্থান সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত, মোটামুটি একই রকমের পদ্ধতি প্রায় সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত নয়, হাতের কাজকে দেহশিক্ষার অন্তর্গত মনে করা ঠিক নয়, নৈতিক শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা উচিত নয়।

(গ) Johann Friedrich Herbart

হার্বার্ট (১৭৭৬—১৮৪১)

পেস্তালৎসীর মত অত ব্যাপকভাবে রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও, হার্বার্টও ছিলেন রুশো-শিষ্য। শিক্ষাকে রুশোর নির্দেশ মত শিশুমনস্তত্ত্বনির্ভর করতে তিনিও চেয়েছিলেন। আর এই দিক দিয়ে তিনি অসামান্য সাফল্যও অর্জন করেছিলেন, কেননা তিনিই প্রথম প্রকৃতভাবে শিক্ষাকে অনেকাংশে মনস্তত্ত্বনির্ভর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর উদ্ভাবিত মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

দর্শনের ক্ষেত্রে হার্বাট ছিলেন বস্তুবাদী এবং তাই তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। এই দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে রুশো, পেস্তালৎসী ও ফ্রোয়েবেলের বিরাট্ পার্থক্য রয়েছে। এঁরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাই ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান দিক বলে মনে করতেন। কিন্তু হার্বাট ধর্মীয় শিক্ষাকে কোন স্থানই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় দেননি এবং নীতি শিক্ষাকে ধর্মশিক্ষানির্ভরও করেন নি। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার যে আদর্শ হার্বাট তুলে ধরেছিলেন আজকের দিনে তার মূল্য অনেক, কেননা আজকের প্রগতিশীল শিক্ষা মূলতঃ ধর্মনির্ভর নয়।

রুশো, পেস্তালৎসী ও ফ্রোয়েবেল ছিলেন মূলতঃ ভাববাদী ও রোমান্টিক মনোভাবসম্পন্ন, কিন্তু হার্বাট ছিলেন বস্তুবাদী ও 'ক্লাসিক্যাল' মনোভাবসম্পন্ন। এই কারণে এঁদের চিন্তাপদ্ধতির ও চিন্তাপ্রসূত ফলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভব করা যায়। প্রথম তিনজন ছিলেন ভাবপ্রবণ, স্বপ্নদ্রষ্টা ও বিপ্লবী, এবং তাই তাঁদের চিন্তার মধ্যে আবেগ, কল্পনা ও দুঃসাহসিকতার যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু হার্বাট ছিলেন একান্তভাবে যুক্তিবাদী, বাস্তবনির্ভর এবং মূলতঃ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক, তাই তাঁর চিন্তায় যুক্তি, বাস্তবতা ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় এবং এই কারণেই নিশ্চয়

সমাজের রক্ষণশীল শক্তিদের উপর তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তবে সমস্ত কিছু বলার পরেও এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, হার্বার্ট শিক্ষাচিন্তায় যুক্তিকে স্থান দিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও সামাজিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষাজগতে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথ অনেকটা উন্মুক্ত করেছিলেন।

সৎচরিত্র গঠনকেই হার্বার্ট শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। সৎ নৈতিক চরিত্রকে তিনি আবার পাঁচটি গুণ সমষ্টি বলে মনে করতেন। একটি হল 'আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা' ('inner freedom') এবং অন্য চারটি হল কর্মনৈপুণ্য বা পূর্ণতা, মহানুভবতা বা সৎ প্রকল্প, সুবিচারবোধ এবং ন্যায়বোধ। হার্বার্টের মতে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা হল এমন একটি স্থায়ী মানসিক অবস্থা যেখানে যা করা হচ্ছে এবং যা করণীয় এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হার্বার্ট কর্মনৈপুণ্যের দ্বারা সুষম বৃদ্ধি ও বিকাশকে, মহানুভবতার দ্বারা উদার মনোভাবকে, সুবিচারবোধের দ্বারা অপরকে প্রাপ্য বস্তু দেওয়ার প্রবণতাকে এবং ন্যায় বোধের দ্বারা অপরকে যোগ্যতার অনুপাতে দেওয়ার প্রবণতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

মহান্ দার্শনিক হার্বার্ট স্বভাবতঃই দর্শনের জন্য শিক্ষার মধ্যে যোগ্য স্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তাই দর্শন হল শিক্ষাদান ক্রিয়ার ভিত্তি এবং শেষ পরিণতিস্বরূপ। মনস্তত্ত্বের জন্যও তিনি যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি বলেছিলেন যে, মনস্তত্ত্বের কাজ হল শিক্ষার উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষাক্রিয়ার তিনটি উপাদান আছে বলে হার্বার্ট মনে করতেন। তাঁর মতে এই তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল শিক্ষাদান ক্রিয়া (instruction)। অন্য দুটি উপাদান হল চরিত্রগঠন (training বা 'Zucht') ও শৃঙ্খলারক্ষা (government বা 'Regierung')। হার্বার্ট বৌদ্ধিক শিক্ষাদানকে শিক্ষণ বা শিক্ষাদান ক্রিয়া, নৈতিক শিক্ষাদানকে চরিত্র গঠন এবং শান্তিরক্ষাকে শৃঙ্খলারক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। হার্বার্টের মনস্তত্ত্ব ছিল বুদ্ধিনির্ভর ('intellectualist'), তাই তিনি

মনে করতেন যে, প্রধানতঃ সুষ্ঠু বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমেই সুষ্ঠু চরিত্রগঠন সম্ভব হয়। সুষ্ঠু বৌদ্ধিক বিকাশের দুটি লক্ষণের সঙ্কেতও হার্বাট দিয়েছিলেন একটি হল সুগ্রথিত চিন্তাচক্রের উদ্ভব, এবং অন্যটি হল বহুমুখী আগ্রহসৃষ্টি। চিন্তাচক্র বলতে হার্বাট ভাবরাজির সংহতিকে বুঝিয়েছেন এবং বহুমুখী আগ্রহসৃষ্টি বলতে জগৎ ও জীবনের বহুদিক সম্বন্ধে বৌদ্ধিক আগ্রহ সৃষ্টির কথা বলতে চেয়েছেন।

যেহেতু হার্বাটের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিত্রসৃষ্টি, সেইহেতু তিনি মানবনির্ভর বিষয়বস্তুর (humanities) উপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। হার্বাট বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীকরণ ও সম্পৃক্তীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য বিষয়বস্তুকে এ দুটির সঙ্গে সম্পৃক্ত (correlate) করে শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে, হার্বাট বিজ্ঞানপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নির্মাণ ও ব্যবহার প্রভৃতিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন এবং প্রথম স্তরের গণিতের সঙ্গে প্রথম স্তরের বিজ্ঞানের কিয়দংশও যুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। মানবজাতির বিকাশে হাতের মূল্যবান ভূমিকার কথা স্মরণ করে হার্বাট হাতের কাজকে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তুকে সাজাতে এবং বিদ্যার্থীদের বয়সের কথা মনে রেখে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেও হার্বাট বলেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, 'সাংস্কৃতিক স্তর তত্ত্বের' ('Culture Epoch Theory') উপর নির্ভর করে হার্বাট বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ধারণা ভুল। হার্বাট এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছুই বলেন নি। সামান্য একটু আভাসের উপর ভিত্তি করেই অত্যুৎসাহী হার্বাট-শিষ্যরা নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে এ বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হার্বাট এক মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। সুতরাং হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনার পূর্বেই তাঁর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় প্রয়োজন। বস্তুবাদী হিসাবে

হার্বার্ট মনে করতেন যে, বিশ্ব হল বহু প্রকৃত বস্তুর (reals) সমষ্টি এবং এই প্রকৃত বস্তুগুলির মধ্যে একটি হল মানুষের আত্মা। তাঁর মতে বস্তুগুলি পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপন করে এবং সম্পর্কস্থাপনের সময়েও তাদের মৌল সত্ত্বাগুলিকে অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করে। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতার জন্ম হয় বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং এই সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে মানুষের মনে বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়। এই ধারণাগুলি কিন্তু উদ্ভবের পরেই বিলীন হয়ে যায় না, তারা মনে সঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তী ধারণাগুলিকে গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, পরবর্তী ধারণানিচয়ের জন্ম হয় নূতন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে। সুতরাং হার্বার্টের মতে নূতন শিক্ষা (নূতন ধারণার আত্তীকরণ) পুরাতন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। পুরাতন অভিজ্ঞতার (ধারণাগুলির) সাহায্যে নূতন অভিজ্ঞতার এই আত্তীকরণ-প্রক্রিয়াকে হার্বার্ট বিখ্যাত দার্শনিক লাইব্‌নিজের অনুসরণে apperception অর্থাৎ ভাবের আত্তীকরণ বলে অভিহিত করেছেন এবং পুরাতন ধারণানিচয়কে apperception mass বা ভাবজট এই নাম দিয়েছেন। নূতন ভাবগুলি মানুষের মনে পুরাতন ভাবনিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং আরও নূতন ভাবনিচয়কে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এইভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়। জ্ঞানের বৃদ্ধির এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই হার্বার্ট তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

যেহেতু হার্বার্ট মনে করতেন যে, জ্ঞানের বিকাশ কতকগুলি অলঙ্ঘ্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় সেই হেতু তিনি মনে করতেন যে, সর্বত্রই শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে একই পথে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যদি অন্য পথে অগ্রসর হয়, তাহলে হার্বার্টের মতে মনের সংহতি নষ্ট হয়ে যাবে এবং শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। হার্বার্টের মতে জ্ঞানের বিকাশ চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে : স্পষ্টতা ('clearness'), অনুসঙ্গ ('association'), তন্ত্র ('system') ও পদ্ধতি ('method')। সুতরাং শিক্ষণকে এই চারটি স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর অনুবর্তীরা কিন্তু এই চারটি সোপানকে পাঁচটি সোপানে পরিবর্তিত করেছিলেন যেগুলির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন : আয়োজন ('preparation'), উপস্থাপন ('presen-

tation'), সাদৃশ্যদর্শন ও বিমূর্তনক্রিয়া ('comparison and abstraction'), সামান্যীকরণ, ('generalisation') ও অভিযোজন ('application')।

হার্বার্ট আরও বলেছিলেন যে, শিক্ষণ দুই প্রকারের হয়ঃ সংশ্লেষণমূলক শিক্ষা ও বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা। উপরে সংশ্লেষণমূলক শিক্ষণের সাধারণ রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শিশুর অভিজ্ঞতা যখন ভ্রমাত্মক হয়, তখনই বিশ্লেষণাত্মক শিক্ষণের প্রয়োজন হয়, কেননা নূতন সংশ্লিষ্ট শিক্ষণের পূর্বে ত্রুটিযুক্ত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। তবে এই দুই প্রকারের শিক্ষণকে হার্বার্ট সর্বদাই পৃথক ভাবে ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন নি। প্রয়োজন বোধে এই দুই প্রকার শিক্ষণকে একই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়।

হার্বার্টের আগ্রহ-তত্ত্ব সুবিখ্যাত। তত্ত্বটি জটিল হলেও তার মূল কথা খুব সংক্ষেপেই বোঝান যায়। আগ্রহসৃষ্টিকে হার্বার্ট শিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করতেন এবং আগ্রহ বলতে তিনি কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণকে বোঝাতেন। এই আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য তিনি আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ ধারণার উদ্রেকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন, কেননা তাঁর পূর্ববর্ণিত মনস্তত্ত্বানুযায়ী অনুরূপ পুরাতন ধারণার সাহায্যেই নূতন ধারণার আত্তীকরণ সহজ হয়। সুতরাং আগ্রহসৃষ্টি এখানে মূলতঃ বৌদ্ধিক কর্ম। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আগ্রহসৃষ্টির জন্য অনুরূপ ধারণানিচয় ভিন্ন অন্য ধারণাসমূহকে দমন করার প্রয়োজন আছে এবং প্রয়োজন আছে বিষয়বস্তুর সুবিন্যাস, জ্ঞানের সংহতিকরণ ও জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষণব্যাপারে ক্রমিক ধারার অনুসরণ। শিক্ষণে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হওয়ার অর্থ যে কি তা আমরা আগেই দেখেছি। অর্থাৎ শিক্ষণকে নির্দিষ্ট ধাপ কয়টির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, হার্বার্টের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিত্রগঠন। এই চরিত্রগঠন তাঁর মতে তিনটি বস্তুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ঃ শিক্ষণ, শৃঙ্খলা রক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা। বুদ্ধিবাদী মনস্তাত্ত্বিক বলে হার্বার্ট এ বিষয়ে স্বভাবতই শিক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন, কেননা তার মাধ্যমেই সুগ্রথিত চিন্তার চক্র ও বহুমুখী আগ্রহের সৃষ্টি

হয়। সুগ্রথিত চিন্তার চক্র (অর্থাৎ সংহত ধারণারাজি) আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চরিত্রকে প্রভাবিত করে। যদিও শিক্ষণের ভূমিকা চরিত্র-গঠনকার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী, তথাপি শৃঙ্খলারক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাদানেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। শিশুরা বাইরের প্রভাবে খুব সহজেই প্রভাবিত হয়, তাই প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাবিধানের। তবে শৃঙ্খলা রক্ষা হল বাহ্যিক ব্যাপার এবং তাই তার প্রভাবও হয় সাময়িক ও সীমিত। কিন্তু চরিত্র গঠনে এটি হল একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এর মূল কথা হল 'মধ্য পথ অনুকরণ করা' অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে খুব নরম হলেও চলবে না, আবার খুব কড়া হলেও চলবে না। নৈতিক শিক্ষা হল মূলতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই তার ফলও হয় সুদূর-প্রসারী। শিক্ষণের মত হার্বাটের মতে নৈতিক শিক্ষাও চারটি ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং সেই চারটি ধাপ হল: প্রভাব বিস্তার, পূর্ব থেকে দূরের বস্তুকে দেখা, ইচ্ছা করা এবং কর্ম করা। প্রভাব বিস্তার বলতে হার্বাট যোগ্য বাক্য, মহৎ আদর্শ ও সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদের মনকে প্রভাবিত করার কথা বলেছেন এবং পূর্ব হতে দেখা বলতে তিনি কোন কিছু করবার আগে তার ফলের কথা ভাবতে বলেছেন। এই দুটি স্তরের পরেই ইচ্ছা করা এবং কর্ম করা উচিত বলে হার্বাট মনে করতেন। সুতরাং নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক ধারণাসৃষ্টি এবং সংহত ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিবেশন, উচ্চ আদর্শ ও সুন্দর দৃষ্টান্তের ব্যবহার, শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে মধ্য পথ অনুসরণ এবং বিদ্যালয়ে সুন্দর সামাজিক জীবন গঠন।

হার্বাটের শিক্ষাতত্ত্বের সমালোচনা করে অনেক প্রকারের ত্রুটি শিক্ষা-তাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, তিনি শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাপারে সত্য, ধর্মভাব ও দৈহিক বিকাশকে যোগ্য স্থান দেন নি এবং প্রচলিত সমাজের আদর্শে নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষার নিম্নতর স্তরে প্রযোজ্য নয় এবং ধর্মীয় ও দৈহিক বিকাশের অনুকূল নয়, তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষণ-পদ্ধতি শিশুর ভূমিকাকে খর্ব করে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে বিশেষ ক্ষতি সাধন

করে, আগ্রহসৃষ্টি ও চরিত্রগঠন ব্যাপারে তিনি ধারণাগুলির ভূমিকার উপরে অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং শিক্ষণের ভূমিকাকে বড় বেশী অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত সমালোচনার পরেও তাঁর চিন্তার প্রসার, ক্ষুরধার যুক্তি এবং বিচক্ষণতার (অনেক ক্ষেত্রে) প্রশংসা না করে পারা যায় না। বস্তুতঃ একাধারে তিনি তিনি ছিলেন মহান্ দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ্ এবং এই দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ বেশী লোকের নামোল্লেখ করা যায় না। কেবলমাত্র প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, একুইনাস, লক্ ও ডিউই'র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সহজেই বোধ্য যে, তিনি মানবেতিহাসে কতবড় সম্মানের অধিকারী।

(ঘ) Friedrich Froebel

ফ্রোয়েবেল (১৭৮২—১৮৫২)

ফ্রোয়েবেলও রুশো-শিষ্য ছিলেন এবং পেস্তালৎসীর মত তাঁরও প্রয়াস ছিল রুশোর বৈপ্লবিক ও মানবতাভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্বকে বাস্তব জগতে রূপদান করার। তবে তাঁদের দুজন অপেক্ষা তিনি আরও অনেক বেশী ভগবৎ প্রেমে বিভোর ছিলেন এবং এই সর্বব্যাপী ভগবৎ প্রেম তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। দার্শনিক হিসাবে তিনি স্বভাবতই চরম ভাববাদী ছিলেন। তবে তিনি হার্বাটের মত মৌলিক ও মহান্ দার্শনিক ছিলেন না। তাঁর দর্শনের উপর Schelling ও Krause-এর (জার্মান দার্শনিকদ্বয়) দর্শনের প্রভাব বেশ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব প্রথমে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু পরে সেই প্রভাব শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও অনুভূত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কর্মপদ্ধতির দুটি লক্ষণ দেখা গেছে। একদিকে তিনি পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিতেন, অন্যদিকে তিনি অন্য শিক্ষাতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতেন। বিখ্যাত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির ফ্রোয়েবেলই হলেন জনক এবং শিক্ষাকে আনন্দপূর্ণ কর্ম ও খেলাভিত্তিক করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি জগৎব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং অমরতাও লাভ করবেন।

ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, শিক্ষা হল এমন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা আনন্দপূর্ণ কর্মের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ সংঘটিত করে। এই কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহজ সম্পর্কও স্থাপিত হয়। শিক্ষার দ্বারা ঐতিহাসিক বিবর্তন ও জীবতত্ত্বগত উদ্‌বর্তন সাধিত হয়, ফ্রোয়েবেল এ কথাও মনে করতেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়, সভ্যতার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শিশুর প্রকৃতিস্থ ঐশ্বরিক অংশকে (যা সৃষ্টিকর্মের মধ্য

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে) শিক্ষা বিকশিত করে তোলে বলে শিক্ষা একটি মূলতঃ ধর্মীয় প্রক্রিয়াও বটে। সুতরাং ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষা হল একটি স্বাভাবিক, জৈবিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া।

বিচিত্র এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার চরম লক্ষ্য হল, ফ্রোয়েবেলের মতে ধর্মীয়। বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন ও তাঁকে প্রকাশ করাই হল শিক্ষার দূরতম লক্ষ্য। তবে এই চরম লক্ষ্যসাধনের সোপান হিসাবে তিনি আশু লক্ষ্য হিসাবে সুষম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির কথাও বলেছেন। ফ্রোয়েবেলের মতে সুষম ব্যক্তিত্ব হল এমন একটি ব্যক্তিত্ব যার সমস্ত শক্তির বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঘটেছে, যে সামাজিক জীবনযাপনে দক্ষ এবং প্রকৃতভাবে প্রগতিপন্থী।

ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের বিকাশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে এবং সেই স্তরগুলি হল অতিশৈশব, শৈশব, বাল্য ও যৌবন। অতিশৈশবের প্রধান কর্মগত লক্ষণ হল ইন্দ্রিয়ের বিকাশ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের ধারণা ছিল খুবই কৃত্রিম, কেননা তিনি এই বিকাশের উপর হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারণাটিকে চাপিয়েছিলেন অর্থাৎ তার মাধ্যমেই ঐ বিকাশকে দেখতেন। শৈশবে শিশু নিজ অন্তরকে বাইরে আনতে চেষ্টা করে এবং শিক্ষা সুরু হয়। এই স্তরে ভাষাশিক্ষার সুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাম নির্বাচনের এবং প্রত্যেক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ফ্রোয়েবেল নির্দেশ দিয়েছেন। পেস্তালৎসীর মত ফ্রোয়েবেলও মনে করতেন যে, শিশুর কাছে বস্তু এবং নাম হল অভিন্ন। ভাষার উপর এত গুরুত্ব অর্পণ করলেও ফ্রোয়েবেল খেলাকে শৈশবের সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে খেলা হল শিশুদের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও উপযোগী কাজ, তাই তিনি এই স্তরের শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে খেলাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বিষয়বস্তু হিসাবে ফ্রোয়েবেল এই স্তরে চিত্রাংকন, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যরসপূর্ণ গল্প, মাটির কাজ এবং বল, ঘুটি প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর সঞ্চালনের উল্লেখ করেছিলেন। ভাববাদী দার্শনিক ফ্রোয়েবেল এই সবের অনেক গভীর অর্থের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বস্তু-গুলিকে তিনি 'দান' (অর্থাৎ 'ঈশ্বরের দান') এবং কর্মনিচয়কে 'স্বর্গীয়

কর্মাবলী' আখ্যা দিয়েছেন, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, এই সব বস্তু ও কর্মের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্তা এবং সামাজিক সত্তার সঙ্গে শিশুর সুগভীর যোগ সাধিত হয়।

বাল্যের সময়ে ফ্রোয়েবেল শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, বাল্যে শৈশবের বিকাশ ধারার মৌল পরিবর্তন ঘটে। তিনি মনে করতেন যে, বাল্যের প্রধান লক্ষণ হল শিক্ষালাভ ও বহির্বস্তুকে অন্তরে আনা, যেমন শৈশবের প্রধান লক্ষণ হল শুধু বাঁচা এবং অন্তরের বস্তুকে বহির্জগতে প্রকাশ করা। সুতরাং বাল্যের শিক্ষা পরিবেশনিয়ন্ত্রিত হবে, হবে না পূর্বের স্তরের মত আন্তর বস্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এখন রূপান্তরিত হবে বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষায়। কর্মফলে আনন্দবৃদ্ধির জন্য এখন খেলার স্থলে কর্মের দিকে হবে শিশুর প্রধান আকর্ষণ, নিছক কর্মে (ফলকে বাদ দিয়ে) এখন আর শিশু বিশেষ আনন্দ পাবে না। এই স্তরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, এই কর্মকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালিত করতে হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে (বিশেষ করে এই স্তরে) ফ্রোয়েবেল বিশদভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সব সময়ই তিনি মনে রেখেছিলেন যে, বিষয়-বস্তুগুলি হল শিশুর বিকাশের সহায়ক উপায়সমষ্টি মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, বিশ্বপ্রকৃতি, ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও মূল্যবোধসৃষ্টি প্রকৃত শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বিষয়বস্তুর চারটি মৌল শ্রেণীর তিনি উল্লেখ করেছেন: (১) ধর্ম ও ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা, (২) বিজ্ঞান ও গণিত, (৩) ভাষা ও (৪) শিল্পসম্পর্কিত শিক্ষা। শৈশবের শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে ফ্রোয়েবেল যেমন খেলার উল্লেখ করেছেন, এই স্তরের শিক্ষার জন্য তেমনি পদ্ধতি হিসাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের উল্লেখ করেছেন। তবে দুই ক্ষেত্রেই তিনি যৌথ কর্ম ও সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। স্পষ্টতঃ সময়াভাবে কৈশোরের জন্য ফ্রোয়েবেল বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেন নি।

ফ্রোয়েবেল যে শিশুশিক্ষায় স্বাধীনতার প্রবর্তন করতে চাইবেন এ কথা

সহজেই বোধ্য। তবে তাঁর স্বাধীনতার ধারণায় নিজস্বতা ছিল। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের কতকগুলি নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মগুলির পালনের মধ্য দিয়েই মানুষের স্বাধীনতার উদ্ভব হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ঐ একই ভাবে উদ্ভূত হয় বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিখ্যাত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তন তিনি করেছিলেন তারও মূলে রয়েছে এই নিয়মপালনের নির্দেশ। এই ক্ষেত্রে নিয়মপালনের প্রকৃষ্ট পথ হল এখানের সবকিছুকেই শিক্ষার্থীর স্বভাব ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত ও নির্ধারিত করা।

বিকাশ ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের উপরোক্ত মত থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, তিনি পূর্বতন শাসননির্ভর কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অবসান চাইবেন।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধীয় মতাবলীতেও ফ্রোয়েবেল যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন। যদিও তাঁর মতে নীতি হল মূলতঃ ধর্মনির্ভর এবং নৈতিক ধারণাবলীর ভিত্তি হল ধর্মীয় বা আধিবিদ্যক ধারণাবলী, তথাপি সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনকেই তিনি নীতিশিক্ষার প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। সামাজিক জীবনযাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় বোঝা যায় যে ফ্রোয়েবেল নীতিশিক্ষা বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর বেশী নির্ভর করতেন না। সুতরাং নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি পদ্ধতি হিসাবে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষণের তত্ত্বের প্রয়োগ করেছিলেন।

উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্যসমূহ সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর মতে বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল উত্তম সামাজিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়া শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে সাহায্য করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল নাগরিকতার শিক্ষাদান করা। তবে তিনি ফিক্‌টের মত উগ্র জাতীয়তাবাদী নাগরিক সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন এমন সব নাগরিক তৈরী করতে যারা আন্তরিকভাবে সমাজসেবক হবে, সমাজের মঙ্গলের জন্য সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকবে।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাঁর রূপকতা ও অত্যধিক ধর্মপ্রবণতাকে বাদ দিলে তাঁর মতাবলী মূলতঃ প্রগতিশীল

ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ হল শিক্ষার লক্ষ্য, বহুমুখী কর্মই হল শিক্ষার প্রকৃত বিষয়বস্তু, জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয় শ্রেষ্ঠ শিখন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের মাধ্যমে মানব জাতির উদ্বর্তন সত্যই সাধিত হয়, প্রকৃত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা স্বাধীনতাভিত্তিক এবং প্রকৃত স্বাধীনতাও নিয়মনির্ভর এবং শিশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ হল ঐ শিক্ষাকে তার প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণভাবে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের এই মৌলিক সত্যতা ও প্রগতিশীলতার জন্য বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্‌দের উপর তাঁর প্রভাব প্রভূতভাবে অনুভূত হয়েছে। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিক জন ডিউইর কর্মনির্ভর, সমাজসচেতন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ত্ব ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

(৬) Maria Montessori

মন্তেসরী

(১৮৭০—১৯৫২)

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে দুইজন শিক্ষাবিদ্ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন—ম্যাডাম্ মন্তেসরী ও জন ডিউই। জন ডিউই তত্ত্ব ও প্রয়োগ এই দুই দিকেই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু মন্তেসরীর প্রভাব প্রধানতঃ শিক্ষার ব্যবহারিক দিকেই নিবদ্ধ ছিল। মন্তেসরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হল যে, তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং অনেকটা সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। তবে বৈজ্ঞানিক প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রেরণাও কাজ করেছিল যেমন, প্রকৃতিবাদের প্রেরণা, কর্মতত্ত্বের প্রেরণা, সামাজিক প্রেরণা, এমনকি ধর্মীয় প্রেরণাও। প্রকৃতিবাদের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিশুর স্বাধীনতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে, কর্মতত্ত্বের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিশুর কর্মের উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর করার মধ্য দিয়ে, সামাজিক প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে দলগত ও সামাজিক কর্মের উপর জোর দানের মধ্য দিয়ে এবং ধর্মীয় প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে ধর্মের ভাষায় প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। সুতরাং মন্তেসরীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রচেষ্টা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক হলেও তা এক সঙ্গে সমন্বয়বাদীও বটে। সমন্বয়করণের এই প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মত বিংশ শতাব্দীর চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার একটি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং মন্তেসরী যে বিংশ শতাব্দীর একজন প্রকৃত প্রতিভূস্থানীয় শিক্ষাবিদ্ ছিলেন এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

মন্তেসরী নারী শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। এদিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বস্তুতঃ শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন নারী শিক্ষাবিদ্ই তাঁর মত শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণও যথেষ্ট রয়েছে। তবে নারীশিক্ষাবিদের এই অসামান্য কৃতিত্ব যে বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

শিক্ষাকে মন্তেসরী মূলতঃ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন, যার আশু লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। মন্তেসরী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই তাঁর চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। মন্তেসরীর পূর্ণাংগ বিকাশের ধারণার মধ্যে মানব-ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান সর্ব দিকের বিকাশের স্থানই রয়েছে যেমন, দৈহিক দিক, ইন্দ্রিয়সমূহের দিক, বৌদ্ধিক দিক, সামাজিক দিক, নৈতিক দিক, অনুভূতির দিক এবং ধর্মীয় দিক।

শিক্ষার পূর্ণাংগ বিকাশের লক্ষ্যকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য মন্তেসরী বিষয়বস্তু হিসাবে বহুমুখী কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তাঁর মতে বিষয়-বস্তু বলে পরিগণিত হতে হলে কর্মের দুটি লক্ষণ থাকা চাই—একটি হল আগ্রহ উদ্রেকের ক্ষমতা এবং অন্যটি হল শিক্ষার্থীর শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা। রুশো ও হার্বার্ট-শিষ্যদের মত মন্তেসরীও 'সাংস্কৃতিক স্তর তত্ত্বে' আস্থা রাখতেন, তাই তিনি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে বিষয়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা কম বলে এগুলির উপর তিনি এই স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

মন্তেসরী-উদ্ভাবিত পদ্ধতি তাঁর সমস্ত অবদানের মধ্যে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে এবং তার যৌক্তিক কারণও রয়েছে। সত্যই তাঁর পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট নূতনত্ব রয়েছে এবং তা বিজ্ঞান নির্ভরও বটে। মন্তেসরীর পদ্ধতি তিনটি ক্ষেত্রে প্রধানতঃ প্রযুক্ত হয়েছে—সাধারণ ব্যবহারিক জীবন, ইন্দ্রিয়-সমূহের শিক্ষা এবং লেখা, পড়া ও গণিত। মন্তেসরীর পদ্ধতি কয়েকটি তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এবং তা মনস্তত্ত্বনির্ভর। পদ্ধতিটি মনস্তত্ত্বনির্ভর এই জন্য যে, এতে শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায়, ঝোঁক ও চাহিদা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে, উপহারের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশকেও তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিন্যস্ত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যে সব প্রধান তত্ত্বের উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভরশীল সেগুলি হল (১) স্বাধীনতার তত্ত্ব, (২) বিকাশের তত্ত্ব, (৩) ব্যক্তিতার তত্ত্ব, (৪) আত্মশিক্ষার তত্ত্ব এবং (৫) পেশী ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশের তত্ত্ব। অর্থাৎ মন্তেসরী মনে করতেন যে, স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই

শিক্ষার্থীর বিকাশ সহজে সাধিত হয়, শিশুর বিকাশের অর্থ আন্তর শক্তিসমূহের অব্যাহত ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ধারা পৃথক, আত্মশিক্ষা হল শিখনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ এবং পেশী ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশের উপর অন্যান্য প্রকারের বিকাশ নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক মন্তেসরী স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতার বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন। বাইরের থেকে চাপান শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার তিনি আদৌ সমর্থক ছিলেন না। বিদ্যালয়ের স্বাধীন ও সুন্দর পরিবেশে দলগত কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তেসরীর মতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষাকার্যে শিক্ষকের সরাসরি হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে আত্মশিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্য শিক্ষকের উচিত শুধু প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করা এবং প্রধানতঃ পরিবেশবিন্যাসকারীর ভূমিকা গ্রহণ করা। শিশুর পরিবেশকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে (উপযুক্ত কার্য ও উপকরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে) হবে যে শিশু যেন আপনা হতে শিক্ষালাভ করতে পারে এবং তার সমগ্র প্রকৃতি পূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে। মন্তেসরী আত্ম-শিক্ষার সহায়ক বহু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলির সাহায্যে শিশুর বহুমুখী বিকাশ সার্থকভাবে সাধিত হয়। এই যন্ত্রপাতিগুলি তিনি হীনবুদ্ধিদের শিক্ষায় প্রযুক্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে দেখে উদ্ভাবন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মন্তেসরী শিক্ষাদানকার্যে প্রথম অভিজ্ঞতালাভ করেছিলেন এই হীনবুদ্ধিদের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই। হীনবুদ্ধিদের শিক্ষা-দানকার্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করার পর তিনি ভেবেছিলেন, যে পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ হীনবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য উপযোগী সেগুলি নিশ্চয়ই সুস্থ ও সাধারণ শিশুদের বেলায় বেশী উপযোগী হবে। তাই তিনি এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে পূর্বের পদ্ধতি ও উপকরণসমূহকে কিছুটা পরিবর্তিত করেছিলেন সুস্থ ও সাধারণ শিশুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা ভেবে। যাই হোক, মন্তেসরী শিক্ষককে প্রধানতঃ শিক্ষারঙ্গমঞ্চের দক্ষ বিন্যাসকারী

হিসাবে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাই তাঁর নাম আর শিক্ষক না রেখে 'পরিচালিকা' ('Directress') দিয়েছেন। শিক্ষকের নূতন কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে মন্তেসরী এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, শিক্ষকের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষককে বিনয়ী, সংযত ও শিশুপর্যবেক্ষণে দক্ষ হবার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন।

মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্বের ও শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র পেতে হলে তাঁর বিদ্যালয়ের রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে বিশদ পরিচয়ের প্রয়োজন। বিশদ পরিচয় প্রদান এখানে সম্ভব নয় বলে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই প্রদান করা হল। মন্তেসরীর বিদ্যালয়কে 'শিশুদের গৃহ' ('Children's House') বলা হয়, কেননা এখানের সব কিছুই শিশুর বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হয়। এই গৃহে অনেকগুলি ঘর থাকে এবং একটি বাগান থাকে যেটিকে শিশুরাই দেখাশোনা করে। এই বাগানে রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার জন্য কতকগুলি ছাউনিও থাকে। প্রধান ঘরটিতে লেখা-পড়ার কাজ চলে এবং তার সংলগ্ন ঘরগুলিতে নানা রকমের কাজ চলে। শিশুদের এই গৃহে শিশুরাই সব-কিছু করে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে খাবার দেওয়া এবং টেবিল পরিষ্কার পর্যন্ত সব কাজই তারা করে। স্নান করা, কাপড়-জামা পরা, বিছানা পাতা, জিনিসপত্র গুছিয়ে যথাস্থানে তুলে রাখা, এই সবই শিশুরা করে। নিজের মাপ নেওয়া, ওজন নেওয়া প্রভৃতি কাজও শিশুরা নিজেরাই করে। এই গৃহের আসবাবপত্রও এমনভাবে তৈরী যে শিশুরা অনায়াসেই সেইগুলি নাড়া-চাড়া করতে পারে এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। আনন্দের উপকরণও থাকে প্রচুর। পিয়ানো, বাদ্যযন্ত্র, ফুল, খেলনা, ছবি ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ শিক্ষার উপকরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে (পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হবে)। সুতরাং এই বিদ্যালয়গৃহ যে সার্থকভাবেই শিশুদের গৃহ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর সুন্দর, সুকোমল, সহানুভূতিশীল পরিবেশে শিশু-কোরকগুলি অন্তরের আনন্দে সহজেই ফুটে উঠে।

মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্ব ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক, লক্ষ্য সাধারণভাবে যুক্তিসহ,

বিষয়বস্তুর মৌলিক নীতিগুলি অনেকাংশে বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত, পদ্ধতি বিশেষভাবে উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক, উপকরণগুলি পথপ্রদর্শক হিসাবে উল্লেখযোগ্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ধারণা গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত এবং বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানবতার পরিচায়ক। রুশো-শিষ্যা মন্তেসরীর অবদান যে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে বহুকাল ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র
বাণীপুর
পো: বৈগাছি, ২৪ পরগণা

(চ) John Dewey

জন্ ডিউই

(১৮৫৯—১৯৫২)

জন ডিউই ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসম্বাদিত এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্বের ক্ষেত্রে বেশী প্রকট হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম যুগপৎ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর পূর্বে পশ্চিম জগতের ইতিহাসে শুধু প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, একুইনাস্, লক্ ও হার্বাট অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু যুগপৎ সমপর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব আজ পর্যন্ত কেউই অর্জন করেন নি।

জন ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক ছিলেন। প্রয়োগবাদকে তিনি অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিলেন এবং অসামান্য সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। জন ড়িউইর দর্শন ও শিক্ষাতত্ত্ব কিন্তু শুধু প্রয়োগবাদী নয়, এগুলি বিজ্ঞানবাদী ও গণতন্ত্রবাদীও বটে। অনেকের মতে ডিউইর শিক্ষাতত্ত্ব হল শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ত্ব এবং বিজ্ঞাননির্ভর শিল্পযুগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী। শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ চলতে পারে কিন্তু তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের বিশ্বব্যাপী প্রভাব অবিসম্বাদিত। বস্তুতঃ ইয়োরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলি ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতেও এই প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ডিউই শিক্ষাক্রিয়াকে সমাজ ও ব্যক্তি দুইদিক থেকেই দেখেছেন। সমাজের দিক থেকে প্রথমতঃ, শিক্ষা হল সমাজের মানসিক আত্মনবায়নের প্রধান উপায়, কেননা শিশুদের মধ্যে সঞ্চিত মানসিক সংস্কৃতির সঞ্চালন না হলে সমাজ মানসিক দিক থেকে বাঁচতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ. শিক্ষাদানকার্য হল সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, কারণ এই দায়িত্বের সুষ্ঠুপালনের উপর সমাজের সমগ্র মানসিক জীবনই নির্ভরশীল। তৃতীয়তঃ, শিক্ষা হল সামাজিক পরিচালনার অন্যতম প্রধান উপায়। জন্মগত অসামাজিক মানুষকে সামাজিক মানুষে পরিণত করার কাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, কেননা

মানসিক পরিবর্তন এনে শিক্ষা ঐ পরিচালনাকার্যকে সহজ করে তোলে। চতুর্থতঃ, শিক্ষাই হল সমাজের প্রগতিসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। নূতন অবস্থার উপযোগী আচরণগত পরিবর্তন এনে এবং সমাজের দোষ-ত্রুটির শোধনের ব্যবস্থা করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ব্যক্তির দিক থেকে শিক্ষা-প্রক্রিয়া, ডিউইর মতে, জীবন ও বৃদ্ধির সমার্থক। এর কারণ, জীবন বৃদ্ধি ভিন্ন থাকতে পারে না এবং বৃদ্ধি শিক্ষার দ্বারাই উৎকৃষ্টভাবে সাধিত হয়। মানুষের বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা ও আচরণের অবিরাম পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের মধ্যে সাধিত হয় বলে শিক্ষাকে ডিউই অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস-প্রক্রিয়া বলেও আখ্যাত করেছেন।

ডিউইর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণাংগ বৃদ্ধি। তবে তিনি বৃদ্ধি বলতে বিকাশকেও বুঝিয়েছেন এবং পূর্ণাংগ বৃদ্ধি বলতে সর্বদিকের বৃদ্ধিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সর্বদিকের বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের বস্তুসমূহের অর্থ (meaning) সম্বন্ধে মানুষের বোধশক্তি আরও অনেক ব্যাপক, গভীর ও সংহত হবে। অবশ্য এই সর্বদিকের বৃদ্ধি কোন স্থাণু অবস্থা নয়। এর প্রসার ব্যক্তি ও সমাজ এই দুই স্তরেই অবিরত চলতে থাকবে। অর্থাৎ ব্যক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৃদ্ধিও অবিরত ঘটতে থাকবে। পূর্ণাংগ বৃদ্ধি প্রধানতঃ পাঁচটি দিক দিয়ে (ডিউইর মতে) সংঘটিত হয় বলে এই পাঁচটি দিককেই ডিউই-বর্ণিত শিক্ষার আশু লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে পারা যায়। জীবনের এই পাঁচটি দিক হল: (১) কর্মনৈপুণ্যের দিক, (২) সামাজিক দিক, (৩) সৌন্দর্যবোধের দিক, (৪) বৌদ্ধিক দিক ও (৫) নৈতিক দিক। প্রয়োগ-বাদী, পরিবর্তনে গভীরভাবে বিশ্বাসী জন্ ডিউই অবশ্য সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরিবর্তনশীল বিশ্বে জীবন ও শিক্ষার কোন লক্ষ্যই চিরস্থায়ী হতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁর নিকটে সমস্ত লক্ষ্যই হল পরিবর্তনশীল ও পরীক্ষানির্ভর।

শিক্ষার বিষয়বস্তুসম্বন্ধেও জন ডিউইর মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডিউইর মতে বিষয়বস্তু বলতে বোঝায় সেই সমস্ত জিনিসকে যেগুলিকে কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সুষ্ঠু সমাপ্তির জন্য জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই দিক থেকে বিচার করলে প্রচলিত পাঠ্যবস্তুগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়গুলি (subjects) শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্তু হতে পারে না, কেননা এইগুলিকে শিশুরা তাদের

উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সমাধানের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। পাঠ্য-বিষয়গুলি (subjects) হল আসলে অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানের সমষ্টি এবং তাদের বিন্যাস তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হয়। বৌদ্ধিক বিকাশ কম হওয়ায় শিশুরা এই উন্নত ধরণের বিষয়বস্তুকে তাদের ব্যবহারিক সমস্যাসমূহের সমাধানে ব্যবহার করতে পারে না। আসলে বিষয়গুলি হল বয়স্কদের উপযোগী বিষয়বস্তু। তবে শিশুদেরও পরে—আরও পরিণত অবস্থায়—এই বিষয়বস্তুকেই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং এই বিষয়বস্তুর দিকেই ক্রমে শিশুদের এগিয়ে যেতে হবে। শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্তু থেকে পরিণত বয়স্কদের বিষয়বস্তুতে পৌঁছাতে গেলে, ডিউইর মতে, তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং সেই তিনটি পর্যায় হল : (১) বস্তুকে আয়ত্তে আনার সরাসরি অর্জিত জ্ঞান, (২) অন্য লোকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও (৩) বিজ্ঞান। তার মানে শিশুদের প্রথমে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি জ্ঞানলাভ করতে হবে, তৎপরে অপরের অভিজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং সর্বশেষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্তের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। ডিউইর মতে, বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ স্তরে সমস্ত বিদ্যার্থী নাও পৌঁছাতে পারে। ডিউই আরও বলেছেন যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর বৌদ্ধিক, সামাজিক ও মূল্যগত (value) উপযোগিতা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়, বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক এবং উপভোগ্যও হতে হবে। এই উপভোগ্যতা দুই দিক থেকে আসে। একদিকে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে হবে এবং অন্যদিকে নিজের গুণের জন্যই উপভোগ্য হতে হবে। স্বভাবতঃই উপভোগের দিক থেকে সাহিত্য ও কারুশিল্পের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী কেননা উচ্চাংগের উপভোগ এদের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব হয়। ডিউই আরও বলেছেন যে বিষয়বস্তুগুলিকে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে, কেননা জীবন অবিভাজ্য ও অখণ্ড এবং বিষয়বস্তুগুলির উদ্ভব জীবন থেকেই হয়।

জন্ ডিউইর মতে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়, কেননা বিষয়বস্তু পদ্ধতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এবং পদ্ধতিও বিষয়-বস্তুকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করে। পদ্ধতিকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন (১) সাধারণ পদ্ধতি ও (২) ব্যক্তিনির্ভর পদ্ধতি এবং বলেছেন যে শিক্ষককে

এই দুই প্রকার পদ্ধতিই ব্যবহার করতে হবে, কেননা এরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণ পদ্ধতি হল অতীতের অভিজ্ঞতার ফল, অতীতের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা থেকেই এর উদ্ভব। আর ব্যক্তিগত পদ্ধতি হল প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত পদ্ধতি। সাধারণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে এই কারণে যে, অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানেও কাজে লাগে। আবার ব্যক্তিগত পদ্ধতিকেও ব্যবহার করতে হবে এই কারণে যে, নূতন অবস্থায়, নূতন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে, নূতন শিক্ষকের দ্বারা প্রকৃত সৃজনমূলক কর্ম নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্যমেই সাধিত হতে পারে। সাধারণ পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার পর অবশ্য এই ব্যক্তিগত পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হয়, কেননা পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। ডিউইর মতে চিন্তার পদ্ধতিই হল শিক্ষণের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও সাধারণ পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে পাঁচটি সোপানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়ঃ (১) অভিজ্ঞতা (experiential situation), (২) সমস্যা (problem), (৩) তথ্য (data), (৪) প্রকল্প (hypothesis) (৫) ও (প্রকল্পের) সত্যতা নিরূপণ (verification)। অর্থাৎ সুষ্ঠু চিন্তাকার্যে যে পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় শিক্ষাক্রিয়াতেও সেই পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, কারণ চিন্তনই (thinking) হল শিক্ষণের সর্বাপেক্ষা ভাল পদ্ধতি। সুষ্ঠু ব্যক্তিগত পদ্ধতিরও কয়েকটির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ডিউই করেছেন। তাঁর মতে সুষ্ঠু ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষক সরাসরি এগিয়ে যান, মনকে নূতন সত্যের জন্য সর্বদা উন্মুখ রাখেন, একটি উদ্দেশ্যের দ্বারাই মনকে চালিত করেন, কর্মের পূর্বে পরিণতির কথা ভাবেন ও কর্মের পরিণতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এগুলি হল ব্যক্তিগত পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধেও ডিউইর মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে আগ্রহের উদ্রেক হলেই শিশুরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা হয়। অর্থাৎ কাজটি ভাল লাগা চাই এবং কাজটি ভাল লাগলেই আগ্রহ ও চেষ্টার উদ্ভব হবে এবং তার মধ্য দিয়ে শিশুর আচরণ সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। ডিউই নীতিশিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন এবং সমাজের বাইরে যে নীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না তা তিনি বিশ্বাস করতেন।

তাঁর মতে নৈতিক বা সামাজিক শিক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হল ভালভাবে সামাজিক জীবনযাপন করা। নীতিশিক্ষাদানের জন্য তিনি বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর সুস্থ ও প্রাণবন্ত সমাজ গড়ে তোলবার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সেই সমাজের সঙ্গে বাইরের বৃহত্তর সমাজের গভীর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। স্বভাবতই ডিউই নীতিশিক্ষায় নৈতিক উপদেশদানের স্থান অত্যন্ত গৌণ বলে মনে করতেন।

ডিউইর মতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষককে সর্বপ্রথমে ভাল অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল অভিজ্ঞতা, ডিউইর মতে, হল সেই অভিজ্ঞতা যা পরবর্তী অভিজ্ঞতার পথ উন্মুক্ত করে এবং শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ ভাল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পথ রোধ করে না এবং পরিবেশের সঙ্গে শিশুর সৃজনমূলক যোগসাধন করে। ভাল অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা সুতরাং মোটেই সহজ কাজ নয় এবং তাই শিক্ষককে সর্বদাই সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবং প্রয়োজন মত শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। তথাপি শিক্ষকের সরাসরি ব্যক্তিগত প্রভাবকে ডিউই, রুশোর অনুসরণে, কমাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষকের কার্যকে অভিজ্ঞতার পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

গণতন্ত্রের পূজারী ডিউই স্বভাবতই বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক তত্ত্বের পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন। তাই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি বাইরের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যুক্তভাবে বিদ্যালয়জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচন ও নির্ধারণ, শৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক জীবন-পরিচালনা এবং পুস্তক ও শিক্ষামূলক কর্ম নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের রূপ সম্বন্ধে ডিউইর মত সহজেই অনুমেয়। তথাপি সংক্ষেপে তা পরিবেশন করা হল। তাঁর মতে, বিদ্যালয় হবে একটি সমাজ, কিন্তু তার সঙ্গে বাইরের বৃহত্তর অনিয়ন্ত্রিত সমাজের যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে। এই সমাজ হবে সরলীকৃত (simplified), কেননা বাইরের জটিল জীবনকে

শিশুরা তাদের সীমিত শক্তির দ্বারা আত্মস্থ করতে পারবে না। এটি পরিশুদ্ধ-ও হবে, কেননা শিশুকে বাইরের সমাজের আবিলতার সম্মুখীন হতে দিতে পারা যায় না। এই সমাজ আরও সামঞ্জস্যপূর্ণও হবে, কেননা বাইরের সমাজে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মধ্যে যে সজ্ঘর্ষ বাধে বিদ্যালয়ে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া চলে না। বিদ্যালয়জীবনকে সংহত ও সুসমঞ্জস হতেই হবে শিক্ষাক্রিয়ার পূর্ণ ফল প্রাপ্তির জন্য।

জন্ ডিউইর বহুখ্যাত শিক্ষাতত্ত্বের বিশদ মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয় বলে শুধু তার কয়েকটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণে ডিউই ব্যক্তি ও সমাজ দুই দিক থেকে অগ্রসর হয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষার লক্ষ্যনিরূপণ বিষয়ে ব্যক্তি ও সমাজের অবিরাম বৃদ্ধির কথা তুলে তিনি শিক্ষাকে জড়ত্বের কবল থেকে বাঁচাতে সার্থকভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। বিষয়বস্তুকে শিশুপ্রকৃতির উপযোগী করে উপস্থাপিত করে তিনি শিক্ষাক্রিয়াকে সার্থকতার পথে অনেকটা উত্তীর্ণ করেছেন। পদ্ধতি বিষয়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং চিন্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি শিক্ষাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত দিকের প্রতি অনেকটা সুবিচার করেছেন। নিয়মানুবর্তিতাকে আগ্রহমূলক চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে এবং নৈতিক শিক্ষায় নৈতিক জীবনযাপনের উপর জোর দিয়ে ডিউই যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র গণতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হয়ে ডিউই গণতন্ত্রের উপর বিপুল আস্থার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ ডিউই মনে করতেন যে, একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব এবং তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিসমূহ
(Logical and Psychological Methods)

শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষা-পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশী। কেননা এই পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর (যা হল শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়) সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর নিকটে যোগ্যভাবে বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করে পরিবেশন করাই হল শিক্ষাপদ্ধতির কাজ। বিষয়বস্তুর এই যোগ্য বিন্যাস ও পরিবেশন না হলে সমস্ত শিক্ষা কার্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুই প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এক প্রকারের পদ্ধতিকে বলা হয় যৌক্তিক পদ্ধতি এবং অন্য প্রকারের পদ্ধতিকে বলা হয় মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি। যৌক্তিক পদ্ধতি (তার নাম থেকেই বোঝা যায়) যুক্তিনির্ভর এবং মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি স্বভাবতঃই শিশুপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যৌক্তিক পদ্ধতি প্রেরণা পায় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি থেকে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেই পদ্ধতির রাজ্যে অগ্রসর হয়। বিষয়বস্তুগুলি (বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়রূপে) হল আসলে যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত অতীত জ্ঞানের সমষ্টি, সেইজন্য যৌক্তিক পদ্ধতি বিষয়বস্তুর আয়ত্ত করার কাজে যুক্তির দিক থেকেই অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি শিশু প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য-গুলিকে অনুধাবন করে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয় এবং তাই এই প্রকারের পদ্ধতি শিশুপ্রকৃতি থেকেই মুখ্যতঃ প্রেরণা লাভ করে। এই প্রকারের পদ্ধতি দেখে শিশুর শক্তি, প্রবণতা, ইচ্ছা, মনোভাব ও অতীতের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কিরূপ এবং সেই পর্যালোচনার উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হয়। সুতরাং যৌক্তিক পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ রুশোর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যৌক্তিক পদ্ধতিরই আধিপত্য ছিল। তার কারণ হল দুটি। রুশোপূর্ব সমাজ অর্থাৎ গণতন্ত্রপূর্ব সমাজ ছিল প্রভুত্বভিত্তিক (authoritarian), তাই সেই সমাজে ব্যক্তির বিকাশ এবং তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে সমাজের লক্ষ্য ছিল না এবং সেইজন্য শিশুরাও ছিল অনাদৃত। সেই সমাজে শিশুদের পৃথক চাহিদার

কথা ভাবা হত না এবং তাই বড়দের বেলায় যা প্রযোজ্য তাই ছোটদের বেলাতেও প্রয়োগ করা হত, একটু সরল করে মাত্র। মানবতাবোধের অভাবের জন্য শিশুমনস্তত্ত্বও ছিল অনুদ্‌ঘাটিত এবং কাজ চালাবার জন্য ভেবে নেওয়া হত যে শিশুরা হল 'ক্ষুদ্র বয়স্ক ব্যক্তি সমষ্টি' (miniature adults)। গণতান্ত্রিক সমাজদর্শনের আবির্ভাবের ফলে সমাজের অন্যান্য অনেক অবহেলিত সম্প্রদায়ের মত শিশুসম্প্রদায়ের উপরও লক্ষ্য পড়ল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার দাবী উঠল। এই শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক, কেননা এর কেন্দ্রস্থলে বিষয়বস্তুকে নয়, শিশুকে বসাবার কথাই বলা হল। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের প্রকাশ স্থুরু হল এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে এই নূতন শিক্ষাও অনেকদূর অগ্রসর হল। পেস্তালৎসী ও ফ্রোয়েবেলের সময় থেকে তাই অনেক প্রকারের মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এদের সকলেরই মূল কথা হচ্ছে শিশুমনস্তত্ত্বনির্ভরশীলতা। শিশুদের যুক্তিক্ষমতা অপরিণত থাকে বলে এবং শিশুরা কর্মচঞ্চল বলে এই সমস্ত পদ্ধতিতেই কর্মের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিমূর্ত চিন্তনের স্থান থাকে খুবই কম।

উপরে আমরা যৌক্তিক ও মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে বিরোধের কথা বলেছি। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ঐ বিরোধ হল অপেক্ষাকৃত স্থূল, মূলতঃ কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই। কারণ দেখা যাবে যে, দুই প্রকারের পদ্ধতিই হল আসলে যৌক্তিক ও মনস্তত্ত্বনির্ভর। যে সব পদ্ধতিকে সাধারণতঃ মনস্তত্ত্বনির্ভর বলা হয় সেগুলি সাধারণতঃ অপরিণত শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বনির্ভর এবং যাকে আমরা যৌক্তিক পদ্ধতি বলি তা হল পরিণত শিক্ষার্থীদের এবং বয়স্কদের মনস্তত্ত্বনির্ভর। সুতরাং দুই মনস্তত্ত্বনির্ভর। তেমনি যে প্রকারের পদ্ধতিকে আমরা মনস্তত্ত্বনির্ভর বলি তা হল (সমগ্র শিক্ষাক্রিয়া ও তার পরিণতির কথা ভাবলে) একান্তভাবে যৌক্তিক, কেনসা অপরিণত শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য প্রকারের পদ্ধতি আদৌ ফলপ্রসূ হবে না এবং তাই হবে নিতান্ত অযৌক্তিক। সুতরাং দুই প্রকারের পদ্ধতিই হল যৌক্তিক।

তবে যদিও দুই প্রকারের পদ্ধতিই হল যৌক্তিক ও মনস্তত্ত্বনির্ভর, তথাপি একই অবস্থায় তারা যৌক্তিক বা মনস্তত্ত্বনির্ভর নয়। অপরিণত

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে যা মনস্তত্ত্বনির্ভর বা যৌক্তিক পরিণত শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে তা মনস্তত্ত্বনির্ভর বা যৌক্তিক নয়। সুতরাং অপরিণত শিশুরক্ষেত্রে যে বা যে সব পদ্ধতি প্রযোজ্য সেই বা সে সব পদ্ধতি পরিণত শিক্ষার্থীর বেলায় প্রয়োজ্য নয়। বস্তুতঃ, তথাকথিত মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতিগুলিই অপরিণত শিশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী এবং তথাকথিত যৌক্তিক পদ্ধতি পরিণত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী।

এখন আমরা কয়েকটি ছোট উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত দুই প্রকারের পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করবার চেষ্টা করব। আধুনিক বিদেশী ভাষা শিক্ষায় যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণের পথে এগোয় এবং মাতৃভাষার সাহায্যও বিশেষভাবে নেয়, কিন্তু মনস্তত্ত্ব-নির্ভর পদ্ধতিগুলি ভাষাগত অভ্যাস সৃষ্টির দিকে বেশী নজর দেয় এবং মাতৃভাষাকে কোন বিশেষ স্থান দেয় না। গণিত শিক্ষাদানের বিষয়ে যৌক্তিক পদ্ধতি সরাসরি বিমূর্ত চিন্তার পথে এগিয়ে যায় বাস্তব অবস্থার কোন অবতারণা না করেই, কিন্তু মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়েই বিমূর্ত সংখ্যার রাজ্যে এগিয়ে যায়। ইতিহাস শিক্ষায় যৌক্তিক পদ্ধতি নাম-ধাম ও ঘটনাপরম্পরার কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি গল্প, নাটক, চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ঐতিহাসিক জ্ঞানদান করে। ভূগোল শিক্ষায় যৌক্তিক পদ্ধতি দূরস্থিত স্থান ও দেশের আলোচনা সরাসরি সুরু করে দেয় এবং মস্ত মস্ত স্থান ও বস্তুর নামের তালিকা উপস্থাপিত করে, কিন্তু মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি পরিপার্শ্বিক স্থানের অনুধাবন থেকে দূরস্থিত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য, সমস্ত ক্ষেত্রেই যৌক্তিক পদ্ধতি প্রধানতঃ বুদ্ধির (বিমূর্ত চিন্তার) সাহায্য নেয়, এবং মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি সাহায্য নেয় প্রধানতঃ কর্মের। শেষের পদ্ধতিতেও যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু তা হল ইন্দ্রিয়নিচয় ও দেহনির্ভর, অর্থাৎ কর্মনির্ভর।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ কয়টিতে কয়েকটি মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতি ও পরিকল্পনার আলোচনা নিবদ্ধ হল। স্বভাবতঃই মনস্তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতির উদাহরণ রূপে সেই গুলিরও উল্লেখ করা যায়।

ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের বাগান নামে এক প্রকার বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে খেলার মাধ্যমে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের (৩-৭ বৎসর পর্যন্ত) শিক্ষা দেওয়া হত। ফ্রোয়েবেল কিন্তু শিক্ষাকে মোটেই সঙ্কীর্ণ অর্থে নেন নি। শিশুর সর্বাংগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব তিনি শিক্ষার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সুতরাং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে খেলার মাধ্যমে শিশুদের সর্বাংগীন বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টাই করা হত। এই বিদ্যালয়ে প্রযুক্ত পদ্ধতিই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি নামে খ্যাত। খুব ব্যাপক ভাবে দেখলে খেলাই হল এই বিদ্যালয়ের মৌল পদ্ধতি। তবে খেলাকে পরিচালিত করবার জন্য এই বিদ্যালয়ে অনেক রকমের শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি ও কর্মের প্রয়োগ করা হত। সুতরাং ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতি বলতে সাধারণতঃ খেলার যে বিশেষ পদ্ধতি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োগ করা হত তাকেই বোঝান হয়। নিম্নে আমরা ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মূলগত তত্ত্বসমূহেরও কিছু পরিচয় দেব।

ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির মূলগত তত্ত্বসমূহ

ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির পশ্চাতে কয়েকটি ব্যাপক দার্শনিক তত্ত্ব বর্তমান। এই তত্ত্বকয়টির সঙ্গে কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

(১) ঐক্যতত্ত্ব—ফ্রোয়েবেল মনে করতেন বিশ্বের সমস্ত বস্তুই এক অনন্ত ঐক্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বড় ঐক্য হল বিশ্ব এবং এই বিশ্বের ঐক্য-বিধায়ক শক্তি হলেন ঈশ্বর। সুবৃহৎ বিশ্বের ঐক্যের মধ্যে কিন্তু অসংখ্য ঐক্য বর্তমান যাদের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক হল জীবদেহের সঙ্গে জীবকোষের সম্পর্কের মত। মানুষও হল একটি ঐক্য যার সঙ্গে বৃহত্তম ঐক্য অর্থাৎ বিশ্ব এবং অন্যান্য ঐক্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান।

(২) বিকাশ তত্ত্ব

ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই বিবর্তিত হচ্ছে এবং

বিবর্তিত হচ্ছে তাদের আপন আপন বিকাশের ধারা অনুযায়ী। সুতরাং মানুষও বিবর্তিত হচ্ছে তার বিকাশের বিশেষ ধারা অনুযায়ী। তবে মানুষ হল বিশ্বের উদ্বর্তনধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং সে তার আপন পরিণতি ও সীমার স্বরূপ বুঝতে পেরেছে বলে তার সমস্ত শক্তিকে আপন বিকাশ ক্রিয়াকে সার্থকতর করে তোলবার জন্য নিয়োগ করতে পারে। এবং এই ভাবে নিয়োগ করা তার কর্তব্যও। তবে বিকাশের ধারা বিভিন্ন বস্তুর পৃথক হলেও শেষ পর্যন্ত সবাই একই ঐক্যের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে। তার কারণ এই বিশ্বের মূল শক্তি একই এবং সেই শক্তি সর্ব বস্তুর পরিচালনকারীও বটে আবার পরম লক্ষ্যবস্তুও বটে। সমস্ত কিছুর বিকাশের মধ্য দিয়ে ঐ একই শক্তির ইচ্ছার প্রকাশ হয়।

(৩) আত্মনিয়ন্ত্রিত কর্মের তত্ত্ব

ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, মানুষের বিকাশ সার্থক হয় আত্মনিয়ন্ত্রিত কর্মের মাধ্যমে। তবে এই কর্ম হওয়া চাই বহুমুখী, কেননা মানুষের প্রকৃত বিকাশ হল বহুমুখী।

(৪) সমাজের মাধ্যমে ব্যক্তিতার বিকাশ তত্ত্ব

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তুই পারস্পরিক সম্পর্কের জালে বদ্ধ। কিন্তু মানুষের কাছে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতঃই হবে নিবিড়তম। তাই সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানবিক বিকাশের সার্থকতম প্রকাশ হয় ফ্রোয়েবেল এমনি মনে করতেন।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের স্বরূপ ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি

কিণ্ডারগার্টেন শব্দটির মধ্যেই ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিণ্ডারগার্টেন শব্দটি জার্মাণ এবং তার অর্থ-হল 'শিশুদের বাগান'। শিশুদের ফ্রোয়েবেল চারা-গাছের মত মনে করতেন এবং তাঁর মতে শিক্ষকদের কর্তব্য হল মালীর কাজ করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় রূপ বাগানে শিশুরূপ চারাগাছকে শিক্ষকরূপ মালীদের সযত্নে পালন করে বিকশিত করে তুলতে হবে—এই ছিল বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের অভিমত। ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, গাছ যেমন ভাল

পরিবেশে নিজের ধর্মেই বেড়ে উঠে, শিশুও তেমনি অনুকূল পরিবেশে অন্তরস্থ নিয়মেই আপনা হতে বিকশিত হয়ে উঠে। দুই ক্ষেত্রেই ভাল বিকাশের জন্য প্রয়োজন হল খারাপ প্রভাবসমূহকে দূরে রাখা এবং ভাল পরিবেশের ব্যবস্থা করা। কিণ্ডারগার্টেনে ফ্রোয়েবেল এই দুইরকম ব্যবস্থার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। শিশুর জন্য তিনি সুন্দর, স্বাধীন ও আনন্দময় সামাজিক পরিবেশ গড়তে চেষ্টা করেছিলেন এবং আত্মবিকাশের পথ সহজ করবার জন্য বহু প্রকারের উপকরণ ও কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এই স্তরের সব কর্মই হল আসলে খেলা, কেননা শিশুর আত্মসক্রিয়তা খেলার মাধ্যমেই সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। খেলাকে বিকাশের সহায়ক করবার জন্য ফ্রোয়েবেল শিক্ষকদের খেলায় উৎসাহ দিতে, খেলার মধ্যকার ভাল উপাদানগুলিকে রক্ষা করতে এবং খারাপ উপাদানগুলিকে বিদূরিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ খেলা হবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক থাকে না। এখানে শিশুদের গান, অঙ্গসঞ্চালন ও গঠনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশে উৎসাহিত করা হয়। তবে এই তিন রকম কাজ এক সঙ্গেই চলে। অর্থাৎ যে বস্তু নিয়ে গান করা হয় (যেমন, কোন গল্প) তাকে নিয়েই নাটকীয় অঙ্গসঞ্চালন করা হয় এবং নানা জিনিস গড়াও হয়।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে ৫০টি গান শেখাবার বন্দোবস্ত আছে। এই ৫০টি গানই কোন খেলা, কোন কার্য কিম্বা শিশুদের কোন একদিকের বিকাশ সংঘটন ব্যাপারে প্রয়োজনে লাগে।. শিক্ষক গানগুলিকে শিশুদের বিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নির্বাচিত করেন ও সাজান।

ফ্রোয়েবেল শিশুদের বিকাশ সুনিশ্চিত করবার জন্য ২০টি দানের ('gifts') ব্যবস্থা করেছেন। এই ২০টি শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ একসঙ্গে খেলারও বস্তু এবং বিকাশেরও উপকরণ। এগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়, সংখ্যার ধারণা গড়ে উঠে এবং বস্তু নিচয়ের আকৃতি ও উপরিভাগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। শিশুদের বিকাশের ধারাকে মনে রেখেই এই শিক্ষাবিষয়ক বস্তুগুলিকে সাজান হয় বা উপস্থাপিত করা হয়। এই উপকরণগুলিকে নিয়ে যে সব কাজ করা যায় ফ্রোয়েবেল

তাদের নাম 'কর্ম' ('occupation') দিয়েছিলেন। যদিও দানগুলির সংখ্যা হল ২০ তথাপি প্রথম সাতটিকেই এখন দান বলা হয়।

প্রথম দানের অন্তর্গত হল ৬টি রঙীন পশমের বল। সংশ্লিষ্ট কর্ম হল এদের গড়িয়ে দিয়ে খেলা করা। এই কর্মের মধ্য দিয়ে বহু গুণের উদ্ভব হয় ফ্রোয়েবেল এমনি ভাবতেন। এমনকি আধ্যাত্মিক বিকাশও অজ্ঞাতে সাধিত হয় এমনি তাঁর ধারণা ছিল। দ্বিতীয় দানের অন্তর্গত হল একটি গোলাকৃতি বস্তু, একটি চৌকো নিরেট বস্তু এবং একটি চোঙ্গার মত বস্তু। তৃতীয় দানের মধ্যে রয়েছে একটি বড় চৌকো কাঠের বস্তু যেটিকে ৮টি ছোট চৌকো বস্তুতে পরিণত করা যায়। এমনি করে প্রত্যেকটি দানের মধ্যে কয়েকটি করে খেলানির্ভর শিক্ষার বস্তু আছে যেগুলিকে নিয়ে খেলা করতে করতে শিশুদের বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়।

ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রাক্ প্রাথমিক স্তরেই প্রযোজ্য। তবে তিনি পরবর্তী স্তরের জন্যও শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নির্দেশ স্পষ্টতঃ কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি সম্পর্কিত না হওয়ায় এখানে আলোচিত হল না।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির বহু **গুণের** মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ নিম্নে করা হল :

(১) বিদ্যালয়কে বাগান বলে কল্পনা করার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে। ফ্রোয়েবেল সেই অভিনবত্ব পূর্ণভাবে দাবী করতে পারেন।

(২) শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে বিকাশের মূলসূত্র বলে মনে করে এবং খেলাকে আত্মসক্রিয়তার প্রধান রূপ মনে করে ফ্রোয়েবেল শৈশবের আসল প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষ ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

(৩) খেলাকে মৌল পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে ফ্রোয়েবেল সমস্ত আধুনিক খেলাভিত্তিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

(৪) ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপকরণ সৃষ্টি করে ফ্রোয়েবেল এক প্রতিভাবান উদ্ভাবক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী অনেককে ঐ পথে আকৃষ্ট করেছেন।

(৫) শিশুর বিকাশে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্ব অর্পণ করে ফ্রোয়েবেল ব্যক্তিতা ও সামাজিকতার সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

(৬) শৈশবের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণও ফ্রোয়েবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। বিশ্বব্যাপী কিণ্ডারগার্টেনের প্রসারই এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা বড় সাক্ষ্য।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির **দোষও** আছে। কয়েকটি মাত্র ত্রুটির উল্লেখ এখানে করা হল :

(১) ফ্রোয়েবেলের দানগুলির রূপকতা অত্যধিক। তিনি দানগুলির গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি সহজবোধ্য নয়, শিশুদের কাছে ত' নয়ই।

(২) ফ্রোয়েবেলের অনেক সঙ্গীত ও ছবি বর্তমানে কার্যকরী নয়।

(৩) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ব্যক্তিতার বিকাশের চেয়ে সামাজিক বিকাশের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৪) উপকরণ ও কর্মের ব্যাপারে শিশুদের স্বাধীনতা বিশেষ নেই। এ যেন জোর করে খেলান। ফলে খেলার সত্ত্বাই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) সংপৃক্তিকরণের প্রয়োগ আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত।

(৬) শিশুদের ইন্দ্রিয়শিক্ষা স্বাভাবিক কর্মাবলীর মধ্য দিয়েই ভাল করে সংঘটিত হয়। সুতরাং অত্যধিক উপকরণের ব্যবহার উপকারী না হতেও পারে।

তবুও ফ্রোয়েবেলের অবদানের মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। শিশুদরদী মহাপ্রাণ শিক্ষাবিদ্ হিসাবে নিশ্চয়ই বহুকাল ধরে তিনি মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

মন্তেসরী পদ্ধতি

(Montessori Method)

ভূমিকা

সাধারণ জীবনে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ ও মনোভাবের প্রসার ও মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষায় ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া সুরু হয়েছিল। অন্যান্য অনেক শিক্ষাবিদের মত মাদাম মন্তেসরীও শ্রেণী-শিক্ষার অর্থাৎ দলগত শিক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত বিখ্যাত 'মন্তেসরী পদ্ধতি' শ্রেণী-শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত বিকাশ সংঘটনে প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশকে তিনি যে অগ্রাহ্য করেন নি তা আমরা তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনার সময়ে দেখেছি।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, তিনি প্রথমে হীনবুদ্ধিদের শিক্ষাদানকার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং পরে সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সাধারণ সুস্থ শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। নিম্নে আমরা মন্তেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

মন্তেসরী পদ্ধতির মৌল তত্ত্বাবলী

মন্তেসরী পদ্ধতি কয়েকটি মৌল তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে সেই তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

(১) বিকাশের তত্ত্ব

রুশোর মত মন্তেসরীও মনে করতেন যে, শিশুর দেহ ও মন ধীরে ধীরে অন্তর থেকে বিকশিত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার কাজ হল এই বিকাশের ধারার সহায়ক রূপে কাজ করা।

(২) ব্যক্তিতার তত্ত্ব

মন্তেসরী মনে করতেন যে, প্রত্যেকটি শিশু তার নিজের ধারায় বিকশিত

হয়ে উঠে এবং এই নিজস্ব ভঙ্গিটিই হল ব্যক্তিতা। মন্তেসরী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদ্‌দের এই ব্যক্তিতার বিকাশে কখনও বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়, বরং এই ব্যক্তিতার বিকাশ সাধনই শিক্ষাবিদ্‌দের কর্তব্য।

(৩) স্বাধীনতার তত্ত্ব

এই তত্ত্বটি পূর্বের দুটি তত্ত্বেরই উপজাত ফল। আমরা দেখেছি যে, মন্তেসরী শিশুর দেহ-মনের বিকাশের জন্য এবং তার ব্যক্তিতার বিকাশের জন্য স্বাধীন আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর পদ্ধতি স্বাধীনতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং স্বাধীনতার তত্ত্ব হল তার একটি মৌলিক তত্ত্ব।

(৪) আত্মশিক্ষার তত্ত্ব

আত্মশিখনের পথই হল শিখনের শ্রেষ্ঠ পথ মন্তেসরী এমনি মনে করতেন। শিশু নিজের শিখনকে নিজেই পরিচালিত করতে পারে এবং বড়দের উপস্থিতি প্রধানতঃ বাধা সৃষ্টি করে এমন তিনি ভাবতেন। তবে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং তাই আত্মশিখন পরিচালনার জন্য শিক্ষাসহায়ক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

(৫) পেশীগত শিক্ষার তত্ত্ব

মন্তেসরী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় পেশীগত শিক্ষার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এই পেশীগত শিক্ষা সার্থক হলে শিক্ষামূলক (লেখা, আঁকা ইত্যাদি) ও সাধারণ বহু প্রকারের কর্মে (হাঁটা, দৌড়ান, সিঁড়িতে উঠা, সাধারণ কাজ করা ইত্যাদি) শিশু সহজে পারদর্শী হয়ে উঠে।

(৬) ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা

মন্তেসরী অল্প বয়সের শিশুর ইন্দ্রিয়ের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ের বিকাশের উপর বৌদ্ধিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে। তিনি মনে করতেন যে ইন্দ্রিয়ের বিচারই (sensory judgment) বৌদ্ধিক বিচারের ভিত্তি স্থাপন করে।

মন্তেসরী পদ্ধতি

'শিশুদের গৃহ' নামক স্বাধীনতাপূর্ণ বিদ্যালয়ে মন্তেসরী যে শিশুদের বহুমুখী বিকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের

সুন্দর পরিবেশের কথা মনে রেখেই মন্তেসরীর পদ্ধতির আলোচনায় আমরা নিম্নে অগ্রসর হচ্ছি।

মন্তেসরীর পদ্ধতিতে তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। একটি হল পেশীগত শিক্ষাপদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হল ইন্দ্রিয়গত শিক্ষাপদ্ধতি এবং তৃতীয়টি হল ভাষা ও গণিত শিক্ষাপদ্ধতি।

(১) পেশীগত শিক্ষাপদ্ধতি

বিভিন্ন সাধারণ কর্মে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুরা পেশীগত শিক্ষালাভ করে। শিশুরা এই বয়সে স্বভাবতঃই আপনা হতে পেশীগত শিক্ষালাভ খুব সার্থকতার সঙ্গে লাভ করতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয় শিক্ষকের পরিচালনার। বসা, চলা, দৌড়ান, খাবার দেওয়া, নিজেদের দেহের যত্ন নেওয়া, জামা-কাপড় পরা, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, বাগান করা, ছন্দপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালন করা, বিছানা পাতা, মাটির কাজ করা ইত্যাদি বহু প্রকারের সাধারণ কর্মের মাধ্যমে শিশুদের পেশীগত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব শিক্ষার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও করা হয়। যেমন জামা পরা ও খোলা শেখানর জন্য কাঠের ফ্রেমে কাপড় ও চামড়া দেওয়া থাকে। কাপড় ও চামড়ার খণ্ডগুলিকে একসঙ্গে বেঁধে, বোতাম দিয়ে এবং হুক লাগিয়ে যুক্ত করা যায়।

(২) ইন্দ্রিয়গত শিক্ষা

ইন্দ্রিয়গত শিক্ষা শিশুদের প্রধানতঃ শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই দেওয়া হয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি হল সংখ্যায় একাধিক, সেইহেতু শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতিও হয় বহু প্রকারের। নিম্নে সেই যন্ত্রপাতিগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

(ক) নানা প্রকারের জ্যামিতিক নিরেট বস্তু (যেমন, গোলাকার, মোচাকৃতি, পিরামিডাকৃতি ইত্যাদি)

(খ) বিভিন্ন রংয়ের তিন সারি বিভিন্ন আকৃতির নিরেট বস্তু। যেমন, গোলাপী চৌকো জিনিস ও হলদে রং-এর কিম্বা খানিকটা লাল এবং খানিকটা নীল রং-এর লম্বা লাঠির মত বস্তু।

(গ) তিন সারি নিরেট 'ইন্সেট'। এই ইন্সেটগুলির খানিকটা অংশ কাটা থাকে যার মধ্যে অন্য বস্তু খাপে খাপে বসান যায়।

(ঘ) নানা প্রকারের কাপড়ের ছাঁট।

(ঙ) নানা ওজনের বিভিন্ন ছোট কাঠের টেবিল সমষ্টি।

(চ) খশ্‌খশে ও মসৃণ উপরিভাগবিশিষ্ট চৌকো টেবিলের সমষ্টি।

(ছ) দুটি বাক্স যার মধ্যে ৬৪টি রঙ্গীন কাষ্ঠখণ্ড থাকে।

(জ) তিন সারি কার্ড যেগুলির উপর জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট কাগজ আঁটা থাকে।

(ঝ) কতকগুলি চোঙ্গাকৃতি বাক্স।

এইগুলি ছাড়া **ইন্দ্রিয় শিক্ষার** জন্য আরও অন্য প্রকারের উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

মন্তেসরীর ইন্দ্রিয়শিক্ষার উপকরণগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা শুধু যে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যবহার করে তাই নয়, ঐ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়গত বিচারশক্তিও বাড়ে। একই প্রকারের বস্তুর মধ্যে মিল দেখান ও পার্থক্য দেখান এবং পৃথক বস্তুদের মধ্যে পার্থক্য দেখানর মধ্য দিয়েই এই বিচারশক্তির বিকাশের প্রচেষ্টা করা হয়। মন্তেসরী পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষাপরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্পর্শানুভূতিকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক অনুভূতি বলে মনে করতেন। স্পর্শানুভূতির বিকাশের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থাসমূহও অবলম্বন করেছিলেন।

(৩) পড়া, লেখা ও পাটিগণিত শিক্ষা

মন্তেসরী প্রথমে এই সবের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি, কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরের শিশুদের এই সব শিক্ষার উপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকে না। পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তিত করেছিলেন। মন্তেসরী-পদ্ধতিতে লেখা, পড়া ও পাটিগণিত শিক্ষা ইন্দ্রিয় শিক্ষার অব্যবহিত পরেই সুরু হয় এবং প্রায় ইন্দ্রিয় শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয়। শিশুরা এই ব্যবস্থায় পড়ার আগে লেখা শেখে এবং লেখা শেখে প্রথমে বালির কাগজে কাটা অক্ষরের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে। এই আঙ্গুল বুলানর মাধ্যমে শিশুরা অক্ষরগুলির দৃষ্টিশক্তি, পেশী ও স্পর্শ-সম্পর্কিত প্রতিরূপ (image) তৈরী করতে সমর্থ হয়। অক্ষরগুলির উচ্চারণ

সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়ার জন্য শব্দের সঙ্গে প্রতিরূপগুলির সংযোগ ঘটে। মন্তেসরী মনে করতেন যে, লেখার চেয়ে পড়া কঠিন এবং তাই পড়ার পূর্বেই লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষাবিদেরা তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নন। পাটিগণিতের প্রধান চারটি নিয়ম (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য মন্তেসরী বিভিন্ন মাপের দশটি কাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন, যাদের বলা হয় 'দীর্ঘসিঁড়ি'। কাঠিগুলি ১ থেকে ১০ ডেসিমিটার লম্বা। লেখা, পড়া এবং পাটিগণিত শিক্ষার জন্য মন্তেসরী অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন ঃ

(ক) কতকগুলি কাড যার উপর বালির কাগজে কাটা অক্ষর আঁটা থাকে।

(খ) রঙ্গীন পিচ্‌বোর্ডের দুটি বর্ণমালা। এদের আকৃতি হবে ভিন্ন প্রকারের।

(গ) এক সারি কার্ড যার উপর বালির কাগজে কাটা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা আঁটা থাকে।

(ঘ) এক সারি বড় কার্ড যার উপরে ১০ এর উপরের সংখ্যাগুলি মসৃণ কাগজকাটার মাধ্যমে আঁটা থাকে।

(ঙ) গণনা করবার জন্য দুই বাক্স ছোট কাঠি।

মন্তেসরী পদ্ধতির উপকারিতা

মন্তেসরী পদ্ধতির সৎগুণাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) শিক্ষাক্রিয়াকে বিজ্ঞাননির্ভর করবার প্রচেষ্টাই মন্তেসরীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

(২) তাঁর বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বাবলম্বী হওয়ার এবং সামাজিক গুণসম্পন্ন হবার যে শিক্ষা পায় তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা এই দুয়েরই শিক্ষা তারা পায়।

(৩) শিক্ষাবিষয়ক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তিনি একই সঙ্গে তাঁর দরদী হৃদয়ের এবং উচ্চাংগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

(৪) পড়ার পূর্বে লেখার ব্যবস্থা করে তিনি চিন্তার নিজস্বতার পরিচয়

দিয়েছেন এবং তাঁর লেখা শেখার নূতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৫) ইন্দ্রিয় শিক্ষার ও পেশীগত শিক্ষার দ্বারা লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষার পথ সুগম করবার চেষ্টা করে মন্তেসরী বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৬) শিক্ষায় স্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দিয়ে মন্তেসরী অসামান্য শিশুপ্রেম ও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন।

(৭) স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেমন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিকাশ হয় তা দেখিয়ে মন্তেসরী গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম করে দিয়েছেন।

মন্তেসরী পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ

(১) মন্তেসরী পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল এই যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের ও শিশুদের সৃজনীশক্তির স্ফুরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেই। যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার মানুষকেও অনেকটা যন্ত্রে পরিণত করে। নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের বা যন্ত্রের বাইরে শিক্ষালাভের সুযোগ এই পদ্ধতিতে প্রায় নেই।

(২) ইন্দ্রিয়শিক্ষার ব্যবস্থাটি আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিরোধী। পৃথকভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। ইন্দ্রিয়শিক্ষার সাধাধণ ব্যবস্থা অচল, কেননা এক অবস্থার শিক্ষা অন্য অবস্থায় কাজ করে না। আর ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ ও শিক্ষা পৃথকভাবে নয়, এক সঙ্গেই ভালভাবে সংঘটিত হয়।

(৩) প্রাক্‌শৈশবকালে দৈহিক ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশই শুধু প্রয়োজন, এ ধারণাও ভুল। ছোট শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটে, তাই উপযোগী বৌদ্ধিক শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) ছোট শিশুদের শিক্ষায় আরও বেশী করে সংপৃক্তীকরণের (correlation) প্রয়োজন রয়েছে। ছোটদের নানা দিকের শিক্ষা একই কার্য বা অবস্থার মধ্য দিয়েই সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে দেওয়া যায়। সুতরাং পৃথকভাবে বিভিন্ন দিকের শিক্ষা যতটা কম দেওয়া হয় ততই ভাল, কিন্তু এই পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৫) ছোটদের মনের খবরের চেয়ে মন্তেসরী দৈহিক খবরের উপরই বেশী মূল্য দিয়েছেন। দেহের মাপ-জোপের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিচয়ও প্রয়োজন।

ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরীর পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরী দুই জনেই প্রাক্‌প্রাথমিক (৩-৭ বৎসর) স্তরের শিশুদের শিক্ষা নিয়েই সর্বাপেক্ষা বেশী মাথা ঘামিয়েছেন এবং এই স্তরের শিক্ষাতেই এখনও তাঁদের প্রচেষ্টার ছাপ সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট। তার উপর দু জনেই ছিলেন মূলতঃ রুশো শিষ্য। সুতরাং তাঁদের অবদানের তুলনামূলক আলোচনা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(১) "ফ্রোয়েবেল প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু মন্তেসরী অগ্রসর হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে।

(২) ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের চেয়ে সাধারণ বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মন্তেসরী বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিগত বিকাশের উপর, যদিও সাধারণ বিকাশকেও তিনি মনে রেখেছেন।

(৩) মন্তেসরী সাধারণ কর্মাবলীর বিষয়ে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করতে চেয়েছেন, কিন্তু ফ্রোয়েবেল ঐ রকম কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি।

(৪) ফ্রোয়েবেল এক সারি শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মন্তেসরী তিন রকম শিক্ষার জন্য তিন সারি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন।

(৫) ফ্রোয়েবেল খেলার উপরে যে রূপ গুরুত্ব দিয়েছেন, মন্তেসরী সেই রূপ গুরুত্ব দেন নি। ফ্রোয়েবেল খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়কে শেখাবারও নির্দেশ দিয়েছেন,' কিন্তু মন্তেসরী যন্ত্রপাতির সাহায্যেই ঐ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

(৬) ফ্রোয়েবেল বিভিন্ন হাতের কাজ সম্পর্কে (যেমন, বাগান করা, প্রকৃতিপাঠ, মাটির কাজ ইত্যাদি) বিশদ নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মন্তেসরী সাধারণ কর্মাবলী সম্বন্ধে ঐ রূপ নির্দেশ দেন নি।

(৭) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী-শিক্ষার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু মন্তেসরীর ব্যবস্থায় সে রকম কোন নির্দেশ নেই। ছেলেদের স্বাধীনতা মন্তেসরীর ব্যবস্থায় অনেক বেশী।

(৮) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অনেক বেশী। এই উক্তি সর্ব দিকের শিক্ষার ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

(৯) মন্তেসরীর ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্মের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে, ফ্রোয়েবেলের ব্যবস্থায় সে রকম কোন নির্দেশ নেই।

(১০) ফ্রোয়েবেল তাঁর যন্ত্রপাতির প্রতীকগত মূল্য নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু মন্তেসরী সে রকম কিছু করেন নি।

(১১) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থা মন্তেসরীর শিক্ষাব্যবস্থার মত অত বেশী যন্ত্রপাতিনির্ভর নয় বলে যন্ত্রপাতি বাদ দিয়েই সহজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মন্তেসরীর শিক্ষাব্যবস্থাকে যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না।

প্রজেক্ট পদ্ধতি

(Project Method)

প্রজেক্ট পদ্ধতি জন ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। যদিও প্রজেক্ট শব্দটির প্রয়োগ পূর্বেই হয়েছিল তথাপি ডিউই-শিষ্য কিলপ্যাট্রিকের হাতেই এর পূর্ণ পরিণতি ঘটে। প্রথমে ডেভিড্ স্নেড্ডেন ও তাঁর সহকর্মীরা এই শব্দটির প্রয়োগ ১৯০৮ সাল নাগাদ করেন। পরে ডাঃ ষ্টিভেন্সন্ ও কিলপ্যাট্রিকের হাতে এর ব্যাপকতর পরিণতি ঘটে, কেননা এঁরা 'প্রজেক্ট' ও 'প্রজেক্ট পদ্ধতি'কে স্নেড্ডেন ও তাঁর সহকর্মীদের মত শুধু ব্যবহারিক শিল্পসমূহ ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান নি, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই শব্দগুলির প্রয়োগ করেছিলেন। সত্যই এই প্রয়োগ সার্থক হয়েছে, কারণ সাধারণ শিক্ষা এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের এক উৎকৃষ্ট হাতিয়ার লাভ করেছে।

ডাঃ ষ্টিভেনসন্ ও কিলপ্যাট্রিক্ দুজনেই প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের সমর্থক হলেও কিলপ্যাট্রিকের দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত এবং তাই তাঁর হাতেই পদ্ধতিটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা লাভ করেছে। ষ্টিভেনসন্ প্রজেক্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, প্রজেক্ট হল একটি সমস্যামূলক কার্য যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাঁর মতে প্রজেক্ট পদ্ধতি হল প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রজেক্ট হল এমন একটি কর্ম যা সামাজিক পরিবেশে মনপ্রাণ দিয়ে করা হয়। ষ্টিভেনসনের ব্যাখ্যায় প্রজেক্ট পদ্ধতি হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থারও কোন বিশেষ উল্লেখ সেখানে নেই। অর্থাৎ প্রজেক্ট হল তাঁর মতে একটি প্রধানতঃ বহিরবস্থানির্ভর কর্ম। কিন্তু কিলপ্যাট্রিকের ব্যাখ্যায় প্রজেক্ট একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার উপরে বেশী নির্ভরশীল এবং তাই বহিরবস্থানির্ভর অনেক কম এবং প্রযোজ্যও হয় অনেক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। যেখানেই শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বর্তমান থাকে সেখানেই প্রধানতঃ প্রজেক্ট ও প্রজেক্ট পদ্ধতির আবির্ভাব হয়। কিলপ্যাট্রিক্ প্রজেক্ট সম্পর্কিত তত্ত্বকে রূপ দিতে গিয়ে চার প্রকারের

প্রজেক্টের উল্লেখ করেছেন : (১) উৎপাদকের প্রজেক্ট (২) ভোগকারীর প্রজেক্ট (৩) সমস্যামূলক প্রজেক্ট (৪) ও নৈপুণ্য অর্জনসম্পর্কিত প্রজেক্ট। স্পষ্টতঃ প্রথম প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা কোন কিছু তৈরী করার উপর জোর দেওয়া হয়, দ্বিতীয় প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা কোন কিছু ভোগ করার উপর জোর দেওয়া হয়, তৃতীয় প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং চতুর্থ প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা জ্ঞানার্জন বা নৈপুণ্য অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। সহজেই বোধ্য যে, কিলপ্যাট্রিকের মতে প্রজেক্ট পদ্ধতি এই চার প্রকারের প্রজেক্টের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে পারে। কিলপ্যাট্রিক আরও বলেছেন যে, প্রজেক্ট এককভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, আবার দলগতভাবেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং প্রজেক্ট পদ্ধতিও একক ভাবে বা দলগতভাবে দুই ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। কিলপ্যাট্রিক্‌নির্দেশিত প্রজেক্টগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রজেক্ট-গুলির অনুষ্ঠান হয় বুদ্ধিনির্ভর, নাহয় বাস্তবকর্মনির্ভর। সেইজন্য কিলপ্যাট্রিক্ বুদ্ধিনির্ভর ও কর্মনির্ভর এই দুই ভাগে প্রজেক্ট পদ্ধতিকে ও ভাগ করেছেন। সুতরাং প্রজেক্ট পদ্ধতি চার প্রকারের হতে পারে; (১) ব্যক্তিগত ও বুদ্ধি-নির্ভর, (২) ব্যক্তিগত ও কর্মনির্ভর, (৩) দলগত ও বুদ্ধিনির্ভর এবং (৪) দলগত ও কর্মনির্ভর।

স্টিভেনসন্ ও কিলপ্যাট্রিকের পরেও প্রজেক্ট ও প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং মতবৈষম্যও প্রকাশ পেয়েছে। তবে মিলও কম দেখা যায় নি এবং সেই মিলের উপর নির্ভর করেই প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও কিছু মন্তব্য নিম্নে করা হল।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যে কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় সেই স্তর বা ধাপ কয়টি হল : (১) যোগ্য অবস্থা সৃষ্টি, (২) প্রজেক্ট নির্বাচন ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, (৩) প্রজেক্ট সম্বন্ধে পরিকল্পনা গঠন, (৪) প্রজেক্টের রূপায়ণ ও (৫) প্রজেক্টের ফল পরীক্ষা। প্রত্যেকটি স্তরেই শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্বপালনের মাধ্যমেই প্রজেক্ট পদ্ধতি সার্থকতা লাভ করে। প্রথম স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য হল যোগ্য অবস্থা সৃষ্টি করা, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা উপযোগী প্রজেক্টের সন্ধান পাবে। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের যোগ্য প্রজেক্টনির্বাচনে সহায়তা করা,

তবে তাদের হয়ে নিজে বেছে দেওয়া নয় এবং দেখতে হবে ছেলেরা যেন মনপ্রাণ দিয়ে প্রজেক্টকে গ্রহণ করে। তৃতীয় স্তরে প্রজেক্টের পরিকল্পনা রচনা শিক্ষার্থীরাই করবে, তবে শিক্ষক ভুল-ত্রুটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। চতুর্থ স্তরে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্টটিকে রূপদান করবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজেক্টটিকে ভাগ করে দেবেন এবং রূপায়নের সময়ে প্রয়োজন মত সাহায্য করবেন। প্রঞ্চম স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য হল মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেওয়া এবং ঐগুলিকে প্রয়োগ করতে সাহায্য করা। প্রত্যেক প্রজেক্টের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রাখা কর্তব্য এবং এই বিবরণে প্রজেক্ট নির্বাচন, প্রজেক্ট পরিকল্পনা, প্রজেক্টের রূপায়ণ ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে সবকিছুই লিখিত থাকবে। কি কি বই পড়া হয়েছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি শেখা হয়েছে এবং কতরকমের কাজ করা হয়েছে এই সবই লিপিবদ্ধ থাকবে। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই কাজ করে, তবে শিক্ষকের ভূমিকাও গৌণ নয়। শিক্ষককে অনেক বেশী সজাগ হতে হয়, বুদ্ধি খরচ করতে হয়, সহানুভূতিশীল হতে হয় এবং বহুবিষয়ে দক্ষতালাভ করতে হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে কিনা দেখতে হলে এই বস্তু-গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়: (১) লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য, (২) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য ও আত্মসক্রিয়তা এবং (৩) শক্তি, সময় ও উপকরণের পরিমিত ব্যয়। অর্থাৎ প্রজেক্টের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতায় শিক্ষাগত ও সামাজিক মূল্য থাকা চাই, প্রজেক্টটি ছাত্রদের দ্বারা মনপ্রাণে গৃহীত হওয়া চাই এবং সম্পর্কিত সকলের শক্তি. সময় এবং ব্যবহৃত উপকরণের সদ্ব্যয় হওয়া চাই।

প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগে **কয়েকটি সুফল** ফলে যেমন,

(১) মনস্তত্ত্বনির্ভর হওয়ায় শিখন সার্থক হয়।

(২) বাইরের জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনের সংযোগ স্থাপিত হয়।

(৩) দলগত ও (বহুলাংশে) স্বনিয়ন্ত্রিত কর্ম অনুসৃত হয় বলে সার্থকভাবে সহযোগিতা ও সামাজিকতার শিক্ষা হয়।

(৪) শিখন মূলতঃ স্বপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে আত্মনির্ভরশীলতা অনেক বাড়ে।

(৫) গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের শিক্ষাও এই পদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।

(৬) বিষয়বস্তুর সম্প্রক্তীকরণ সহজ হয়।

(৭) সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় বলে মনের সৃজনীশক্তির বিকাশ হয়।

(৮) হাতের কাজের সুযোগ প্রচুর থাকে বলে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে।

(৯) কর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলে জ্ঞান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

(১০) শিক্ষার্থীদের সর্বদিকের বিকাশ এক সঙ্গেই সাধিত হয়।

(১১) কর্মনির্ভর হওয়ায় শিখন জীবন্ত হয়ে উঠে। তবে এই পদ্ধতির **কয়েকটি ত্রুটিও** আছে যেমন,

(১) প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান, নৈপুণ্য, মনোভাব, আদর্শ ইত্যাদি শুধু প্রজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শেখান কঠিন। সুতরাং শিখনে ফাঁক থেকে যায়।

(২) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও উপকরণের পুনর্ব্যবস্থার প্রয়োজনের জন্য বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং এই পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ বর্তমান অবস্থায় সাধারণ বিদ্যালয়ের সামর্থ্যের বাইরে।

(৩) উচ্চাংগের শক্তি ও শিক্ষাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় এই পদ্ধতি বর্তমান অবস্থায় পূর্ণভাবে অপ্রযোজ্য।

(৪) বিদ্যালয়সম্পর্কিত সকলেরই মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। এটিও সহজসাধ্য নয়।

(৫) প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই রকম পরিবর্তনও সহজসাধ্য নয়।

(৬) প্রচলিত বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মধারার পূর্ণ রূপান্তর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটিও সহজে মেটান যায় না।

(৭) যে সব বিষয় আয়ত্ত করতে গেলে পুনঃপুনঃ অভ্যাসের (drill) প্রয়োজন হয়, সেই সব বিষয়ের শিক্ষায় ত্রুটি রয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

বর্তমান অবস্থায় প্রজেক্ট পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগে বহুবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির প্রয়োগে যথাসম্ভব সচেষ্ট হলে প্রভূত উপকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষাদানের সঙ্গে প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সকলেরই করা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে পৃথক পৃথক প্রজেক্টের ব্যবস্থা

স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় করতে হবে, কেননা শ্রেণীশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতেই হয়। তবে যথাসম্ভব সম্পৃক্তীকরণের চেষ্টাও করতে হবে। সহজেই অনুমেয় যে, কিলপ্যাট্রিকের মতানুযায়ী এই পদ্ধতির ব্যবহার করলে প্রয়োগগত সমস্যা অনেক কমে যাবে এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ দিল্লী ও অন্যান্য জায়গায় কিছু কিছু সুরু হয়েছে এবং ফলও ভাল পাওয়া গেছে। তবে পূর্ণ প্রয়োগের দিকে এখন আর কোন শিক্ষাবিদই বিশেষ প্রয়াসী নন। মুদালিয়র কমিশনও এইরকম আংশিক প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এটি যে একটি 'সক্রিয়' ('dynamic') শিক্ষাপদ্ধতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োগ করলে এর প্রয়োগ থেকে বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

ড্যাল্টন্ পরিকল্পনা

(Dalton Plan)

মিস হেলেন পার্কহার্ষ্ট নামে এক মহিলা-শিক্ষাবিদ্ এই পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ড্যাল্টন্ হাই স্কুলে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল বলে পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে ড্যাল্টন্ পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কিছুটা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হলেও কোন ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি সম্বন্ধে এই পরিকল্পনায় কোন বিশেষ পরিবর্তনের আভাস নেই। তবে সাংগঠনিক পরিবর্তনের কিছু প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে শিক্ষাদানের সমগ্র সমস্যাকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে দেখা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় মেধাবী, মাঝারি এবং পশ্চাদ্পদ সকল প্রকার ছাত্র যে যার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে পারবে।

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক বৎসরের কাজের একটি হিসাব প্রথমেই রচনা করা হয়। তারপর সারা বৎসরের কাজকে মাসানুযায়ী ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রকে একের পর এক মাসগুলির কাজ শেষ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি মাসের কাজকে প্রত্যেকটি ছাত্র একটি চুক্তি ('contract') হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রথমটি শেষ না হলে পরের মাসের কাজে হাত দেয় না। চুক্তি হিসাবে কাজকে গ্রহণ করা হয় বলে এই পরিকল্পনাকে 'চুক্তিনির্ভর পরিকল্পনাও' (Contract Plan) বলা হয়।

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক 'বিষয়গত পরীক্ষাগারের' ('subject laboratory') ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সব পরীক্ষাগারে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক উপস্থিত থাকেন ছাত্রদের সর্বপ্রকারের সাহায্যদানের জন্য। টিফিনের বিরতির পূর্ব পর্যন্ত ছেলেরা পৃথকভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। বিকালের দিকে শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানের ব্যবস্থা শিক্ষক ইচ্ছা করলে করতে পারেন। শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানকে 'কন্ফারেন্স' বলা হয় এবং শিক্ষকের ইচ্ছামত কন্ফারেন্সের ব্যবস্থা করা হয়।

পরীক্ষাগারের কাজের জন্য ছেলেরা নিজেরাই দায়ী থাকে এবং নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত কাজ করে।

ছাত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে এবং প্রতি মাসে সমস্ত বিষয়ের কাজের জন্য তাদের পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ ও দায়ী থাকে এবং মাসের সমস্ত চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ হয়ে গেলে পরের মাসের কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। এক মাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্য শিক্ষকের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় পরের মাসের কাজ গ্রহণ করবার জন্য।

বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারসমূহে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, ছবি, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং শিক্ষকরাও সর্বদা প্রস্তুত থাকেন শিক্ষার্থীদের সর্ববিষয়ে সাহায্যদানের জন্য।

ছাত্রদের পাঠের হিসাব রাখার জন্য 'গ্রাফের' (graph) সাহায্য নেওয়া হয়। শিক্ষকের নিকট একটি করে গ্রাফ প্রত্যেক ছাত্রের জন্য থাকে। সেটি বিষয়ের কক্ষে রক্ষিত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সহজে পরিচালিত করতে পারেন। দুটি গ্রাফ প্রত্যেকটি ছাত্র নিজের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের সাহায্যে নিজের পাঠের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়।

এই ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত **সুবিধাসমূহ** আছে :

(১) প্রত্যেকটি ছাত্র একটি উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকের চুক্তি তার লক্ষ্যের কাজ করে। সুতরাং শিক্ষার গতি হয় দ্রুত।

(২) চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে ছাত্ররা বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠে।

(৩) শিক্ষার্থীরা নিজেরা শিখনে অগ্রসর হয় বলে শিখন প্রাণবন্ত হয় এবং সার্থক হয়।

(৪) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের গতিতে অগ্রসর হয় বলে প্রত্যেকের শিখনই খুব দ্রুতগতিতে চলে।

(৫) কোন রকমে অনুপস্থিত হলে ছেলেদের প্রচলিত ব্যবস্থার মত অসুবিধায় পড়তে হয় না।

(৬) ছেলেরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করে বলে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সহজেই রক্ষিত হয়।

ড্যাণ্টন্ পরিকল্পনা

(Dalton Plan)

মিস হেলেন পার্কহার্ষ্ট নামে এক মহিলা-শিক্ষাবিদ্ এই পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ড্যাল্টন্ হাই স্কুলে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল বলে পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে ড্যাল্টন্ পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কিছুটা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হলেও কোন ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি সম্বন্ধে এই পরিকল্পনায় কোন বিশেষ পরিবর্তনের আভাস নেই। তবে সাংগঠনিক পরিবর্তনের কিছু প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে শিক্ষাদানের সমগ্র সমস্যাকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে দেখা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় মেধাবী, মাঝারি এবং পশ্চাদ্পদ সকল প্রকার ছাত্র যে যার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে পারবে।

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক বৎসরের কাজের একটি হিসাব প্রথমেই রচনা করা হয়। তারপর সারা বৎসরের কাজকে মাসানুযায়ী ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রকে একের পর এক মাসগুলির কাজ শেষ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি মাসের কাজকে প্রত্যেকটি ছাত্র একটি চুক্তি ('contract') হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রথমটি শেষ না হলে পরের মাসের কাজে হাত দেয় না। চুক্তি হিসাবে কাজকে গ্রহণ করা হয় বলে এই পরিকল্পনাকে 'চুক্তিনির্ভর পরিকল্পনাও' (Contract Plan) বলা হয়।

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক 'বিষয়গত পরীক্ষাগারের' ('subject laboratory') ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সব পরীক্ষাগারে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক উপস্থিত থাকেন ছাত্রদের সর্বপ্রকারের সাহায্যদানের জন্য। টিফিনের বিরতির পূর্ব পর্যন্ত ছেলেরা পৃথকভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। বিকালের দিকে শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানের ব্যবস্থা শিক্ষক ইচ্ছা করলে করতে পারেন। শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানকে 'কন্ফারেন্স' বলা হয় এবং শিক্ষকের ইচ্ছামত কন্ফারেন্সের ব্যবস্থা করা হয়।

পরীক্ষাগারের কাজের জন্য ছেলেরা নিজেরাই দায়ী থাকে এবং নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত কাজ করে।

ছাত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে এবং প্রতি মাসে সমস্ত বিষয়ের কাজের জন্য তাদের পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ ও দায়ী থাকে এবং মাসের সমস্ত চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ হয়ে গেলে পরের মাসের কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। এক মাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্য শিক্ষকের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় পরের মাসের কাজ গ্রহণ করবার জন্য।

বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারসমূহে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, ছবি, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং শিক্ষকরাও সর্বদা প্রস্তুত থাকেন শিক্ষার্থীদের সর্ববিষয়ে সাহায্যদানের জন্য।

ছাত্রদের পাঠের হিসাব রাখার জন্য 'গ্রাফের' (graph) সাহায্য নেওয়া হয়। শিক্ষকের নিকট একটি করে গ্রাফ প্রত্যেক ছাত্রের জন্য থাকে। সেটি বিষয়ের কক্ষে রক্ষিত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সহজে পরিচালিত করতে পারেন। দুটি গ্রাফ প্রত্যেকটি ছাত্র নিজের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের সাহায্যে নিজের পাঠের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়।

এই ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত **সুবিধাসমূহ** আছে:

(১) প্রত্যেকটি ছাত্র একটি উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকের চুক্তি তার লক্ষ্যের কাজ করে। সুতরাং শিক্ষার গতি হয় দ্রুত।

(২) চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে ছাত্ররা বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠে।

(৩) শিক্ষার্থীরা নিজেরা শিখনে অগ্রসর হয় বলে শিখন প্রাণবন্ত হয় এবং সার্থক হয়।

(৪) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের গতিতে অগ্রসর হয় বলে প্রত্যেকের শিখনই খুব দ্রুতগতিতে চলে।

(৫) কোন রকমে অনুপস্থিত হলে ছেলেদের প্রচলিত ব্যবস্থার মত অসুবিধায় পড়তে হয় না।

(৬) ছেলেরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করে বলে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সহজেই রক্ষিত হয়।

(৭) শিক্ষকরা ছাত্রদের পৃথকভাবে চিনতে পারেন এবং পরিচালিতও করতে পারেন।

(৮) বাধ্যতামূলক বাড়ীর কাজ থাকে না বলে গৃহজীবন আনন্দপূর্ণ হয়।

(৯) গ্রাফের মাধ্যমে ছাত্রদের কাজের হিসাব খুব সার্থক ভাবে রক্ষিত হয়।

(১০) বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক এবং সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকায় বিষয়গুলিকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়।

(১১) দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য অনেকটা সার্থক প্রস্তুতি ঘটে। তবে ব্যক্তিগত বিকাশের উপরেই বেশী জোর পড়ে।

ড্যাল্টন্ পরিকল্পনার প্রয়োগে **কয়েকটি অসুবিধারও** উদ্ভব হয়। নিম্নে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

(১) শ্রেণীশিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষকদের দিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা অতি কঠিন।

(২) বিষয়-পরীক্ষাগার নির্মাণের উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা সাধারণ বিদ্যালয়ে কঠিন।

(৩) বিদ্যালয় গৃহগুলিও এত প্রশস্ত নয় যে, সেগুলিতে এই পরিকল্পনা সহজে প্রয়োগ করা যায়।

(৪) কতকগুলি বিষয়বস্তুকে দলগতভাবেই ভাগ করে আয়ত্ত করা যায়, সুতরাং সেগুলির শিক্ষাদান এই পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৫) প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক কার্য ঠিক করা, সেই কার্য কি রকম অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য দান করা এই সব কর্মের জন্য অতি দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। স্বভাবতঃই এই রকম শিক্ষক সাধারণতঃ পাওয়া যায় না।

ড্যাল্টন্ পরিকল্পনার প্রয়োগে এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটিকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করবার চেষ্টা করা উচিত। কেননা আমরা দেখেছি যে, এর প্রয়োগে সুবিধাও আছে অনেক। তবে কিছু পরিবর্তিত করেই একে গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিছুটা ব্যক্তিগত শিখনের সঙ্গে কিছুটা দলগত শ্রেণী-শিখনের স্থান করে দেওয়া উচিত। এই শ্রেণী-শিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষানবীশরা

বিষয়বস্তুর নূতন নূতন অংশ আয়ত্ত করতে পারবে এবং যে সব বিষয়ের শিক্ষায় দলগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন সেই সব বিষয়ের অনুশীলনও করতে পারবে। সঙ্গীত, কবিতা, দৈহিক শিক্ষা, মৌলিক শিখন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়কে দলগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে আয়ত্ত করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরিবর্তিত অবস্থাতেই এখন এই পরিকল্পনাকে কোথাও কোথাও প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, অপরিবর্তিত রূপে এখন আর এটিকে গ্রহণ করা হয় না। সমাজ ও বিশ্বরাজনীতির অবস্থার জন্য আজকাল দলগত শিক্ষার উপর বেশী জোর পড়েছে এবং প্রধানতঃ তার ফলেই ব্যক্তিপ্রচেষ্টানির্ভর এই পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

উইনেট্‌কা পরিকল্পনা
(Winnetka Plan)

শ্রেণী শিক্ষার দোষ বিদূরণ ও বিশেষভাবে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়েছিল। San Francisco State Teachers' College এর President Burk-এর একজন প্রাক্তন সহকারী Carl Washburne-এর দ্বারা ১৯১৯ সালে এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়িত হয় এবং বাকী সময় ব্যয়িত হয় দলগত কার্যে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক মনোভাব ও অভ্যাসসমূহ গঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয় এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি করে কার্ড দিয়ে দেওয়া হয় যার মধ্যে লিখিত থাকে প্রত্যেককে কি কি করতে হবে। এই কার্ডে লিখিত কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা অপেক্ষা করে তাদের সহপাঠীদের জন্য। এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত সময় তারা ব্যয় করে সামাজিক কাজকর্মে। শিক্ষাদানের এই ব্যবস্থায় সামাজিক কার্যাবলীর জন্য কোন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে না এবং পরীক্ষাও থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই সব কর্ম নির্বাচন করে এবং তাদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। আনন্দমূলক পাঠেও (যেমন কবিতা পাঠে) পরিচালনা ও পরীক্ষা থাকে না।

বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করবার সময়ে ছাত্ররা এমন সব পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য পায় যেগুলি আপনা হতেই ভুল ঘটলে ভুল দেখিয়ে দেয় এবং উপযোগী কর্ম-পুস্তকেরও ('work-book') সাহায্য পায়। পাঠ্য-পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক দ্বারা রচিত হয়। তিনি শিশুদের শক্তি, চাহিদা, রুচি ইত্যাদির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পুস্তকগুলি রচিত করেন। এই বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে আরও দুই রকমের বিশেষজ্ঞ কাজ করেন—মনোচিকিৎসক ও ডাক্তার। মনোচিকিৎসক স্বভাবতই আচরণগত ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং ডাক্তার লক্ষ্য রাখেন দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে। এই বিদ্যালয়ে সামাজিক

কার্যগুলির জন্য বিভিন্ন দল নির্বাচিত হয় এবং সেগুলির তত্ত্বাবধানেই কার্যগুলি চলে। এই বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা এক সঙ্গেই শিক্ষালাভ করে।

পরিকল্পনাটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভাগ করে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী নিজের গতিতে এগোতে দিয়ে পরিকল্পনাটি সার্থকভাবে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা করেছে। সামাজিক কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থী-দের সামাজিক বিকাশের জন্যও এই পরিকল্পনায় যোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সামাজিক কার্যের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একদম স্বাধীনভাবে এগোতে দেওয়া ঠিক হয় নি, এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। এই সমালোচনায় সত্য কিছুটা আছে সন্দেহ নেই, তবে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মে শিশুরা আরও আনন্দ পায় এবং উদ্দেশ্যের সন্ধানও পায়। মনে হয় অল্প একটু পরিচালনার ব্যবস্থা রেখে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের ব্যবস্থা করাই ভাল। মোটের উপর বলা যায় যে, এটি একটি প্রগতিশীল শিক্ষা-পরিকল্পনা।

———

ডেক্রলি পদ্ধতি

(Decroly Method)

Ovide Decroly নামে এক প্রগতিশীল ডাক্তার শিক্ষাবিদের মতানুযায়ী যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় 'ডেক্রলি পদ্ধতি' এবং যে-সব বিদ্যালয় ডেক্রলির মতানুযায়ী পরিচালিত হয় তাদের বলা হয় 'ডেক্রলি বিদ্যালয়'। এই সব বিদ্যালয়ে জীবনযাপনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-লাভ করে। ডেক্রলি বিদ্যালয়গুলির আদর্শ পরিবেশ হল প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক বস্তুর নিবিড় সম্পর্কে এসে তাদের অনুধাবন করতে পারে। এই দিক থেকে শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়গুলির স্পষ্টতঃ কিছুটা মিল রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী-দের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। ডেক্রলি বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকারা যুক্তভাবে শিক্ষালাভ করে। ডেক্রলি পদ্ধতি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল, যদিও ব্রুসেলস্ সহরেই প্রথম তার উদ্ভব হয়েছিল।

শ্রেণীকক্ষে ডেক্রলি পদ্ধতিতে যেভাবে কাজ হয় তার সঙ্গে বর্তমান আমেরিকায় প্রচলিত 'ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতির' ("Workshop Method") যথেষ্ট মিল রয়েছে। ডেক্রলি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষগুলি বক্তৃতার স্থল হিসাবে সজ্জিত থাকে না। কর্মক্ষেত্রের, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সঙ্গে এগুলির সজ্জায় যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এখানে সমগ্র শ্রেণীকে বিভিন্ন উপ-যোগী দলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক দলের উপর ভার থাকে কোন একটি বিশেষ সমস্যা বা বিষয়কে অনুসরণ করার। এই দলগুলি নিজ নিজ প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধানে বা আলোচ্য বস্তুর অনুধাবনে অগ্রসর হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ-নিজ কর্মের হিসাব পেশ করে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে। শিক্ষকদের উপদেশ অবশ্য শিক্ষার্থীরা সব সময়েই পেতে পারে। বিবরণ পেশ করার সময়ে শিক্ষার্থীরা সমালোচনার সম্মুখীন হয়, এবং কর্মে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলে পুনরায় কর্মটি করতে বাধ্য হয়। বিবরণ পাঠের সময়ে ছাত্ররা উপযোগী যে কোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে বিবরণটিকে

সুবোধ্য করবার জন্য। পরীক্ষার সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বস্তু 'নম্বরকে' (marks) এই ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয় না। বস্তুতঃ এখানে প্রতিযোগিতার স্থলে সহ-যোগিতা সৃষ্টিরই চেষ্টা সর্বপ্রকারে করা হয়।

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে বহু সামাজিক গুণের উদ্ভব হয় যেমন, যুক্তভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, সহানুভূতিবোধ, যৌথ দায়িত্ববোধ, সমাজ সচেতনতা, সামাজিক সমালোচনা ভালভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে এই পদ্ধতি সত্যই নিজেকে একটি প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই ব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা যুক্ত হয়েছে এবং কাজ ও খেলা পৃথক অস্তিত্ব হারিয়েছে।

———

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি

(Wardha Scheme)

ভারতবর্ষের সর্বাংগীণ অবনতি রোধ করবার প্রচেষ্টায় গান্ধীজি অন্য চেষ্টার সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার জন্ম হয়। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় ভারতের বহু শিক্ষাবিদ্ সমবেত হয়েছিলেন গান্ধীজির শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতাবলীর আলোচনার জন্য। ওয়ার্ধার এই আলোচনা থেকেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি পূর্ণ রূপ লাভ করে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল ব্যাপক। ভারতবর্ষে একটি প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত সমাজ গঠনই হল তার চরম লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য গান্ধীজী পূর্ণভাবে বিকশিত একটি শিক্ষার্থী-সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে ঐ আকাঙ্ক্ষিত নূতন সমাজ গড়ে উঠবে।

এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্বদিকে ব্যাপক পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই স্তরের পাঠক্রমের কেন্দ্রস্থলে একটি হাতের কাজকে বসান হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে সমস্ত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। পরে অবশ্য এবিষয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যে সব প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে শেখান সম্ভব নয় সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে শেখানর নির্দেশ পরে দেওয়া হয়েছে। ফলে পাঠক্রমের কেন্দ্রে এখন হাতের কাজের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও স্থান পেয়েছে।

পদ্ধতি সম্বন্ধেও পরিবর্তনের নির্দেশ এই পদ্ধতিতে কম ব্যাপক নয়। প্রথমতঃ, সমস্ত বিষয়বস্তুকে সম্পৃক্ত করে শেখাবার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বলা হয়েছে সমস্ত কিছুকে বাস্তব অবস্থা (পরিবেশ) ও হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে। এই দুটি নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। হাতের কাজের সঙ্গে মাথার কাজ যুক্ত হয়েছে, জ্ঞানের অবিভাজ্যতা স্বীকৃত হয়েছে এবং মানব

ব্যক্তিত্বের সুসংহত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ৭-১৪ বৎসর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তদানীন্তন দেশের অবস্থার কথা বিচার করে শিক্ষাকে প্রথমে স্বাবলম্বী করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (উৎপন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর বিক্রয়ের মাধ্যমে)। এই পরিকল্পনায় মাতৃভাষাকে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার কথা বলা হয়েছে এবং সামাজিকতা ও সহযোগিতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হাতের কাজকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করবার নির্দেশ এই পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার **সমালোচনায়** নিম্নমত মন্তব্যগুলি করা হয়েছে।

(১) শিশুর শ্রমের উপর শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি নির্ভর করা উচিত নয়।

(২) প্রচলিত বাজারের উপযোগী পণ্য উৎপাদন শিশুদের উচিত নয়।

(৩) প্রধানতঃ একটি হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান ঠিক নয়।

(৪) অল্পবয়সের শিশুদের অত আগে থেকেই বিশেষ শিক্ষা দান করা উচিত নয়।

(৫) আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা এই ব্যবস্থায় অনাদৃত হয়েছে।

(৬) দৈহিক শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

(৭) হাতের কাজকে উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চালিত না করলে সামাজিক অবনতি ঘটবে।

সমালোচনা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির **অনেক গুণও** আছে এবং সেগুলির জন্যই এই পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির নিম্নমত কয়েকটি সৎগুণ রয়েছে ঃ

(১) এই পদ্ধতি মহৎ লক্ষ্যের দ্বারা প্রণোদিত।

(২) এই পদ্ধতিতে বাইরের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনের সম্পর্কস্থাপন করা হয়েছে।

(৩) দৈহিক ও মানসিক কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই পদ্ধতিতে দুইকেই উন্নত করা হয়েছে।

(৪) এই পদ্ধতিতে শিশুমনস্তত্ত্বের ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা এটি কর্মনির্ভর।

(৫) শিশুর ব্যক্তিত্বের সামাজিক ও নৈতিক দিকের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা এই পদ্ধতিতে রয়েছে।

(৬) অনাদৃত মাতৃভাষার দিকে এই পদ্ধতিতে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

(৭) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান মনস্তত্ত্বসম্মত।

(৮) সর্বাংগীণ উন্নতি সাধনের প্রয়াসী বলে পদ্ধতিটি ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ।

সেবাগ্রাম বা বেসিক পদ্ধতিতে **পাঠক্রম** নিয়মত এবং এই পাঠক্রম থেকেই তার স্বরূপ অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়।

(১) মৌল কারুশিল্প—এই কয়টির মধ্যে একটি : (ক) সূতাকাটা এবং বোনা, (খ) ছুতারের কাজ, (গ) ফল এবং শব্জীর বাগান করা, (ঘ) কৃষিকার্য (ঙ) চামড়ার কাজ, (চ) স্থানীয় ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন শিক্ষাপ্রদ কাজ।

(২) তুলার কাজ (বোনা এবং তুলা প্রস্তুত করা) সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান।

(৩) মাতৃভাষা।

(৪) গণিত।

(৫) সমাজবিদ্যা (ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি)।

(৬) সাধারণ বিজ্ঞান।

(৭) সঙ্গীত ও অঙ্কন।

(৮) হিন্দুস্থানী (উর্দু ও দেবনাগরী হরফে)

শিক্ষণ ও পাঠটীকা প্রণয়ন

বর্তমান যুগ হল পরিকল্পনার যুগ। আজকের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, কোন বিষয়েই বিনা পূর্ব-পরিকল্পনায় অগ্রসর হতে নেই, কেননা পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে কোন কর্মেই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না। তাই সর্বদিকেই এখন পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বভাবতঃই এখানেও পরিকল্পনার প্রসার হয়েছে। শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে আরও এই কারণে যে, কিছুকাল ধরে অনুভূত হয়েছে যে, শিক্ষণ কার্যে শুধু বিষয়ের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, শিশুর মন ও শিখন প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও বিশেষভাবে দরকার। মূলতঃ সমাজ ও শিক্ষা-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যই শিক্ষণ সম্বন্ধে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিটি আর কিছুই নয় গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বভাবতঃই শিশুর উপর খুব জোর পড়েছে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা এই পুস্তকে পূর্বেই করা হয়েছে সেইজন্য এখানে আর তার বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

শিক্ষণে সার্থকতা লাভ করতে গেলে তিন প্রকারের পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। বৎসরের কাজের পূর্বেই এক প্রকারের পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। এই পরিকল্পনায় উপকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনায় পূর্ণ পাঠক্রম সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়। তৃতীয় প্রকারের পরিকল্পনায় দৈনন্দিন শিক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় শেষোক্ত পরিকল্পনাকেই বলা হয় পাঠ-পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনায় যে লিখিত বিবরণটি প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলা হয় পাঠটীকা (lesson notes)।

শিক্ষণ নানাভাবে অগ্রসর হতে পারে তাই পাঠটীকাও নানাপ্রকারের হতে পারে। তবে আমাদের দেশে এখনও শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট ও তাঁর শিষ্যগণ-কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণ প্রচলিত থাকায় এখানে প্রধানতঃ সেই পদ্ধতি অনুসারে রচিত পাঠটীকারই আলোচনা নিবদ্ধ হল।

যে কোন পদ্ধতি অনুসারে রচিত পাঠপরিকল্পনার দ্বারাই কয়েকটি কার্য সিদ্ধ হয়। সেই কার্যগুলি হল :

(১) শিক্ষণ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। ফলে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়।

(২) শিক্ষকের শিক্ষণ সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এলোমেলোভাবে পড়ানর অবসান হয়।

(৩) পূর্ব হতেই এর দ্বারা বিভিন্ন কৌশল ও উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাও করা যায়।

(৪) বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পরিকল্পনা শিক্ষণ-ক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা আনে।

(৫) বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সৃজনমূলক পূর্বচিন্তাও সম্ভব হয়।

(৬) পূর্ব-পরিকল্পনার ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সার্থকভাবে উদ্দীপিত হয় এবং শিখন আনন্দপ্রদ হয়।

(৭) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়। (এই আত্মবিশ্বাস শিক্ষণে সার্থকতার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। নূতন শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বভাবতই অত্যধিক)।

যে-কোন প্রকারের পাঠপরিকল্পনায় সার্থকতা লাভ করতে হলে কতকগুলি বস্তুর প্রয়োজন হয়। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর উল্লেখ করা হল :

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(২) আলোচ্য বিষয়বস্তু ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন।

(৩) শিশুর মন ও শিখন-প্রণালীর জ্ঞানও অপরিহার্য।

(৪) শিশুর প্রতি দরদ ও তাকে যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করবার মত মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

(৫) শিক্ষণসম্বন্ধীয় পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৬) শিশুদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানও অপরিহার্য।

(৭) শিশুদের অর্জিত জ্ঞান, নৈপুণ্য ও মনোভাবের সঙ্গে সার্থক পরিচয় প্রয়োজন।

যে কোন প্রকারের **উত্তম পাঠটীকার** কয়েকটি **লক্ষণ** থাকে। নিম্নে সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

(১) উত্তম পাঠটীকা স্বভাবতঃই লিখিত হয়।

(২) উত্তম পাঠটীকায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে।

(৩) উত্তম পরিকল্পনায় শিখনের পর্যায়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা অগ্রসর হয়।

(৪) শিশুর আগ্রহ উদ্দীপনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) শিক্ষার্থীদের অতীতের অভিজ্ঞতার ব্যবহার করা হয়।

(৬) পূর্বের ও পরের পাঠটীকার সঙ্গে সংযোগ রাখা হয়।

(৭) বিষয়বস্তু, উপকরণ, পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে।

(৮) শিক্ষার্থীদের কার্যাবলীর পূর্ণ হিসাব থাকে।

(৯) যে সব প্রশ্ন ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হবে সেই সব প্রশ্নের যথাসম্ভব পূর্বাভাস দেওয়া থাকে।

(১০) পাঠ্যবস্তুর সারাংশ ও গৃহের কার্জের নির্দেশ থাকে।

(১১) পাঠের সার্থকতা পরীক্ষার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা থাকে।

(১২) সময়, শ্রেণী, ছাত্রদের গড় বয়স, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ থাকে।

(১৩) পরিকল্পনার শেষে আত্ম-সমালোচনার ব্যবস্থা থাকে।

আমরা দেখেছি উপরে পাঠটীকা সম্বন্ধে (তার বিভিন্ন কার্য, সার্থকতার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও সার্থকতা বিচার সম্বন্ধে) যে সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি শ্রেণীকক্ষে প্রযোজ্য সর্বপ্রকার পাঠ্যক্রমের পক্ষেই উপযোগী। নিম্নে এখন আমরা **হার্বার্টীয় পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যাবলী** সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

হার্বার্ট মনে করতেন যে, সমস্ত প্রকারের শিখন একই ভাবে একই স্তর-ক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, সমস্ত শিখনেরই

মূল কথা হল নূতন ভাবরাজি (ideas) আয়ত্তীকরণ এবং ভাবের আয়ত্তীকরণ একইভাবে একই পর্যায়-ক্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়।

হার্বার্টের মতে ভাবের আয়ত্তীকরণ স্পষ্টতা ('clearness'), অনুসঙ্গ ('association'), তন্ত্র (system') ও পদ্ধতি ('method') এই কয়টি স্তরের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়।

হার্বার্ট-শিষ্যরা এই চারটি স্তরের কোনটিকে ভাগ করে এবং কোনটির নাম পরিবর্তন করে পাঁচটি স্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই পাঁচটি স্তরের নাম হল—আয়োজন ('preparation'), উপস্থাপন ('presentation'), তুলনা ও বিমূর্তন ('comparison' ও 'abstraction'), সামান্যীকরণ ('generalisation') ও অভিযোজন ('application')। পরে এই পাঁচটি স্তরকে সংক্ষেপ করে তিনটি স্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্তর তিনটির নাম হল: (১) আয়োজন ('preparation'), (২) উপস্থাপন ('presentation') ও অভিযোজন ('application')। বর্তমানে আয়োজন স্তরে শিশুর সংশ্লিষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয় (উদ্দেশ্য—আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং নূতন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা সহজ হবে); দ্বিতীয় স্তরে নূতন বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা হয়; এবং তৃতীয় স্তরে পাঠদানের সার্থকতা বিচার করা হয়। এই বিচার নূতন জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় বলে এই স্তরের নাম হল 'অভিযোজন'।

হার্বার্টীয় পাঠপরিকল্পনার প্রশ্নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নের প্রয়োগ করা হয়। প্রথম স্তরে প্রয়োগ করা হয় প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ননিচয়—যেগুলির সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা হয় ও তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয়। দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োগ করা হয় বিকাশমূলক ('developmental') প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে নূতন অভিজ্ঞতার পরিবেশন ও আত্তীকরণ সহজ হয়। তৃতীয় স্তরে প্রয়োগ করা হয় পরীক্ষামূলক প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে নবলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়।

পাঠটীকা প্রণয়নের সময়ে সাধারণতঃ পরপর এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয়।

(১) প্রথমে পাঠটীকার শীর্ষদেশে তারিখ, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণী, ছাত্র-

সংখ্যা, ছাত্রদের গড় বয়স, নির্দিষ্ট সময়, শিক্ষকের নাম, ও পাঠ্যবস্তু সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া হয়। (পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য ডান দিকে ও অন্যান্য তথ্যগুলি বাঁদিকে লিখিত হয়)।

(২) তারপর পাঠের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ হয়। যেহেতু পাঠ হল মোটামুটি তিন প্রকারের (**জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক ও সহানুভূতি-মূলক**) সেইহেতু উদ্দেশ্যও হয় তিন প্রকারের। জ্ঞানমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল নৈপুণ্য অর্জন এবং রসানুভূতিমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল রসানুভূতি ও উপভোগ। জ্ঞানমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে, কেননা এই বিষয়গুলিতে জ্ঞানার্জনই হল মূল কথা। নৈপুণ্যমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় গণিত, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে, কেননা এই সব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জনই হল মূল কথা। বিদ্যালয়ে রসানুভূতিমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ সাহিত্যপাঠের বেলায়, কেননা এই ক্ষেত্রে রসানুভূতি ও উপভোগই হল মূল কথা।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন পাঠই শুধু জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক বা রসানুভূতিমূলক হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্য অর্জন ও রসানুভূতির অবকাশ থাকে। তবুও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাঠকে জ্ঞান-মূলক, নৈপুণ্যমূলক বা রসানুভূতিমূলক পাঠ বলা হয় এই কারণে যে, ঐসব শ্রেণীর পাঠে জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যলাভ বা রসানুভূতির প্রাধান্য থাকে।

(৩) এইবার প্রযোজ্য উপকরণসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়। (নানা প্রকারের উপকরণের সাহায্যে পাঠকে সার্থকতা দান করার প্রয়োজন হয়।)

(৪) এই সময়ে আয়োজন স্তরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়।

(৫) এইবার পাঠঘোষণা করা হয়। (শিক্ষক ছাত্রদের দিনের পাঠ সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং পাঠের লক্ষ্যসমূহেরও কিছু ইঙ্গিত দেবেন।)

(৬) এর পরে উপস্থাপন স্তরের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়।

(৭) তার পরে অভিযোজন স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়।

(৮) সর্বশেষে গৃহকার্যের নির্দেশ থাকে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, জ্ঞানমূলক ও নৈপুণ্যমূলক পাঠে উপস্থাপনের অংশকে দুটি অংশে ভাগ করতে হয়—বিষয় ('content') ও পদ্ধতিতে

('method")। বিষয় অংশে পাঠ্যবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয় এবং পদ্ধতি অংশে উপযোগী প্রশ্ন, উপকরণের ব্যবহার, ছাত্রদের কর্ম ইত্যাদির উল্লেখ করতে হয়। রসানুভূতিমূলক পাঠে এই রকম বিভাগের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে রসানুভূতির উদ্রেক সম্ভব নয়।

হার্বার্টীয় পাঠপরিকল্পনার বহু **সমালোচনা** হয়েছে। সমালোচনাগুলি অনেকাংশেই সত্য। নিম্নে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলির উল্লেখ করা গেল।

(১) আগ্রহের সৃষ্টি শুধু পূর্বজ্ঞানের উদ্রেকেই হয় না।

(২) শিক্ষা সর্বত্র একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এ ধারণা ভুল।

(৩) শুধু, এমনকি প্রধানতঃ, জ্ঞানসঞ্চয় সমস্ত প্রকার শিখনের লক্ষ্য নয় এবং সমস্ত প্রকার শিখনে ঘটে না।

(৪) শিক্ষকের কার্যের অপেক্ষা শিশুর কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দান করা উচিত।

(৫) ব্যক্তিগত বৈষম্যের যথাযোগ্য স্থান থাকা উচিত।

(৬) শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ণয়ে শিখনপদ্ধতি, শিক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য, পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য এই সব কিছুর দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু শিশুদের সাধারণ শিখন-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিলেই হবে না।

(৭) নিছক জ্ঞানার্জনও সর্বক্ষেত্রে একই ভাবে সংঘটিত হয় না।

(৮) হার্বার্টের পরিকল্পনায় শিশুর স্বাধীনতা আসলে মোটেই স্বীকার করা হয় না।

সমালোচনার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে, হার্বার্টের পাঠপরিকল্পনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কারুর দিক দিয়েই মূলতঃ সৃজনমূলক নয়। সুতরাং প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষায় তার স্থান থাকতে পারে না।

পরিশিষ্ট

(ক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

Rabindranath Tagore

আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র ইয়োরোপীয় নবজাগরণের অন্যতম নেতা লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ও আধুনিক জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গ্যয়তের তুলনা করা চলে। সত্য কথা বলতে কি, প্রতিভার বহুমুখীনত্বার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই দুইজন অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিকেও পশ্চাতে ফেলে গেছেন। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন মহান্ কবি ও সংগীতকার, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সমাজতাত্ত্বিক, জাতীয় নেতা, ধর্মীয় নেতা, নাট্যকার, অভিনেতা, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক ইত্যাদি। তবে মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পী এবং তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার উপর সুমহান্ কবি ও শিল্পীর ছাপ সুস্পষ্ট। এই কারণে তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব ও ক্রিয়ার উপরেও কবিসত্বার প্রভাব অবিসম্বাদিত। সত্যই মানবশিশুর সৌন্দর্যবোধের উন্মেষের জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর মত মহান্ কবি প্রতিভার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে, অন্যের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক অর্থে ভারতীয় জাতিরই শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থেও তিনি অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব সুউচ্চ কবি-কল্পনার স্বাক্ষর বহন করলেও অনেকাংশে তা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিও তার মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে।

সুদীর্ঘ জীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে তাঁর বহু লেখা ও বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে এই দীর্ঘ প্রয়াস সার্থক হয় এই কারণে যে, শেষে এমন একটি শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় মেলে যার তুলনা অনেক দিক থেকে নেই বল্লেই চলে এবং এই কারণে বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ ফিণ্ডলে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গেই বলেছিলেন ঃ

"আমাদের যুগে দুজন মহামানব আছেন—পশ্চিম জগতে জন ডিউই ও প্রাচ্য জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুজনের প্রজ্ঞা সর্বসাধারণের চিত্তভূমিকেই শুধু উদ্ভাসিত করে নি, শিশুদের স্তরেও তা নেমে এসেছে।"

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিক জন্ ডিউইর সঙ্গে এই তুলনা সত্যই সার্থক। বস্তুতঃ সৃজনশীলতা ও অভিনবত্বের দিক থেকে এই দুইজনের শিক্ষাতত্ত্বের সমকক্ষ শিক্ষাতত্ত্ব বর্তমান জগতে দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মানব-সমাজের বেঁচে থাকার একটি প্রধান উপকরণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে মানব-সমাজকে বাঁচতে হলে দুটি বস্তুর সাহায্য প্রধানত নিতে হয়, একটি হল শিক্ষা এবং অন্যটি হল খাদ্য। শিক্ষার পরিধিতে তিনি অবশ্য সর্বশ্রেণীর লোককেই আনতে চেয়েছেন, কেননা সর্বসাধারণের শিক্ষা না হলে কোন সমাজ প্রগতির পথে কখনও এগোতে পারে না। শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া বলেই মনে করতেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আনন্দই শিক্ষার প্রাণ এবং আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই আনন্দময় শিক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে তিনি মাতৃভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন। অবমানিত মাতৃভাষার দুঃখে দুঃখী রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে মাতৃভাষার সার্থক 'রসায়নের' উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দময় ও স্বাধীনতানির্ভর প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন এবং তাই তার পূর্ণ বিকাশের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বলতে তিনি মানুষের সর্বশক্তির পূর্ণ বিকাশকে বুঝিয়েছেন এবং বাইরের স্বাধীনতা বলতে বিশ্বের সব-কিছুর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনকে বুঝিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও বহিরাগত স্বাধীনতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কেননা, মানুষের সর্বশক্তির বিকাশ বিশ্বের সঙ্গে পূর্ণ যোগসাধন ভিন্ন সম্ভব নয়, আবার বিশ্বের সঙ্গে সার্থক যোগসাধন আন্তর শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় ধারণা ছিল মূলতঃ ধর্মীয়, কেননা তাঁর মতে মানুষের বিকাশের চরম পরিণতি হল বিশ্বের সঙ্গে ঐ পূর্ণাঙ্গ যোগসাধন।

শিক্ষার লক্ষ্যের যথেষ্ট আভাস আমরা এখনই পেলাম। ব্যক্তি ও সমাজের

পূর্ণ বিকাশই, রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য। স্বভাবতঃ এই পূর্ণ বিকাশের ধারণার মধ্যে জীবনের প্রধান প্রধান সর্ব দিকেরই স্থান রয়েছে এবং এই বিকাশের শেষ পরিণতি হল বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মিলন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যোগ্য পরিবেশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। লোকালয়ের কোলাহল ও আবিলতা থেকে দূরে, সুন্দর ও শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি বিদ্যালয়কে সমাজসংযোগহীন মঠে পরিণত করতে চান নি। বিদ্যালয়ের সুন্দর আভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাইরের সমাজের গভীর ও প্রাণময় যোগের কথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। বস্তুতঃ, সমাজের সঙ্গে (প্রকৃতির সঙ্গে ত' বটেই) গভীর যোগসাধনের জন্যই তিনি মনে হয় লোকালয় থেকে দূরে, শান্ত পরিবেশে, শিশু-মনের বিকাশের কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন।

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই বহুমুখী ও বিচিত্র কর্মসমন্বিত এক পাঠক্রমের পরিকল্পনা করে-ছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, কারুকার্য, নৃত্যগীতবাদ্য, নাটক অভিনয়, শিল্পকর্ম, পল্লী-হিতসাধন ইত্যাদি বহু প্রকারের কর্মেরই স্থান এই পাঠক্রমে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিকাশের জন্য রয়েছে ব্রহ্মচর্য ও সংযমের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে সার্থক মিলন প্রচেষ্টার নির্দেশ।

পদ্ধতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৌশল অপেক্ষা শিক্ষকের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে শিক্ষার মত প্রাণপূর্ণ প্রক্রিয়া এক প্রাণ থেকে অন্য প্রাণে প্রবাহ সঞ্চারের মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মনে করতেন যে, "গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার" মধ্য দিয়েই শিক্ষা সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। স্বাধীনতা ও আনন্দের পূজারী রবীন্দ্রনাথ প্রাণহীন ধরা-বাঁধা পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন। তবে তিনি শিশুমনস্তত্ত্বনির্ভর শিল্পগুণসম্পন্ন পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন না।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপর মিলিত দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে

এবং শিক্ষককেও চারিত্রিক মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে এবং তবেই সার্থকভাবে বিদ্যালয়ে উপযোগী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উদ্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী ব্রতগুলির নামগুলি হল ব্রহ্মচর্যব্রত, সত্যব্রত, অভয়ব্রত, মঙ্গলব্রত, পুণ্যব্রত ও স্বদেশব্রত।

রবীন্দ্রনাথ নীতিশিক্ষার জন্য উপদেশ দানের উপর বিশেষ মূল্য দেন নি। তাঁর মতে নৈতিক জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে নীতিশিক্ষা লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য ও সংযমনির্ভর আচরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা ছাত্ররা লাভ করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণা। অবশ্য নীতিশিক্ষার জন্য তিনি শিল্প ও সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গেও শিশুর পরিচয় সাধিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, ঐ রূপ পরিচয় সাধনের মাধ্যমেই শিশুরা 'সংস্কৃতিবান' হয়ে উঠে। সুতরাং নৈতিক চরিত্র গঠনের একটি দিক হল সংস্কৃতিবান্ হয়ে ওঠা।

ধর্মশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিশুর স্বভাবজ ধর্মবোধের উপর খুব বেশী নির্ভর করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সুস্থ মানব-শিশুর মনে ধর্মবোধ স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত থাকে এবং এই ধর্মবোধ হল 'ভূমা' বা অখণ্ডের প্রতি আকর্ষণ। শিক্ষার কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক ধর্মবোধকে বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংস্পর্শে ও প্রেমপূর্ণ স্বার্থলেশহীন মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা।

উপরের এই অতি সীমিত আলোচনার মধ্য দিয়ে মহান্ শিক্ষাদার্শনিক ও মহান্ কবি-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের পরিচয় খুব অল্পই দান করা হল। তথাপি তার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও মহত্ত্ব সুপরিস্ফুট। সত্যই শিক্ষাক্রিয়ার এইরূপ মনস্তত্ত্বমূলক, মানবতাভিত্তিক, সু-উচ্চ দর্শনালোকিত ও কবিত্বপূর্ণ রূপাঙ্কন শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ভাস্বর হয়ে উঠেছে মানুষের মহত্তম আদর্শগুলিকে (সত্য, শিব, সুন্দর ইত্যাদিকে) শিক্ষা ক্রিয়ার সর্ব বিষয়ের আলোচনার সময়ে নিরলস নিষ্ঠার সঙ্গে মনে রাখার জন্য। 'নিরবধি কাল' ও 'বিপুলা পৃথ্বী' বহু শিক্ষাতত্ত্বের ধারক ও বাহক হবে, তবুও এ কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, যেখানেই মানুষের বিকাশ সুস্থ পথে অগ্রসর হবে সেখানেই কবি-গুরুর শিক্ষাতত্ত্বের প্রদীপ্ত আলোক অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট (খ)

Mohandas Karamchand Gandhi

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্ত্বিকও ছিলেন। তবে তাঁর সমস্ত প্রকার চিন্তা ও কর্মের পশ্চাতে প্রেরণা ছিল একই এবং সে প্রেরণা ছিল ধর্মীয়। এক সুমহান্ আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর এই সব ক্ষেত্রের প্রয়াস পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের উপর প্রচুর আলোকপাত করে।

রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও শুধু মাত্র শিক্ষাতাত্ত্বিক ছিলেন না। একই ভাবে তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন এবং সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ও নিজ জীবনের বহু বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা ও গভীরতম অনুভূতির আলোকেই তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের রূপ নির্ধারণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী সভ্যের দ্বারা পূর্ণ আদর্শ সমাজ সৃষ্টি। স্বভাবতঃই তিনি ব্যক্তির সর্বদিকের সুষম বিকাশ চেয়েছিলেন। তবে, তার মতে, আধ্যাত্মিক বিকাশই হল সমস্ত প্রকার বিকাশের চরম পরিণতি। গান্ধীজীর ধারণায় আদর্শ সমাজ হল সেই সমাজ যা হল সত্যনির্ভর, অহিংস, এবং সাম্যনীতি ও সহযোগিতাভিত্তিক।

শিক্ষাক্রিয়া হল, গান্ধীজীর মতে, প্রধানতঃ একটি সামাজিক কর্ম, যা প্রেমপূর্ণ সহযোগিতাভিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধনে প্রয়াসী। তবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার এই ধারণায় ব্যক্তির দিকও বাদ যায় নি, কেননা ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমেই গান্ধীজী সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ চেয়েছিলেন।

গান্ধীজী প্রধানতঃ বাল্য ও কৈশোরের প্রথমাংশের জন্য পাঠক্রম রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিশুর জীবনের এই অংশের শিক্ষাকে তিনি

বুনিয়াদী শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষার এই স্তর শিশুর জীবনের সাত বৎসর থেকে চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের উপযোগী। সমাজের কোন একটি মৌল কর্মকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম রচিত করবার কথা তিনি বলেছিলেন। তাঁর মতে, এই কেন্দ্রীয় কর্মের মাধ্যমেই শিশুর শক্তিনিচয়ের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হবে এবং তার ভবিষ্যতের জীবিকার ব্যবস্থাও হবে। সহজেই বোধ্য যে, ইংরেজ আমলের জীবন-সংযোগহীন শিক্ষার প্রতিবাদেই তিনি এই অত্যধিক জীবননির্ভর পাঠক্রম রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ভারতীয় সমাজের মৌল কর্মাবলীর মধ্যে কয়েকটি বুনিয়াদী পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় কর্মের উপযোগী বলে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সর্বাপেক্ষা মৌলিক কর্ম বলে কৃষি ও বয়নের উপর গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন। তাই অন্য যে কোন শিল্পকে মনোনীত করা হলেও কৃষিকর্ম ও বয়ন সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন প্রত্যেকটি ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য বলে গান্ধীজী মনে করতেন। উপযোগী কেন্দ্রীয় কর্মগুলি হল :

(১) কৃষিকর্ম।

(২) সুতাকাটা ও বয়ন।

(৩) সব্‌জি ও ফলের চাষ।

(৪) কাঠের কাজ।

(৫) চামড়ার কাজ।

(৬) স্থানীয় ও ভৌগোলিক দিক থেকে যোগ্য কারুকর্মসমূহ।

এই কেন্দ্রীয় কর্মগুলি, গান্ধীজীর মতে, শিক্ষা চলবার সময়েই অর্থকরী হবে। অর্থাৎ এগুলির দ্বারা অর্থোপার্জন, শুধু ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানেও সম্ভব হবে এবং তার দ্বারা শিক্ষার ব্যয়ও কিছুটা মিটবে। অর্থাভাবে ভারতের শিক্ষার উন্নতি সম্ভব না হওয়াতেই স্পষ্টতঃ গান্ধীজী এই অর্থকরী বিদ্যার পরিকল্পনা করেছিলেন।

উপরের কর্মগুলিকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ভাষা (সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে), গণিত ও সমাজনীতি শেখাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল সুস্পষ্ট। তিনি সমগ্র পাঠ্যবস্তুকে উপরোক্ত মৌলিক কর্ম এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের

সঙ্গে সম্পৃক্ত (correlated) করে শিক্ষা দিতে বলেছেন। জ্ঞানের অবিভাজ্যতা ও শিশু-মনের সমগ্রতার কথা ভেবেই গান্ধীজী স্পষ্টতঃ এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবনের পূর্বে গান্ধীজী বিভিন্ন ব্রত পালনের মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথের মত) নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এই ব্রতগুলি হল ব্রহ্মচর্যব্রত, অহিংসাব্রত, সত্যব্রত, অভীব্রত, অস্তেয়ব্রত, অপরিগ্রহ ব্রত, অস্বাদ ব্রত, অস্পৃশ্যতাবর্জন ব্রত ও স্বদেশী ব্রত। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু গান্ধীজী প্রেমপূর্ণ সহযোগিতাভিত্তিক জীবনযাপনকেই নৈতিক শিক্ষাদানের প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রেম ও অহিংসাই হল, তাঁর মতে, চরম ও পরম সত্য। সুতরাং এই দুয়ের দ্বারা অভিষিক্ত জীবনযাপন শুধু নৈতিক বিকাশ নয়, ধর্মীয় বিকাশেরও প্রধান ভিত্তি এমনিই তিনি মনে করতেন। শিক্ষকের পবিত্র জীবনের প্রভাব, ও পাঠক্রমের উপযোগী অংশসমূহের মর্মগ্রাহী আলোচনা, নীতিমূলক উপযুক্ত গল্প অধ্যয়ন ও আলোচনা এবং ধর্মীয় নেতাদের জীবনালোচনার কথাও অবশ্য গান্ধীজী বলেছেন নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের জন্য।

নূতন শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধেও গান্ধীজী খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, নূতন শিক্ষকদের কাজ শুধু পুস্তক মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিবেশন নয়। সৃজন ও উৎপাদনমূলক কর্মের ব্যবস্থাও তাঁদের করতে হবে। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষকদের মত তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পুস্তক ও পরীক্ষানির্ভর হলে চলবে না, সৃজনমূলক শিক্ষণের আশ্রয় তাঁদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও শিক্ষণের সময় নির্ধারণে শিক্ষকের স্বাধীনতার কথাও গান্ধীজী বিশেষ করে বলেছেন। সুতরাং নূতন শিক্ষকের দায়িত্ব হবে অনেক।

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্বের উপরোক্ত আলোচনা মোটেই পূর্ণাঙ্গ নয়। তথাপি তার মৌলিক সত্যতা, মানবীয় আবেদন এবং একই সঙ্গে অতি উচ্চ ও সাধারণ জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগ নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্ব বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আনতে সুরু করেছে এবং বুনিয়াদীশিক্ষার এই প্রসার যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত প্রগতিরই সূচনা করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গান্ধীজী নির্দেশিত শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবস্থায় অবশ্য পরিবর্তন আসছে (এবং পরে আসবেও), তবুও এ কথা ঠিক যে, ভারতের শিক্ষার জয়যাত্রায় গান্ধীজীর অবদান বহুকালই প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

(গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপকতর আলোচনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে)

QUESTIONS

শিক্ষার প্রকৃতি

(The Concept of Education)

1. Define 'education' and indicate its main functions.
('সিদ্ধান্ত' দ্রষ্টব্য)
2. What are different factors of education? Give an indication of their relative importance.
3. "Education is the process of life itself".—Comment upon the statement.
4. "Education is adjustment".—Critically examine the statement.
5. "Education is a social process".—Comment upon the statement.
6. Indicate whether education is a 'bi-polar' or a 'tri-polar' process.
7. Fully define the nature of democratic education.

শিক্ষার লক্ষ্য

(The Aims of Education)

1. Since the child is destined to live out his life, not as an abstract individual but as a member of a community, we may consistently define education as the making of good citizens.

   Develop the idea of the aim of education keeping the above aspect in mind. *(B. T. 1951, 1954)*
2. The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to the nature or to the social environment. *(B. T. 1952)*

3. Education teaches social adjustment. Consider the definition and attempt a more comprehensive definition of education. *(B. A. Educ. 1957)*
4. Critically examine the different views regarding the aims of education. What in your opinion should be the ultimate aim of education ? *(B. T. 1961)*
5. Give a critical estimate of some of the aims of the put forth by different educationists and say what seems to you to be the most satisfactory aim of education. *(B. A. 1962)*
6. Indicate the nature, functions and types of educational aims.
7. Which aims are the most suitable for Free India ?
8. Fully indicate the nature of the democratic aims of education.
9. Indicate the respective roles of philosophy and science in the formulation of the aims of education.
10. What do you understand by the individualistic and socialistic aims of education ? Which would you advocate and why ? *(B. A. Educ. 1959, 1961)*

শিক্ষার বিষয়বস্তু

(Curriculum)

1. What principles should be followed in drawing up curricula of studies for a reorganised secondary school system of India ? *(B. T. 1950, 1954)*
2. Is mental discipline the real condition as regards the choice of studies in schools ? If not, what principles should govern the framing of a curriculum of studies for secondary schools ? *(B. T. 1951)*
3. The prime and direct aim of education is to enable a man to know himself and the world. Keeping this view

in mind discuss what principles should govern the choice of studies in secondary schools? (*B. T. 1953*)

4. What are the basic principles which should guide us in curriculum construction? (উঃ—পৃঃ ১০২-১০৯)
(*B. T. 1955, 1958, B. A. Hons. 1959*)

5. What principles should you follow in framing curriculum of any stage of education? Examine the present Secondary curriculum in West Bengal in the light of these principles. (*B. T. 1956*)

6. What is curriculum? Supposing as Headmaster of a High School you are given absolute freedom to frame the curriculum of your school, how would you modify the existing curriculum? (*B. T. 1957*)

7. Why are craft and creative activities forming part of school curricula? Indicate the educational value of knowledge correlated to natural activities of children. (*B. A. 1957*)

8. "A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two forces: the nature of the child and the requirements of the community." Give an outline of such a curriculum. (*B. T. 1958*)

9. Enumerate the main principles on which the curriculum should be based. What would be your suggestions for the reform of the existing curriculum of our ten-class schools? (*B. T. 1959*)

10. What do you understand by activity-based curriculum? Describe a few methods that you will employ in framing such a curriculum.

11. Discuss the major trends that have found expression in the modern reformation of curriculum.
(উঃ—পৃঃ ১৭৮-১২৫)

12. Describe critically the principles that should operate in the choice of school studies. (*B. A. 1960*)

13. In the early stages the curriculum should be thought of in terms of activities rather than subjects. Do you agree ? Give reasons for your answer. (*B. A. 1961*)

14. What is the modern concept of curriculum ? What is the relation between philosophy and curriculum ?

15. How do the different philosophies of life define the nature of curriculum ? Which of these definitions would you favour most ?

16. What is the relationship subsisting among the aims of education, curriculum and the methods of education ?

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলী

(Co-curricular Activities)

1. Write a short essay on co-curricular activities. (*B. T. 1951, '59, B. A. 1951, '55*)

2. Describe ths utility of extra-curricular activities in schools. Why are these activities now-a-days called co-curricular activities ? (*B. T. 1958*)

3. Write an essay on the place of extra-curricular activities in educational institutions. (*B. A. 1959*)

4. Why are extra-curricular activities now generally called co-curricular ? Cite some types of such pursuits that can be introduced in our schools ? (*B. A. 1960*)

5. Write an essay on the impact of co-curricular activities on the personalities of pupils.

শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্ত্বসমূহ

(Fundamental Principles of Teaching and Learning)

1. What are the fundamental nature and principles of human learning ?

2. What is the modern concept of teaching ? What are its main principles ?

নিয়মানুবর্তিতা, স্বাধীনতা, পুরস্কার ও শাস্তিবিধান

(Discipline, Freedom, Reward and Punishment)

1. Write an essay on "Free Disciplne". *(B. T. 1954)*

2. "Discipline is not an external thing like 'order' but something that touches the inmost springs of conduct"—Explain and indicate the educational implications of this statement. *(B. T. 1959)*

3. What is the place of discipline in child-centred education ? *(B. A. 1957)*

4. What do you understand by 'free discipline' and what is its place in school ? *(B. A. 1954)*

5. Discuss the modern concept of discipline. What is the importance of this concept in the field of education ? *(B. A. 1960)*

6. Distinguish between order and discipline. Discuss in this connection the plan of punishment in the maintenance of discipline. *(B. A. 1962)*

7. Discuss the modern concepts and principles of reward and punishment.

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা

(Health Education)

1. Define the nature and principles of health education
2. What is the relationship between physical and mental health ?

———

পরীক্ষা

(Examination)

1. Describe the merits and demerits of public examination. Can examination be improved ?
   (*B. A. 1957, 1958, B. T. 1858, 1959, 1961*)
2. What are the defects of the existing system of examination ? How would you bring about reforms in the system ? (উঃ—পৃঃ ১০৫-২০৬) (*B. A. 1959*)
3. Critically examine the influence of public examination on teaching. (*B. A. 1961, 1962*)
4. Describe the nature and forms of new-type tests and critically evaluate their usefulness.
5. Can essay-type tests contribute significantly to the assessment of the attainments of pupils ?
6. What is 'evaluation' ? Evaluate the moment of evaluation in education.
7. Is philosophical change in any way connected with the reform-movement in examination ?

———

শিক্ষা ও সমাজ

(Education and Society)

1. What is the sociological concept of education ?
(Ch. I—দ্রষ্টব্য)
2. Define fully the nature of the relationship which subsists between education and society.
3. What is the relationship between politics and education ? Are economics and education closely related ?

———

শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানসমূহ

(Agencies of Education)

1. Discuss the importance of home as one of the most effective social agencies of education. How far can it be regarded as the first training ground of character ?
(B. T. 1961)
2. Write an essay on :—Home and School. *(B. A. 1961)*
3. Discuss fully the roles of the chief agencies of education in the developmental process of the children.
(উঃ—পৃঃ ২১৪--২১৯)
4. What are the formal and informal agencies of education ? Indicate their respective roles in education.

———

বিদ্যালয় ও সমাজ

(School and Society)

1. We must do everything we can, to make pupils feel at home in this world, without encouraging a marked distinction between the school world and out-of-school

world. Show that this is one of the modern trends in educational theory. (*B. T. 1951*)

2. Edward Thring once wrote—"A mob cannot be educated". Hence schools are needed. Discuss how a school should be organised for teaching. (*B. T. 1953*)
3. There has been too great a tendency to regard the school as an isolated unit and education as something apart from the main stream of life. Discuss and suggest steps by which the big gulf between the school and the society can be bridged and education can be made real and living to the child. (*B. T. 1956*)
4. Show how the functions of the schools are both conservative and progressive. (*B. T. 1959*)
5. "The idea that a main function of the school is to socialise its pupils in no wise contradicts the view that its true aim is to cultivate individuality." Do you agree? Give reasons for your answer. (*B. A. 1955, B. T. 1958*)
6. Discuss the relationship between the school and other educational agencies.
7. Which functions of the school originated from its role as the central agency of education?

বিদ্যালয় সমাজের প্রকৃতি

(The School as a Society)

1. Define the exact nature of the school as a society.
2. Write an essay on :—"School is a Society." (*B. T. 1961, B. A. Educ. 1957, '58, '60*)
3. How would you define the nature of the relationship which subsists between the society in the school and the Great Society outside?

শিক্ষক ও শিক্ষা

(The Teacher)

1. What is the role of a modern teacher in education ?
2. What are the stand-points of the different philosophies in relation to the role of the teacher in education ?
3. Write an essay on :—Relation between the teacher and the taught. *(B. T. 1950)*
4. 'Teacher' is essentially another name for 'influence'. Show that the function of the teacher is to influence the child to personalise the impersonal experiences which constitute the course of study. *(B. T. 1958)*
5. What personal characteristics in a pupil do lead towards success in school ? Think of the teacher who was most successful in helping you to learn. What personal characteristics of the teacher contributed most tc success ? *(B. T. 1953)*
6. What are the functions of a teacher ? Why is he considered the most important person in the educational system ? *(B. A. 1955)*
7. Describe the marks of a good teacher. *(B. A. 1957)*
8. What the mainspring is to the watch, the fly-wheel to machine, or the engine to the steamship, the headmaster is to the school. Discuss. *(B. A. 1959)*
9. "The teacher should not merely be the fountain of facts or the walking Encyclopædia but the guide, philosopher and friend to the young." Discuss. *(B. A. 1960)*
10. What according to you, are the essential qualifications of a teacher ? In this connection discuss the statement—"The function of a teacher is somewhat like that of a gardener." *(B. A. 1961)*
11. "It is the exemplar of an educated person that the teacher is, it is the stimulation and inspiration which he

generates, it is the personality that he radiates......which make him the great formative force." Elucidate.

(*B. T.* 1961)

মানব-জীবনের বিভিন্ন স্তর

(Stages of Development)

1. What are the general principles of human development ?
2. What are the different stages of human growth and development ?
3. Human growth is continuous. So how can the concept of stages of development be entertained with consistency ?
4. What is the modern concept of adolescence ? Is adolescence the period of 'storm and stress' ?

বংশধারা ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

1. Discuss the question whether nature or nurture, inherited endowment or environmental influence, has the more potent effect on determining a child's development.

   (*B. T.* 1953)

2. "Development is neither an unfolding of heredity without influence from the environment nor a process of being passively moulded by the environment.—Discuss.

   (*B. T.* 1957)

3. Write an essay on the influence of heredity and environment on the mental development of children.

   (*B. T.* 1958)

4. Discuss the part played by heredity and environment in their distinctive functions ? (*B. T. 1959*)

5. How does heredity inflence education ? (*B. A. 1957*)

6. Discuss the relative influence of heredity and environment on the educational attainments of children. (*B. A. 1958*)

7. What do you understand by nature and nurture ? Which, in your opinion, seems to have more potent effect in determining a child's development ? Give reasons for your answer. (*B. A. Hons. 1959*)

8. What do you understand by nature and nurture ? Develop the idea that nurture is a great factor which moulds human lives in many ways. (*B. A. 1960*)

9. What do you understand by heredity and environment ? Discuss their relative influence on the development of a child. (*B. A. 1961*)

প্রবৃত্তি ও শিক্ষা

(Instincts and Education)

1. What are 'instincts' ? Distinguish between instincts and reflexes and instinct and intelligence.

2. What is the present position of the theory of instincts ? What is the stand-point of the anthropologists and sociologists in regard to the instincts ?

3. Critically evaluate McDougall's theory of instincts.

খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা

(Play and Education)

1. In all play we find an element of joy, and on this account we find play associated with the fine arts. Show that play is a good means of sublimation. *(B. T. 1952)*
2. Work is conscious activity dominated by the object which it seeks to produce and drudgery is conscious activity whose value is not evident to the actor. How far should play impulse be utilised in overcoming drudgery and hard work ? *(B. T. 1953)*
3. Write short notes on Playway in Education. *(B. A. 1957)*
4. It is said that our school should be a place in which work is play and play is life. "Three in one and one in three."—Elucidate. *(B. T. 1957)*
5. What do you wean by 'work' and 'play' ? How are they distinguished from each other ? Give examples. *(B. A. 1961)*
6. What do you mean by Playway in Education ? Illustrate your answer with examples.
7. Critically evaluate the different theories of play.
8. How should one try to infuse play-spirit into the school ?

———

মহান্ শিক্ষানায়কদের অবদানসমূহ

(Contributions of Great Educators)

1. "Rousseau is the Copernicus of modern education".—Elucidate.

2. Critically assess the contributions of Herbert, Pestalozzi Froebel and Dewey to education.
3. Is Montessori a 'naturalist'? Fully describe her Method and evaluate it critically.
4. Evaluate the 'Wardha Scheme' of Gandhiji in relation to the socio-economic set-up in India.
5. Is Tagore's theory of education a right one in the present world context?

যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতিসমূহ

(Logical and Psychological Methods)

1. Distinguish between the logieal and psychological methods.
2. Define the nature and characteristics of psychological methods.
3. What are the most famous psychological methods in modern education? Illustrate them.

কয়েকটি বিখ্যাত আধুনিক পদ্ধতি

(Some famous modern methods of teaching)

1. Critically evaluate the Montessori Method.
2. Describe in full Froebel's Kindergarten Method and compare and contrast it with the Montessori Method.

3. Write essays on :
   (*a*) Decroly Plan
   (*b*) Winnetka Plan.
4. What is the 'Wardha Scheme'? Critically assess its educational value.
5. Evaluate the contributions of the Dalton Plan and the Project Method to modern education.
6. What is a 'project'? What is the 'Project Method'? Can it be used as a universal general method?
